স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৪

প্রকাশক : ব্রঃ প্রণবেশ চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ,
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

মুদ্রক : সিদ্ধার্থ মিত্র, বোধি প্রেস,
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬।

॥ ভূমিকা ॥

'আমার জীবনকথা' শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের স্বলিখিত জীবনকাহিনী। এই জীবনকথার সম্পূর্ণ আলেখ্য সময়াভাবের জন্য তিনি রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই একথা তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন। সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দজীর আহ্বানে পাশ্চাত্য-দেশে গমন করিবার পূর্বে—১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার জীবনপঞ্জীর পরিচয় তিনি দিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার স্বলিখিত জীবনাংশ অসম্পূর্ণ হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীসারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের জীবনালেখ্যের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করিতে সাহায্য করিবে।

এই আত্মজীবনী তিনি ঠিক কোন্ সময় হইতে বাংলাভাষায় লিখিতে আরম্ভ করেন তাহা জানা যায় না। যতদূর মনে আছে, ইংরাজী ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তিনি আমাদের অনেককেই (প্রথমের অংশ কিছু কিছু) দেখাইয়াছিলেন এবং তাহা নকল করিবার জন্য কাহাকেও কাহাকেও বলিয়াছিলেন। তবে বাংলাভাষায় মোটামুটি এই ধরণের বিস্তৃত একটি গ্রন্থ লেখার প্রচেষ্টা বোধহয় তাঁহার পক্ষে এই প্রথম। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর স্তোত্রমালা তিনি বাংলাভাষায় রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তাহাকে সংস্কৃতগ্রন্থশ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন। ইতিপূর্বে তাঁহার জীবনকালে 'কালীতপস্বী' নামে বাংলাভাষায় যে তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ ঘটনাসমাবেশ-কর্মে তিনি সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মহামান্য ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ ও ডক্টর জে. এইচ. মুইরহেড-সম্পাদিত 'কনটেম্পোরারি ইণ্ডিয়ান ফিলজফি' (জর্জ এ্যালেন ও আনউইন এণ্ড কোং, লণ্ডন থেকে প্রকাশিত) ইংরাজী

গ্রন্থে তিনি তাঁহার 'হিন্দু-ফিলজফি ইন্ ইণ্ডিয়া' নামক ইংরাজী নিবন্ধের সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত ইংরাজী আত্মজীবনী (Biographical) লিখিয়াছিলেন।[১] কিন্তু বর্তমান 'আমার জীবনকথা'-গ্রন্থের ঘটনাপঞ্জীর সমাবেশ বিস্তৃত এবং সুসম্বদ্ধ। এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশাল ভাণ্ডারের যে এই গ্রন্থ সম্পদ বৃদ্ধি করিবে এ' কথা নিঃসংশয়ে স্বীকার করি।

কাহারও মুখে শুনিয়া বা কোন গ্রন্থে পড়িয়া এই গ্রন্থের উপাদান তিনি সংগ্রহ বা সংকলন করেন নাই। নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রমাণ লইয়া এই গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন সহজ সরল সাবলীল বাংলা ভাষায়। স্থানে স্থানে তাঁহার চাক্ষুষ অনুভূতি-দীপ্ত চিন্তার অনুলিখনে গ্রন্থের বিষয়বস্তু যেন মুখর ও প্রাণবান হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জীবনচরিত যতগুলি আজ পর্যন্ত রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে উল্লিখিত কিছু কিছু ঘটনার সহিত এই গ্রন্থে নিবদ্ধ ঘটনার কিছু কিছু ঐক্য নাই। সুতরাং এই ঐক্যহীনতার মধ্যে কোন্‌টির মূল্য ইতিহাসসঙ্গত এবং সঠিক তাহা নির্ণয় করিবার জন্য আমরা সহৃদয় ভক্ত এবং পাঠক পাঠিকাগণকে 'শুনিয়াছি' বা 'পড়িয়াছি' এই পরোক্ষ প্রমাণের পরিবর্তে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের প্রত্যক্ষ নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি।

এই জীবনীগ্রন্থের একাদশ পরিচ্ছেদটি বিশেষ মূল্যবান বলিয়া আমরা মনে করি, কেননা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এই আলোচনাংশে তাঁহার অলৌকিক আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি স্বতন্ত্র দর্শনচিন্তার পরিচয় দিয়াছেন। জপ-ধ্যানের কথা, তোতাপুরীর বেদান্তমত, জীব, ব্রহ্ম ও মায়া এবং মায়ার শক্তি, সৃষ্টিতত্ত্ব, রাজযোগ ও হঠযোগ, মায়ার

১। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-লিখিত Philosophical Ideas of Swami Abhedananda-গ্রন্থে এই ইংরাজী আত্মজীবনীটি প্রকাশ করা হয়েছে।

স্বরূপ, সন্ন্যাসীর লক্ষণ, নিত্য ও লীলা, সাকার ও নিরাকার, সর্বধর্ম-সমন্বয়, ভক্তির স্বরূপ প্রভৃতির নিগূঢ়তত্ত্বের স্বরূপ-বিশ্লেষণ এই আলোচনা-অংশে আছে। এইজন্য জ্ঞানান্বেষীর নিকট জীবন-উপাদানের সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ব-বিশ্লেষণের মর্মও সহজে উদ্‌ঘাটিত হইবে বলিয়া মনে করি।

প্রকৃতপক্ষে 'আমার জীবনকথা'-গ্রন্থ ইংরাজী ১৮৬৬, ২রা অক্টোবর হইতে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় এই উনত্রিশ বৎসরের জীবন-ঘটনার অনুলিখন। এই অংশকে আমরা গ্রন্থের 'পূর্বভাগ' (প্রথম ভাগ) হিসাবে প্রকাশ করিলাম। গ্রন্থটিকে দুই ভাগে সম্পূর্ণ করিবার জন্য ১৮৯৬ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের ঘটনা-পঞ্জীর সমাবেশ দিয়া উত্তরভাগ (দ্বিতীয় ভাগ) সম্ভবত দুইটি ভাগে রচনা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। উত্তরভাগের সহিত পরিশিষ্টরূপে থাকিবে একটি 'গ্রন্থ-পরিচিতি'—যাহার রূপায়ণে থাকিবে স্বামী অভেদানন্দ-রচিত সমগ্র ইংরাজী ধর্ম ও দর্শন-গ্রন্থের সারসংকলন ও মর্ম। সেই সারসংকলন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নিজস্ব ধর্ম ও দর্শনমতকে চাক্ষুষভাবে বুঝিবার জন্য বিশেষ সাহায্য করিবে।[১] বর্তমান 'পূর্বভাগ'-ও সম্পাদনা করিয়াছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।

গ্রন্থে বহু আলোকচিত্রের সমাবেশ করা হইল গ্রন্থনিবদ্ধ বিচিত্র ঘটনাকে চাক্ষুষ করিবার জন্য। তাহাছাড়া তাঁহার স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির কোন কোন অংশের আলোকচিত্রও ইহার সহিত সংযোজিত হইল। বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য যে, পরিশিষ্টে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আলমোড়া হইতে তাঁহার সর্বপ্রথম ইংরাজীতে লিখিত 'দি হিন্দু-প্রিচার' (The Hindu Preacher) প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এম. সি. আলাসিঙ্গা-পেরুমল, বি. এ. সম্পাদিত 'দি

১। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইংরাজীতে এই গ্রন্থ Philosophical Ideas of Swami Abhedananda নাম দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রহ্মবাদীন' পত্রিকায় (The Brahmavadin, Saturday, November 23, 1895, pp.69-71)। ব্রহ্মবাদীনে প্রকাশিত এই ইংরাজী প্রবন্ধের পাদটীকায় তিনি পেন্সিলে লিখিয়া রাখিয়াছেন : "My first article I ever wrote long before I had any idea of coming to the West.—Swami A."। এই প্রবন্ধের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী লক্ষ্য করার বিষয়। এই প্রবন্ধে তাঁহার অভিন্ন হৃদয় গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যে বিজয়-অভিযান-সাফল্যের ইঙ্গিতও লক্ষ্যণীয়।

এই সঙ্গে এই কথাও অকপটে স্বীকার করিতেছি যে, এই গ্রন্থ-সম্পাদনাকর্মে যদি কোনরূপ ত্রুটী পরিলক্ষিত হয় তবে সেই ত্রুটীর জন্য দায়ী আমরাই। বর্তমান দ্বিতীয় সংস্করণে ভাষা কিছু কিছু পরিমার্জিত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের সুষ্ঠু প্রচ্ছদপট অঙ্কন করিয়াছেন শিল্পী খালেদ চৌধুরী।

প্রকাশক

॥ সূচীপত্র ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিংশ পরিচ্ছেদ

একবিংশ পরিচ্ছেদ

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

পরিশিষ্ট

চিত্র-পরিশিষ্ট

আমার জীবনকথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ পিতৃপরিচয় ॥

আমার পিতা রসিকলাল চন্দ্র ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা-নগরীতে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি ২২ নং নিমু গোস্বামী লেনে বাস করিতেন। রাজা রামমোহন রায় যখন[১] বৃষ্টলে (ইংলণ্ডে) দেহত্যাগ করেন তখন আমার পিতা রসিকলাল চন্দ্রের বয়স দশ বৎসর। তিনি ইংরাজী ভাষায় তৎকালীন সেমিনার-একজামিনেশন (পরীক্ষায়) উত্তীর্ণ হইয়া গৌরমোহন আঢ্য-প্রতিষ্ঠিত অপার চিৎপুর রোডে 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারী' বিদ্যালয়ে (যাহা অদ্যাবধি বর্তমান আছে) ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক হইয়া পঞ্চবিংশতি বৎসর ক্রমান্বয়ে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন।

প্রায় একশত বৎসর পূর্বে কলিকাতা-নগরীতে খ্রীষ্টান মিশনারী-দিগের স্কুল ও ডেভিড হেয়ার-প্রতিষ্ঠিত 'হেয়ার-স্কুল' ছাড়া বাঙ্গালী হিন্দুছাত্রদের ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য একমাত্র 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারী' স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া কলিকাতানিবাসী বহু ভদ্রলোক ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই রসিক মাষ্টারমহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। তন্মধ্যে সুবিখ্যাত কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য; যেমন কৃষ্ণদাস পাল, এটর্নী বিশ্বনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের পিতা), নাট্যসম্রাট গিরিশ-চন্দ্র ঘোষ, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ ঘোষ (হাইকোর্টের উকিল), নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু, সুরেশচন্দ্র মিত্র (শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গৃহস্থ-শিষ্য)। ইঁহারা সকলেই রসিক মাষ্টারমহাশয়কে ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে গুরুতুল্য মান্য করিতেন, রাস্তায় সাক্ষাৎ হইলে প্রণাম

১। ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩

করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে হিন্দুপ্রথানুসারে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ উপঢৌকনাদি পাঠাইয়া দিতেন।

প্রতিবেশীরা ইংরাজীতে চিঠিপত্র লিখিবার জন্য রসিক মাষ্টার-মহাশয়ের নিকট আসিতেন এবং তাঁহাকে ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া সম্মান করিতেন। অনেক সময়ে তিনি প্রতিবেশীদিগের ইণ্টারপ্রেটার (interpreter) হইয়া ইংরাজদিগের সহিত কথোপকথন করিতেন, কারণ তিনি ইংরাজী ভাষায় অনর্গল কথা কহিতে পারিতেন।

রসিক মাষ্টারমহাশয় দুইবার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথম পক্ষের বিবাহে একটি পুত্র ও এক কন্যা জন্মিয়াছিল। তিনি পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন বিহারীলাল। বিহারীলাল মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফ[২]-প্রতিষ্ঠিত ফ্রি চার্চ ইনৃষ্টিটিউশনে বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন এবং কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (Rev. K. M. Banerjee) তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। তাঁহারা (বিহারীলাল, কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি) মিশনারীদিগের বাইবেল পাঠ করিয়া হিন্দুধর্মে বিশ্বাস হারাইয়া খ্রীষ্টান পাদরীদের মতানুসরণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। অবশেষে এণ্ট্রান্স (প্রবেশিকা) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহারা যীশুখ্রীষ্টই একমাত্র পরিত্রাতা এই ধারণা পোষণ করেন ও খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। সেই সময়ে যাঁহারা মিশনারী-স্কুলে শিক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দুযুবক স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হইবার জন্য গৌরব অনুভব করিতেন। কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে খ্রীষ্টানধর্মে বাপটাইজ্‌ড (baptized) হইয়াছিলেন।

২। আলেকজাণ্ডার ডাফ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসেন। তাঁহার আগমনের এক বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 'ব্রাহ্মসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা রামমোহন রায় আলেকজাণ্ডার ডাফকে একটি স্কুল করে দেন। রামমোহনের বন্ধু এ্যাডামও এর আগে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আলেকজাণ্ডার ডাফ রাজা রামমোহনের কাছ থেকে নানান ভাবে সহায়তা পেলেও হিন্দুধর্মের মতো ব্রাহ্মধর্মকেও আক্রমণ করতে ছাড়েন নি। এই সব নানান কারণে ভগ্নহৃদয় হয়ে ডাফ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ইহা দেখিয়া বিহারীলাল পিতার আদেশ অবহেলা করিয়া খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন।

বিহারীলাল যখন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়া গৃহত্যাগ করেন ও কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত খ্রীষ্টান পাদরীগণের আশ্রয় লন তখন রসিকমাষ্টার-মহাশয় একমাত্র পুত্রের শোকে অধীর হইয়া গঙ্গার জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। তদনুসারে একদিন গঙ্গায় গলাজলে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন—এমন সময়ে অকস্মাৎ এক দৈববাণী শুনিতে পাইলেন—কে যেন তাঁহাকে বলিল : 'তুমি কেন আত্মহত্যা করবে ; পুনরায় বিবাহ কর'। এই দৈববাণী শুনিয়া তিনি চমকিত হইলেন এবং কোনদিকে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ইহা কোন দৈববাণী হইবে মনে করিয়া আর আত্মহত্যা করিলেন না। তিনি গঙ্গার জল হইতে উঠিয়া চিন্তাযুক্ত মনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে বাস করিতে লাগিলেন। গৃহও তাঁহার শূন্য, কেননা ইতঃপূর্বে তাঁহার পত্নী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন।

রসিক মাষ্টারমহাশয় সত্যনিষ্ঠ, ধার্মিক, পরোপকারী, ন্যায়বান ও একেশ্বরবাদী ছিলেন। পুত্র বিহারীলাল খ্রীষ্টান হইবার পর আমার পিতা বাইবেল, কোরান, ভগবদ্‌গীতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বুঝিয়াছিলেন 'ঈশ্বর এক—অদ্বিতীয়, তবে নাম ও রূপ তাঁহার অসংখ্য'। তিনি এই মন্ত্র বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া ছবির ফ্রেমে বাঁধাইয়া নিজের ঘরের দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে উপনিষদের যে একেশ্বরবাদ প্রচারিত হইত তাহাতে তাঁহার ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল। রামমোহন রায়-কর্তৃক বাঙলা ভাষায় অনূদিত উপনিষৎ পাঠ করিয়া তিনি আনন্দ লাভ করিতেন। তিনি বাইবেলের মত খণ্ডন করিবার জন্য টমাস পাইনের (Thomas Paine) 'এজ অব্ রিজন্' (Age of Reason) গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। 'এজ অব্ রিজন্' গ্রন্থে নিউ টেষ্টামেণ্টের মত যে যুক্তিবিরুদ্ধ ও ভ্রমসঙ্কুল তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অপরদিকে বিহারীলাল খ্রীষ্টমতাবলম্বী হইয়া কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। কলিকাতার খ্রীষ্টানসমাজে কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সহধর্মীরা তাঁহাকে Devout Christian বা যীশুখ্রীষ্টের পরমভক্ত আখ্যা দিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। বিহারীলাল কালীমোহনের ন্যায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতেন। তাঁহারা ইংরাজী ভাষায় সুবক্তা ও গ্রন্থ-রচয়িতা ছিলেন। বিহারীলাল কলিকাতা নগরীর রেজিষ্ট্রারের (Registrar) পদে নিযুক্ত থাকিয়া অবশেষে পেন্‌সন লইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ত্যজ্যপুত্র করিয়া পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ আমার জন্ম ॥

ইংরাজী ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে রসিক মাষ্টারমহাশয় আটাশ বৎসর বয়সে দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে নয়টি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে পাঁচটির অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। অবশিষ্ট চারিটির মধ্যে আমি মধ্যম পুত্র। আমার জন্মগ্রহণের বহুপূর্ব হইতে আমার ধর্মপ্রাণা মাতা (নয়নতারা দেবী) কালীঘাটে গিয়া শ্রীশ্রীমা কালীর নিকট সাধুচরিত্র ধার্মিক যোগী-সন্তান কামনা করিয়া আন্তরিক ভক্তিসহকারে বারংবার প্রার্থনা করিতেন। তিনি শ্রীশ্রীমা কালীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এইরূপ সাধুচরিত্র যোগী-সন্তান জন্মাইলে তিনি তাঁহার বক্ষস্থল চিরিয়া রুধির অর্পণ করিবেন। শ্রীশ্রীমা কালী তাঁহার কাতর প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। আমার জন্ম হয় ১৭ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, সন ১২৭৩ সাল (ইংরাজী ২রা অক্টোবর ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ) কৃষ্ণানবমী তিথি, পুষ্যানক্ষত্র, রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময়। তখন দুর্গাদেবীর নবম্যাদি-বোধনকল্প আরম্ভ হইয়াছে। সেই শুভদিনে ও শুভমুহূর্তে কলিকাতানগরীতে ২২ নং নিমু গোস্বামী লেনে পৈতৃক ভবনে আমার জন্ম হয়। শ্রীশ্রীমা কালীর প্রসাদে পূজনীয়া মাতাদেবী সন্তান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার নাম রাখিয়াছিলেন কালী-প্রসাদ। আমার জন্মসম্বন্ধে মাতাঠাকুরাণী জনৈক ভক্তের নিকট বলিয়াছিলেন: "তোমাদের স্বামীজী মহারাজ যখন হইলেন, তখন তাঁহার সর্বাঙ্গে নাড়ী জড়ানো ছিল। ইহা দেখিয়া ধাত্রী বলিল: 'দেখুন—এই ছেলে কোন যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ হইবে। জন্ম লইতে ইচ্ছা ছিল না সেই কারণে তাহাকে কেহ যেন বাঁধিয়া এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন।' তখন বাড়ীর সকলে আসিয়া ছেলেটিকে দেখিতে লাগিল। কর্তা (পিতা) দেখিয়া ধাত্রীকে বলিলেন: 'শীঘ্র নাড়ী কাটিয়া দাও,

নতুবা ছেলে পেট ফুলিয়া মারা যাইবে।' ধাত্রী নাড়ী কাটিয়া দিল। কিন্তু শিশু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া রহিল। প্রায় এক ঘণ্টাকাল শিশু নড়ে না এবং কাঁদেও না। ধাত্রী বলিল: 'শিশু ধ্যানমগ্ন, এখনও ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। কোন চিন্তা করিবেন না।' চক্ষুর পাতায় একটু লঙ্কার গুড়া লাগাইয়া দেওয়ায় শিশু কাঁদিয়া উঠিল এবং দশ মিনিট পরে গরম জল দিয়া শিশুকে স্নান করানো হইল। কিন্তু সর্বাঙ্গে নাড়ীর দাগ প্রায় ছয় মাস পর্যন্ত ছিল। আমার মাতা বলিলেন: 'আমি কালীঘাটে শ্রীশ্রীমা কালীর নিকটে এক ধার্মিক সাধুমহাপুরুষ সন্তান প্রার্থনা করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম এইরূপ সন্তান পাইলে 'মা, তোমার নিকট আমি বুক চিরিয়া রক্ত দিব'। মা কালী আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য এই সন্তানকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাই আমি এই সন্তানের নাম রাখিলাম 'কালীপ্রসাদ'। ছয় মাস হইলে কালীপ্রসাদকে লইয়া কালীঘাটে গিয়া শ্রীশ্রীমা কালীর পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছিলাম এবং মায়ের পূজা করিয়া বুক চিরিয়া রক্ত দিয়াছিলাম।'

দেড় বৎসর যখন বয়স তখন আমার আমাশয়-অসুখ হয়। ঐ অসুখে প্রায় দুই বৎসর কষ্ট পাই। জীবনের আশা ছিল না। কত চিকিৎসা করানো হইল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। শরীর ক্রমশঃ কঙ্কালপ্রায় হইল। ঘুটের আগুনে পোরের ভাত (পুরাতন দাদখানি চাউলের) ও গুগ্‌লির ঝোল পথ্য নির্দিষ্ট হইল। অবশেষে কবিরাজী ঔষধ কুর্চীর ছাল সিদ্ধ জলের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইতে অসুখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম।

বাল্যকাল হইতেই গর্ভধারিণী মায়ের উপর আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। কেহ কিছু খাবার দিলে আগে মাতাঠাকুরাণীকে দিয়া বলিতাম: 'মা, তোমার জন্য কিছু খাবার আগে রাখ, তারপর আমি খাব।' আমার মাতুল-মহাশয় বেশ ধনী লোক। তিনি আমায় অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং সময়ে সময়ে নানাবিধ খাবার পাঠাইয়া দিতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ আমার বিদ্যারম্ভ ও তখনকার কলিকাতার অবস্থা ॥

পাঁচ বৎসর যখন তখন আমার হাতে-খড়ি হয়। লাহা পাড়ায় গোবিন্দ শীলের পাঠশালায় আমাকে ভর্তি করানো হয়। সেই সময় হিন্দু পাঠশালায় ছাত্রেরা তালপাতায় খাকের কলম দিয়া লেখা অভ্যাস করিত। স্লেট পেন্সিলের ব্যবহার তখন ছিল না। সেই পাঠশালায় আমি দুই বৎসর বিদ্যা শিক্ষা করি এবং প্রতি বৎসর উচ্চ পারিতোষিক লাভ করি। আমার পিতা সেইজন্য আমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন।

সেই সময়ে কলিকাতানগরীতে কোন জলের কল, গ্যাস অথবা বৈদ্যুতিক আলো ছিল না। প্রত্যেক বাড়ীতে কূপ অর্থাৎ পাতকূয়া ছিল এবং সেই কূয়ার জলে স্নান, রান্না ইত্যাদি গৃহকার্য নির্বাহ হইত। প্রত্যেক বাড়ীতে কূপ-পায়খানা ছিল এবং উহা ছয় মাস অন্তর পরিস্কার করানো হইত। মাটির নীচে ড্রেন ছিল না, তাহার পরিবর্তে রাস্তায় বড় বড় নর্দমা ছিল। রাস্তায় লণ্ঠনের মধ্যে রাখিয়া তৈলপ্রদীপ জ্বালানোর ব্যবস্থা ছিল। দিয়াশলাইয়ের ব্যবহার ছিল না। চকমকি পাথর ঠুকিয়া পোড়ানো শোলায় অগ্নিকণা ধরিয়া কাঠকয়লার টিকা ধরানো হইত, তাহার পর টিকা হইতে গন্ধকের দিয়াশলাই জ্বালাইয়া প্রদীপ জ্বালানো হইত। সেই প্রদীপের আলোয় রাত্রে সমস্ত গৃহকর্ম ও লেখাপড়া করা হইত। তখন কেরোসিন তৈল ভারতে আসে নাই, রেড়ীর তৈলেরই ব্যবহার ছিল। কাপড়ের সলিতা করিয়া রেড়ীর তৈলে ভিজাইয়া প্রদীপ জ্বালানো হইত। তাহার অনেকদিন পরে তবে কেরোসিন তৈলের প্রচলন হয়।

আমি প্রদীপের আলোতেই লেখাপড়া করিতাম। হিন্দুপাঠশালা হইতে পরে যদু পণ্ডিতমহাশয়ের বঙ্গবিদ্যালয়ে আমাকে ভর্তি করা

হয়। ঐ পাঠশালায় তিন বৎসর শিক্ষা করি। তখন বৃন্দাবন বসাক লেনে ঐ বিদ্যালয় অবস্থিত ছিল। প্রতি বৎসরই আমি উচ্চ পারিতোষিক লাভ করি। ঐ বিদ্যালয়ে আমার সহপাঠীর মধ্যে ছিল বাবুরাম ঘোষ—যিনি পরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সন্ন্যাসীশিষ্য-দিগের অন্যতম স্বামী প্রেমানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

আমার মাতাঠাকুরাণী অতিশয় ভক্তিমতী, ধর্মপরায়ণা ও হিন্দুমাতার আদর্শরূপিণী ছিলেন। তিনি প্রত্যহ স্নানের পর আহ্নিক সমাপন করিয়া কৃত্তিবসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত এই দুইটির এক এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। তিনি যখন রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিতেন আমি তখন তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়া একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতাম।

পাড়ায় যখন কোন রামায়ণগান অথবা শ্রীকৃষ্ণলীলাযাত্রা হইত আমার মা তখন আমায় সঙ্গে লইয়া শুনিতে যাইতেন। এইরূপে অল্প বয়সেই রামায়ণ ও মহাভারতের অদ্ভুত চরিত্রসমূহ ও হিন্দুধর্মের আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স অব্ ওয়েলস (পরে সপ্তম এডওয়ার্ড) যখন কলিকাতানগরী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সহরের ওয়েলিঙটন ষ্ট্রীট ও ধর্মতলা ষ্ট্রীট বিচিত্র রঙ্গের নিশান প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর রাস্তার দুইধারে ফুকো (খালি) শিশিতে তৈলপ্রদীপের দীপমালা সাজাইয়া আলোকিত করা হইয়াছিল। তখন আমার বয়স প্রায় সাত কিংবা আট বৎসর। আমি আমার মাতার সহিত বহুবাজারে হৃদয়রাম ব্যানার্জীর গলিতে অবস্থিত মাতুলালয় হইতে এক দ্বিতল বাড়ীর ছাদে বসিয়া আলোকমালায় সুসজ্জিত রাস্তা দিয়া যুবরাজের বিরাট শোভাযাত্রা দেখিয়াছিলাম ও আনন্দে পুলকিত হইয়াছিলাম। সেই অপূর্ব দৃশ্যের স্মৃতি আমার চিত্তপটে এইরূপ গভীররূপে অঙ্কিত হইয়াছিল আজিও আমি তাহা ভুলিতে পারি নাই।

তখন মহাদেবীর পীঠস্থান কালীঘাট কলিকাতাবাসী হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থস্থান ছিল। আমার পিতামাতা বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত হইয়াও প্রতি মাসে একবার শ্রীশ্রীমা কালীর পূজা করিবার জন্য আমাকে সঙ্গে লইয়া ঘোড়ার গাড়ী করিয়া কালীঘাটে যাইতেন। সেখানে আদিগঙ্গায় অবগাহন-স্নান করিয়া শ্রীশ্রীমা কালীর দর্শন ও পূজা দিয়া প্রসাদ পাইতেন এবং সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া আসিতেন।

সেই সময়ে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আহিরীটোলা হইতে কালীঘাটে যাইতে প্রায় তিন চার ঘণ্টা লাগিত। চৌরঙ্গী হইতে ময়দানের উপর দিয়া যাইবার সময় তখন ইংরাজ গোরাদিগের ভয়ে গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া যাইতে হইত, কারণ ইংরাজ-পল্টনের গোরারা গাড়ীতে স্ত্রীলোক দেখিলে দৌড়িয়া আসিত এবং ডাকাতের ন্যায় তাহাদের গাত্র হইতে স্বর্ণালঙ্কার ছিনাইয়া লইয়া পলায়ন করিত। সেই কারণে তখন কালীঘাটে যাতায়াত করা মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না। কালীঘাটে যাইয়া আমার পিতামাতা খড়ের অথবা গোলপাতার ছাদযুক্ত যাত্রীদিগের বিশ্রামঘর ভাড়া করিতেন এবং আহারাদি সমাপন করিয়া চেতলার হাট দেখিতে যাইতেন। এইরূপে বাল্যকালেই তীর্থস্থানে যাত্রীদিগের কর্তব্যক্রিয়া-সম্বন্ধে আমি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম। হাওড়ার ব্রিজ (পুরাতন) যখন (খ্রী ১৮৭৩-৭৪) নির্মিত হয় তখন আমার বয়স আট বৎসর। আমার পিতামাতা আমাকে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া ঐ কাঠের ব্রিজ (পোল) দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। গঙ্গার বুকে ঐ সেতু দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। কলিকাতা-সহরে যখন ট্রামগাড়ীর চলন হয় তখন প্রথম উহা বিডন ষ্ট্রীট হইতে লালবাজর পর্যন্ত চলিত। দুইটি ঘোড়া রেললাইনের উপরে ট্রামগাড়ী টানিয়া লইয়া যাইত। আমিও ট্রাম-গাড়ীতে চড়িয়া নতুন এক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম। এখন সেই সবের কত পরিবর্তন হইয়াছে!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ ইংরাজী স্কুলে ও সংস্কৃত টোলে শিক্ষা ॥

আমার যখন দশ বৎসর বয়স তখন যদু পণ্ডিতমহাশয়ের বঙ্গবিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া আমি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে দশম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হই। প্রতি বৎসরে ডবল প্রমোশন ও উচ্চ পারিতোষিক পাইতাম। তখন বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ঐ সেমিনারীর সেক্রেটারী (সম্পাদক) ছিলেন। তিনি, অর্ধবাবু মাষ্টার, বিশু মাষ্টার, হেরম্ব পণ্ডিত, অভয় পণ্ডিত প্রভৃতি শিক্ষকগণ আমার বুদ্ধির প্রশংসা করিতেন এবং পড়াশোনায় কৃতকার্যতা লাভের জন্য তাঁহারা আমায় বিশেষ স্নেহ করিতেন ও ভালবাসিতেন। বিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমার স্বভাব ধীর ও শান্ত ছিল। অঙ্ককষায় আমার বিশেষ উৎসাহ ছিল এবং বেশী নম্বর পাইয়া আমি রৌপ্যপদক পাইয়াছিলাম। সংস্কৃত ব্যাকরণ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা ও কৌমুদী পাঠ করিতে যখন আরম্ভ করিলাম তখন আমার পূর্বজন্মের সংস্কার যেন জাগিয়া উঠিল এবং অল্পকালের মধ্যে উপরি-উক্ত ব্যাকরণগুলি শেষ করিয়া আমি বাড়ীতে মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলাম। তখন হাতীবাগানে হেরম্ব পণ্ডিতমহাশয়ের একটি টোল ছিল। আমি ঐ টোলে সন্ধ্যার সময় মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ পাঠ করিতে যাইতাম। ঐ টোলে হিতোপদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকগুলি পড়া শেষ করিলাম এবং তাহার পর বাড়ীতে কালিদাসের রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা এবং ভট্টীকাব্য অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। সেই সময়ে ইংরাজী হইতে সংস্কৃত ভাষায় আমি সুন্দররূপে অনুবাদ করিতে পারিতাম এবং অনুষ্টুপছন্দের রীতি শিক্ষা করিয়া এই ছন্দে অনুবাদ করিয়া সংস্কৃত কবিতা লিখিতাম। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর সংস্কৃত-ভাষার প্রধান শিক্ষক অভয় পণ্ডিতমহাশয় অনুষ্টুপছন্দে আমার

বিশেষ অধিকার দর্শন করিয়া আমাকে অন্যান্য ছন্দের লক্ষণ শিখাইবার জন্য একখানি 'ছন্দমঞ্জরী'-গ্রন্থ পাঠ করিতে দিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ হইতে অল্প সময়ের মধ্যে অতি সহজে আমি নানাবিধ ছন্দের লক্ষণ শিক্ষা করিয়াছিলাম। তদানীন্তনকালে কলিকাতায় আহিরীটোলা ও বাগবাজার প্রাচীন হিন্দু বাসিন্দাদিগের পাঠকেন্দ্র বলিয়া বিখ্যাত ছিল। গান-বাজনা, হাফ্ আখড়াই, সখের যাত্রা, কুস্তি এবং ক্রীড়াকৌতুক প্রভৃতি সকল বিষয়ে আহিরীটোলা ও বাগবাজারের দলের মধ্যে সর্বদাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিবার জন্য আমারও বিশেষ উৎসাহ ছিল।

শরীরচর্চা-বিষয়েও আমার উদ্যম ও উৎসাহ কম ছিল না। শরীরের মাংসপেশীগুলিকে সবল ও সুদৃঢ় করিবার জন্য আমি গঙ্গাস্নান করিবার সময়ে সাঁতার দিতাম। ইহা আমার সঙ্গীগণের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলাম। আহিরীটোলা ও বাগবাজারের বিভিন্ন স্থানে তখন ব্যায়াম সমিতি ছিল। আমি আহিরীটোলার একটি ব্যায়ামাগারে নিত্যনিয়মিতভাবে ব্যায়াম শিক্ষা করিতাম। একদিন হার্বার্ট স্পেন্সারের 'এডুকেশন' (শিক্ষা) নামক পুস্তক পড়িয়া বুঝিতে পারিলাম যাহারা মাংসপেশী সবল করিবার জন্য ব্যায়ামাদি অধিক পরিমাণে অভ্যাস করে তাহাদের মস্তিষ্ক ও চিন্তাশক্তি অপরিণত ও দুর্বল হয়। আমি আমার মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তি যাহাতে বর্ধিত হয় তাহারই পক্ষপাতী ছিলাম, সুতরাং দৈহিক শক্তি বাড়াইলে পাছে মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তি দুর্বল হয় এই ভয়ে ব্যায়াম সমিতিতে যাওয়া ত্যাগ করিলাম।

স্কুলের পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস (Wilson's *History of India*) পাঠ করিতে করিতে আমি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলাম এবং তাঁহার জীবনী ও রচনাসমূহ জানিবার জন্য আমার মনে অত্যন্ত আগ্রহ হইল। কি জানি কেন প্রতিদিনই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি বর্ধিত হইতে লাগিল। যখন জানিলাম আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতবেদান্তে

একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি দিগ্বিজয় করিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে অদ্বৈতবেদান্তের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন তখন আমি অদ্বৈতবেদান্তের উপর বিশেষ আকৃষ্ট হইলাম এবং নিজে একজন বড় দার্শনিক হইব এই ইচ্ছা হৃদয়ে জাগ্রত হইল।

ইতঃপূর্বে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে একটি ড্রইং-ক্লাশ (অঙ্কনের বিভাগ) খোলা হইয়াছিল। শিল্পকলাবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য আমি ঐ ক্লাশেও যোগদান করিয়া অধ্যবসায়-সহকারে অঙ্কন শিক্ষা করিতে লাগিলাম। এক বৎসর শিক্ষার পর প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহ অঙ্কন করিয়া সিপিয়া (sepia) রঙ্ দিতে শিক্ষা করিলাম এবং পরীক্ষায় পারিতোষিক লাভ করিলাম। অঙ্কনের শিক্ষক (Drawing Master) আমার শিল্পনৈপুণ্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং অন্যান্য ছাত্রদের অপেক্ষা আমাকে অধিক স্নেহ ও যত্ন করিয়া অন্যান্য বিষয়ে অঙ্কন শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

তখন আমার মনে চিত্রকর অথবা দার্শনিক (Painter or Philosopher) কোন্‌টি হইব এই বিষয়ে চিন্তার উদয় হইল এবং কোন সমস্যারই সমাধান করিতে পারিলাম না। একদিন হঠাৎ ড্রইং মাষ্টারকে আমি বলিলাম: 'আর আমি আপনার ড্রইং-ক্লাশে আসিব না।' তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম: 'আমি অনেক ভাবিয়া ঠিক করিয়াছি যে, চিত্রকর অপেক্ষা দার্শনিক হওয়াই ভাল, সুতরাং আমি আর অঙ্কনবিদ্যা শিখিব না।' অঙ্কনের শিক্ষক শুনিয়া বলিলেন: 'কিন্তু কালীপ্রসাদ, আমার মতে ফিলজফারের চেয়ে পেণ্টার হওয়াই ভাল, কেননা শিল্পী দার্শনিকের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।' আমি সেই কথা শুনিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলাম: 'না মাষ্টারমহাশয়, a painter studies the surface of things, but a Philosopher goes below the surface and studies the causes of thing;' অর্থাৎ 'চিত্রকর সকল জিনিসের বাইরের দিক অনুশীলন করেন, কিন্তু দার্শনিক তার অনেক গভীরদেশে গিয়ে

সকল জিনিসের কারণ কি তা অনুশীলন করেন। সুতরাং আ' দার্শনিক হতে ইচ্ছা করি।' এই কথা শুনিয়া অঙ্কনের শিক্ষক আমায় বলিলেন : 'বেশ তো, তাহলে ফিলোজফার ও পেণ্টার দুই-ই হও না কেন।' আমি তাহার উত্তরে বলিলাম : 'one man cannot serve two masters' (একই লোক কখনো দু'জন প্রভুর সেবা করতে পারে না)। তখন অঙ্কনের শিক্ষক আমার নিকট পরাস্ত হইয়া নীরব রহিলেন।

সেই সময়ে আমি তদানীন্তন সুবিখ্যাত বক্তাদিগের বক্তৃতা শুনিতে ভালবাসিতাম। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, খ্রীষ্টান কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, লালমোহন ঘোষ প্রভৃতি সুবিখ্যাত বক্তাগণ যখন যেখানে বক্তৃতা করিতেন আমি সেইখানে যাইতাম। ইংরাজী ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ব্রাহ্মদিগের মহোৎসবের সময়ে কেশবচন্দ্র সেন নগর-কীর্তন করিতে করিতে বিডন স্কোয়ারে আসিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন, আমি ঐ বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। বক্তৃতা প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছিলেন : 'আমি হরিকে সর্বত্রই দেখিতেছি। ঐ যে হরি! আমি তাঁহাকে এই সম্মুখস্থ বৃক্ষের ডালে ডালে, পাতায় পাতায় দেখিতেছি।' সেই অগ্নিগর্ভ বক্তৃতার কথাগুলি আমার হৃদয়ে চিরস্মরণীয়ভাবে অঙ্কিত হইয়া আছে। কেশবচন্দ্রের ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল তিনি যথার্থই শ্রীহরিকে চাক্ষুষ দেখিতে পাইতেন।

সালকিয়ার একটি সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জীবনীসম্বন্ধে ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমি সেই বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। সেই বক্তৃতা শুনিয়া আমার শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইয়াছিল। পরে তাঁহার বক্তৃতাসমূহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে আমি ক্রয় করিয়া পাঠ করিতাম। যখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন তখন অসাধারণ বাগ্মী লালমোহন ঘোষ বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন

করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিডন ষ্ট্রীটে নবনির্মিত গিরিশচন্দ্রের ষ্টার-থিয়েটার (যাহা পরে 'মনোমোহন'-থিয়েটার নামে অভিহিত হইয়াছিল) একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। লালমোহন ঘোষের অগ্নিময়ী বক্তৃতা (oratory) শুনিবার জন্য আমি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলাম। তাঁর ইংরাজী বক্তৃতাগুলি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে আমি ক্রয় করিয়া পাঠ করিতাম। প্রতি রবিবার বৈকালে খ্রীষ্টমতাবলম্বী কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিডন স্কোয়ারে যীশুখ্রীষ্ট-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন।

আমি তাঁহারও বর্ক্তৃতা শুনিতে যাইতাম এবং খ্রীষ্টান মিশনারী রেভারেণ্ড ডক্টর ম্যাকডোলাণ্ড প্রভৃতি পাদরীদিগের ধর্মব্যাখ্যা ও প্রচারকার্য শুনিয়া বক্তৃতার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম।

ব্রাহ্মসমাজের নেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মেডিকেল কলেজের হলে Tour round the World-(পৃথিবী-ভ্রমণ) সম্বন্ধে ইংরাজী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। আমি ঐ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, মার্কিনদেশবাসীরা অন্যান্য য়ুরোপীয়জাতি অপেক্ষা সকল বিষয়ে উন্নত। মজুমদারমহাশয় আমেরিকার নানা বিষয় বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন—দুই-তিনতলা বড় বড় বাড়ী এক স্থান হইতে টানিয়া সদর রাস্তার উপর দিয়া দূরে অপর এক স্থানে স্থাপন করা হয়। স্থানান্তরিত করিবার সময় গৃহবাসীরা ঐ বাড়ীতে বাস করিতে থাকে, তাহাদের কোন গৃহকর্ম বন্ধ থাকে না। ইহা শ্রবণ করিয়া আমার মনে আমেরিকা দেখিবার কৌতূহল সৃষ্টি হয়।

বাল্যকাল হইতে সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আমি আমার পিতাকে সর্বদা নানাবিধ প্রশ্ন করিতাম। সেই সমস্ত প্রশ্ন শুনিয়া আমার পিতা বলিতেন: 'এত অল্প বয়সে এত অনুসন্ধিৎসু সন্তান কখনও দেখি নাই।' সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করিবার জন্য আমি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহিত বাড়ীতে পারাবত, বুলবুল,

মনিয়া পক্ষী প্রভৃতি পালন করিয়াছিলাম। ছিপ দিয়া মৎস্য ধরিবার কৌশল, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলা, বাজারে ভাল দ্রব্য সস্তায় ক্রয় করা, পাক করা, রুটি লুচি পরটা তৈয়ারী করা, ছুতারের কার্য, বুক বাইণ্ডিং, গার্ডেনিং প্রভৃতি নানাবিধ শিল্পকার্য একবার দেখিবামাত্র আমি ঠিক ঠিক অনুকরণ করিতে পারিতাম।

বাল্যকাল হইতে আমার মনের একাগ্রতা অত্যন্ত তীব্র ছিল। আমার স্মরণশক্তিও ছিল অদ্ভুত। যাহা একবার শুনিতাম তাহা কখনও ভুলিতাম না। স্বল্পায়াসে সকল বিষয়ের কারণ ও রহস্য ধরিতে বুঝিতে পারিতাম। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আমি সকল রকমের পুস্তকই পাঠ করিতাম। স্কুলে জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া ঐ সকল পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করিতাম। পড়ার একান্ত আগ্রহ আমার বাল্যকাল হইতেই ছিল এবং পরিণত বয়সেও তাহা কমে নাই। চৌদ্দ-পনেরো বৎসর বয়সে পিতার লাইব্রেরীতে আমি একখানি ভগবদ্‌গীতা (সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদসহ) দেখিতে পাইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করি। একদিন পিতা আমাকে ভগবদ্‌গীতা পাঠ করিতে দেখিয়া তাহা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন : 'এ গ্রন্থ বালকদের পাঠোপযোগী নয়। এ' বয়সে গীতা পাঠ করলে পাগল হয়ে যাবি।' তিনি গীতাখানি লুকাইয়া রাখিলেন। তখন মণিহারা ফণীর ন্যায় আমি উদ্বিগ্নচিত্তে বাড়ীর সমস্ত ঘর তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিলাম, কিন্তু কোথায়ও গীতাখানি না পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িলাম। অবশেষে কে যেন কানে কানে বলিয়া দিল—উহা আলমারীর পশ্চাতে আছে। আমি তৎক্ষণাৎ তথায় খুঁজিতে গিয়া গীতাখানি পাইলাম। আনন্দের তখন আর সীমা রহিল না। গীতাখানি তখন লুকাইয়া রাখিলাম এবং গভীর রাত্রে যখন সকলে গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন থাকিতেন তখন আমার শুইবার ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া পরমানন্দে পাঠ করিতাম। আমার পিতা তাহার সম্বন্ধে আর কোন খোঁজ-খবর লন নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিক জাগরণ ॥

ইংরাজী ১৮৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে সরল বাংলাভাষায় অ্যালবার্ট হলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কতকগুলি বক্তৃতা দিয়া হিন্দুসভ্যদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে কলেজ ষ্ট্রীটে যেস্থানে 'এলবার্ট হল' অবস্থিত সেই স্থানে তখন একটা ক্ষুদ্র 'এলবার্ট হল' ছিল এবং তথায় কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজের স্কুল প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই হলে আমি নিয়মিতভাবে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা শুনিতে যাইতাম। সেই সকল বক্তৃতায় সাংখ্যদর্শনের ক্রমবিকাশবাদ ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 'ইভোলিউশন-থিওরী' উভয়ের সামঞ্জস্য দেখানো হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ 'বঙ্গবাসী' নামক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। আমি 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা পাঠ করিয়া সেই সকল বক্তৃতার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিতাম।

তাহা ছাড়া ঐ হলেই তর্কচূড়ামণি মহাশয় পাতঞ্জলদর্শনের যোগসূত্র ও যোগসাধনা সম্বন্ধে সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আমি ঐ সকল বক্তৃতা শুনিয়া যোগ শিক্ষা এবং পাতঞ্জলদর্শন পাঠ করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলাম। সুতরাং স্কুলের জলখাবারের পয়সা জমাইয়া একখানি পাতঞ্জলদর্শন ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে লাগিলাম। যদিও সংস্কৃত বুঝিতে পারিতাম, তথাপি যোগসূত্রসমূহের গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় একদিন শশধর তর্কচূড়ামণির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। চূড়ামণিমহাশয় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে বর্তমান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ের উপর ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বাস করিতেছিলেন। আমি চূড়ামণি-মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম: 'মহাশয়, আমার

পাতঞ্জল যোগসূত্র পাঠ করার ইচ্ছা হয়েছে, আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে সূত্রগুলির অর্থ ব্যাখ্যা ক'রে দেন তাহলে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়।' চূড়ামণি মহাশয় বলিলেন : 'বাবা, তোমার এই অল্প বয়সে যোগসূত্র পাঠ করার ইচ্ছা হয়েছে জেনে অত্যন্ত প্রীত হলাম। যদি আমার সময় থাকত তবে তোমাকে আনন্দের সঙ্গে পড়াতাম। কিন্তু এখন আমি বক্তৃতাদি দেওয়া নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত। তাছাড়া অনেক ভদ্রমহোদয় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। সেই সব কারণে এখন আমার সময় হবে না। তবে তুমি যদি কালীবর বেদান্তবাগীশের কাছে পড়তে যাও তিনি তোমাকে নিশ্চয় প্রীতির সঙ্গে পড়াবেন। আমি তোমায় তাঁর কাছে পাঠাচ্ছি এ কথা তুমি তাঁকে বলবে।' চূড়ামণি মহাশয় আমায় বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিলেন। অগত্যা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আমি বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎও হইল। বেদান্তবাগীশ মহাশয় আমার বক্তব্য আগ্রহাতিশয়ে শ্রবণ করিয়া প্রীত হইয়া বলিলেন : 'বর্তমানে আমি পাতঞ্জলদর্শনের বঙ্গানুবাদ লিখছি, সুতরাং আমারও বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। তবে তুমি যদি আমার স্নানের পূর্বে যখন সেবক আমার গাত্রে তেল মাখায় সে সময়ে আসতে পার তখন তোমায় যোগসূত্রের অর্থ বুঝিয়ে দিতে পারি।' অগত্যা আমি সম্মত হইলাম ও প্রত্যহ আটটা-নয়টার মধ্যে তাঁহার নিকট পাতঞ্জল যোগসূত্র পাঠ করিতে যাইতাম।

পাতঞ্জলদর্শন পাঠ করিতে করিতে অন্যান্য যোগশাস্ত্র পাঠ করিবার ইচ্ছা বলবতী হইতে লাগিল। তখন 'শিবসংহিতা' ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে লাগিলাম। ইহাতে হঠযোগ, কুণ্ডলিনীযোগ, প্রাণায়াম ও রাজযোগের সাধনপ্রণালীসমূহ বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। শিবসংহিতা পাঠ করিয়া আমি মনে মনে স্থির করিলাম যোগ সাধন করিয়া খেচরীমুদ্রা অভ্যাস করিব এবং টাকরায় (তালুতে) জিহ্বাগ্র দ্বারা শ্বাসনালীর দ্বার বন্ধ করিয়া জড়সমাধিতে বুদ (নিমগ্ন) হইয়া থাকিব।

কিন্তু শিবসংহিতা প্রভৃতি যোগশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, উপযুক্ত সিদ্ধ যোগীগুরুর নিকট হইতে যোগশিক্ষা করিতে হইবে, পুস্তক পাঠ করিয়া যোগসাধন করা সুখপ্রদ নহে। তখন আমার মনে বিষম চিন্তার উদয় হইল যে, যোগীগুরুর সন্ধান আমি কোথায় পাইব। সেই চিন্তায় আহার-নিদ্রা পর্যন্ত ত্যাগ হইয়া গেল, অথচ কাহারও নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

আমার পিতার মুখে এক হঠযোগীর কথা শুনিয়াছিলাম। কলিকাতার দক্ষিণে খিদিরপুরে ভূকৈলাসের রাজার কর্মচারিগণ সুন্দরবনে গভীর জঙ্গল কাটিতে গিয়া সেই হঠযোগীকে সমাধিস্থ দেখিতে পায়।

ঐ হঠযোগীর বাহ্যজ্ঞান ও দৈহিক কোন সংজ্ঞা ছিল না। তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পদদ্বয়ের মধ্যে যে ফাঁক ছিল তাহার মধ্য দিয়া একটি বৃক্ষ উঠিয়া বৃহদাকার ধারণ করিয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় হঠযোগীকে দেখিয়া রাজকর্মচারীরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তিনি বহুকাল ঐরূপ পদ্মাসনে অবস্থিত রহিয়াছেন। ঐ বৃক্ষটি না কাটিলে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা অসম্ভব মনে করিয়া অবশেষে তাহারা তাহা কাটিয়া সেই হঠযোগীকে সেইরূপ সমাধিস্থ অবস্থায় ভূকৈলাসে আনয়ন করিল। শত শত নরনারী সেই যোগীকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিল। জড়বাদী চিকিৎসকগণ তাঁহার বাহ্যচৈতন্য আনাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গঙ্গায় ভাঁটার সময় জলের ধারে খোঁটা পুঁতিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। পরে জোয়ার আসিলে জল তাঁহার মস্তকোপরি উঠিয়া তাঁহাকে ডুবাইয়া দিয়াছিল। ইহাতেও কিন্তু তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসে নাই। অবশেষে কোন ইংরাজ ডাক্তার শাঁড়াসি দিয়া যোগীর মুখ খুলিয়া জিহ্বা (যাহা উপরদিকে উল্টানো ছিল) টানিয়া বাহির করিয়াছিল। জিহ্বা টানিয়া বাহির করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাহ্যচৈতন্য ফিরিয়া আসিল। ইংরাজ ডাক্তার তাঁহার মুখে

মদ্য ঢালিয়া দিল। তাহাতে সেই হঠযোগী কাঁদিয়া বলিলেন : 'আমি বেশ ছিলাম, কেন আমাকে তোমরা জাগালে? এই ঘটনা আমার পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফল। আমার আর বাঁচার ইচ্ছা নাই।' তাহার পর তিনি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ দক্ষিণেশ্বরে গমন ॥

পিতার মুখে সেই হঠযোগীর কথা শ্রবণ করিয়া যোগসাধন দ্বারা সেইরূপ জড়সমাধিতে বসিয়া থাকিবার আমার ইচ্ছা হইল। তখন হইতে পিতা, মাতা, ভাই প্রভৃতি সকলকে আমি পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া দেখাইতাম এবং বলিতাম: 'আমি যোগীর মতো টাক্‌রায় জিহ্বা লাগিয়ে জড়সমাধিতে বসে থাকব।' আমার কথা শুনিয়া বাড়ীর সকলে হাসিত ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত। কিন্তু আমার তাহাতে দৃক্‌পাত ছিল না। কোথায় যোগীগুরু পাইব এই ভাবনায় আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। একদিন আমার সহপাঠী ও সুহৃদবন্ধু যজ্ঞেশ্বরকে (যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য) আমার মনের সকল কথা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যজ্ঞেশ্বর আমাকে ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিত ও 'ভাই কালী' বলিয়া সর্বদা ডাকিত। আমি তাহাকে একান্তে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম: 'ভাই, আমার যোগসাধন করার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু যোগীগুরু পাব কোথা? যোগীগুরু কোথা পাওয়া যায় তুমি কি বলতে পার?' যজ্ঞেশ্বর উত্তরে বলিল: 'হ্যাঁ, আমি জানি। এক অদ্ভুত যোগী পরমহংস দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে থাকেন। তাঁর কোন ভণ্ডামী নাই। তিনি যথার্থই মহাযোগী। বহু সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার নিকট যাতায়াত করেন এবং তিনিও মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসেন। তিনি বোধহয় তোমার যোগ শিক্ষা করার ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন।' যজ্ঞেশ্বরের মুখে সকল কথা শুনিয়া আমার হৃদয়ে আনন্দের সীমা রহিল না। আমি তৎক্ষণাৎ সঙ্কল্প করিলাম—যেমন করিয়াই হউক, সেই যোগী পরমহংসকে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে দেখিবার জন্য যাত্রা করিব। কিন্তু কোথায় রাণী রাসমণির সেই কালীবাড়ী এবং কি করিয়াই বা তথায়

যাইতে হইবে ? এই সকল ভাবিতে ভাবিতে আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। যজ্ঞেশ্বর তাহার বাসার ঠিকানা বাগবাজারে রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে বলিয়াছিল, কিন্তু তাহার বাড়ীর নম্বর আমার জানা ছিল না। সুতরাং নিরুপায় হইয়া একদিন আমার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ী কোথায়। আমার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন: 'কেন ?' আমি বলিলাম: 'সেখানে আমার যাবার ইচ্ছা হয়েছে। কিভাবে সেখানে যাওয়া যায় আপনি কি বলতে পারেন ?' আমার মাতা বিশেষভাবে সেই সকল খবর জানিতেন না, সুতরাং সঠিকভাবে আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। এখন উপায় কি ! পরমযোগী পরমহংসকে দেখিবার জন্য আমার মন ক্রমশই ব্যাকুল হইতে লাগিল। কি প্রকারে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পরমহংসদেবকে দর্শন করা যায় সে কথাই দিবারাত্র মনে হইতে লাগিল। অবশেষে একদিন রবিবার প্রাতে ভ্রমণকালে কাহাকেও কিছু না বলিয়া আমি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম ও চিৎপুর রোড ধরিয়া বাগবাজারের দিকে চলিতে লাগিলাম। বাগবাজারের নিকট রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞেশ্বরের বাসা খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহার বাসার নম্বর না জানায় তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। অথচ আমি তখন জানিতাম না যে, যজ্ঞেশ্বর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের গৃহস্থভক্ত বলরাম বসুর গুরুপুত্র ; সে ৫৭ নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে বলরামবাবুর বাড়ীতেই বাস করিত এবং সেই বাড়ীতে পরমহংস-দেব প্রায়ই আসিতেন।

যাহা হউক সেইদিন যজ্ঞেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় আমার মন দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে পরমহংসদেবকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অবশেষে নিজেই পথে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে যাইব স্থির করিলাম এবং হতাশ মন লইয়া পথের পথিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বরাভিমুখে চলিতে

লাগিলাম। বাগবাজারে খালের পোলের উপর দিয়া বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়া উত্তরদিকে ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম। অনেক দূর গমন করিয়া একজন পথিককে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ী কোন্ পথে জিজ্ঞাসা করিলাম। পথিকটী উত্তরে বলিল: 'সে তো এদিকে নয়, গঙ্গার ধারে। তুমি পথ ভুলেছ।' তখন আমি ঐ নির্দিষ্ট পথ ধরিয়াই গঙ্গাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে আড়িয়াদহ গ্রামের মধ্য দিয়া কালীবাড়ীর উত্তরদিকের ফটকে (gate) আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ক্রমে বেলতলা ও পঞ্চবটীর পাশ দিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। সেখানকার কোন কর্মচারীকে পরমহংসদেবের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি ঐ কালীবাড়ীতে একটি ঘরে থাকেন। কিন্তু সেইদিন তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন এবং তাঁর ঘর তালাবন্ধ রহিয়াছে। তখন বেলা প্রায় ১১টা। প্রখর রৌদ্রতাপে প্রাতঃকাল হইতে নগ্নপদে ভ্রমণ করিয়া আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। পরমহংসদেব নাই শুনিয়া হতাশ হইয়া ঘরের উত্তরদিকে সিঁড়িতে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম—তাহা হইলে কি প্রকারে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইব। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, শরীর পথশ্রান্ত, সঙ্গে পয়সা নাই, হাঁটিয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতা ফিরিয়া যাইবার শক্তিও ছিল না। এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম এবং ব্যাকুল হৃদয়ে এইদিক-সেইদিক তাকাইতে লাগিলাম যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়। বাগানের ফটকের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছি—এমন সময় এক যুবক ছাতা হাতে করিয়া আমার দিকে আসিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিল: 'পরমহংসদেব আছেন?' আমি বলিলাম: 'না, তিনি কলকাতায় গেছেন।' যুবক আমার কথা শুনিয়া একটু হতাশ হইয়া পড়িল। তখন দুইজনের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হইতে লাগিল। আমার দুরবস্থা দেখিয়া ও কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার কথা শুনিয়া যুবক আশ্বাস দিয়া

বলিল : ‘এখুনি কলকাতায় ফিরে যাবে কেন? এখানে গঙ্গায় স্নান ক'রে মা কালীর প্রসাদ পাও ও বিশ্রাম কর, পরে কলকাতায় যাবে।’ আমি বলিলাম : ‘আমি বাড়ীতে কাকেও বলে আসিনি। পিতামাতা আমায় অন্বেষণ ক'রে কষ্ট পাবেন।’ যুবক উত্তরে বলিল : ‘আমিও তো বাড়ীতে কাকেও কিছু না বলে কলকাতা থেকে পদব্রজে এখানে এসেছি। পিতামাতা একটু ভাবলো তো আর কি হবে। আমার সঙ্গে এস, গঙ্গায় স্নান করবে।’ আমি বলিলাম : ‘আমার কাপড়-গামছা তো নাই।’ যুবক বলিল : ‘এখানে একখানা কাপড় পাওয়া যেতে পারে।’ যুবকটি ইতঃপূর্বে দুই-তিনবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পরমহংসদেবের দর্শন লাভ করিয়াছিল এবং রামলালদাদা প্রভৃতি মন্দিরের পূজারী ও কর্মচারীদের নিকট পরিচিত হইয়াছিল। সুতরাং আমার স্নানাহারের কোন অসুবিধা হইল না। যুবককে পাইয়া আমার অশান্ত প্রাণ শান্ত এবং সকল দুঃখকষ্ট দূর হইল। পরমহংসদেবের কি অপার করুণা—ইহা ভাবিতে ভাবিতে আমার হৃদয় আনন্দসাগরে মগ্ন হইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, যুবকের নাম শশিভূষণ চক্রবর্তী, কলিকাতার কলেজের ছাত্র। যুবকের পরিচয় লাভ করিয়া মনে আনন্দ হইল। এই শশিভূষণ পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নামে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন।

সেইদিন হইতে শশিভূষণ আমাকে আপন সোদর ভ্রাতার তুল্য ভালবাসিত এবং তাঁহার ভালবাসা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।

যাহা হউক শশিভূষণের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিয়া মা কালীর প্রসাদ পাইয়া তৃপ্ত হইলাম। পরে বৈকালে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিলাম। তখন শশিভূষণ আমাকে বলিল : পরমহংসদেবকে দর্শন না ক'রে বাড়ী ফিরে যাওয়া উচিত নয়। এমন সুযোগ জীবনে আবার ঘটবে কিনা তার কি নিশ্চয়তা আছে। যখন এত কষ্ট স্বীকার ক'রে তাঁর দর্শনের জন্য এখানে এসেছ তখন অপেক্ষা করাই

ভাল।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: 'পরমহংসদেব তাহলে আসবেন? আর যদি আজ না আসেন?' শশিভূষণ বলিল: 'তিনি নিশ্চয়ই সন্ধ্যার পর কলকাতা থেকে ফিরে আসবেন। তিনি কলকাতায় কারও বাড়ীতে রাত্রিযাপন করেন না।' আমি ভাবিতে লাগিলাম—পিতামাতাকে না বলে আমি কখনও এভাবে কোথায়ও যাই না। তাঁদের না জানিয়ে বাড়ী থেকে এতদূর চলে এসেছি। না জানি তাঁরা কত রকম চিন্তায় অধীর হয়ে আমায় খুঁজছেন এবং কোথায়ও আমার সন্ধান না পেয়ে সম্ভবতঃ রোদন করছেন। এখানে সমস্ত দিন তো কেটে গেল, এখন আমার বাড়ীতে ফিরে যাওয়াই উচিত। যদি আমি এখানে রাত্রিযাপন করি তাহলে মায়ের প্রাণে অত্যন্ত মর্মবেদনা দেওয়া হবে।—এই রকম কত চিন্তা, কত কল্পনা মনের মধ্যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিল, কোন কিছুই স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না। আবার মনে হইতে লাগিল আমি যোগশিক্ষা করিবার জন্য গুরুর অন্বেষণে বাহির হইয়াছি, যোগীগুরু না পাইলে প্রাণে শান্তি পাইব না, সুতরাং যখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছি তখন পরমহংসদেবের দর্শন না পাইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইলে পুনরায় হয়তো দর্শন করিবার জন্য এইখানে আসিতে হইবে। কিন্তু সেই সুযোগ আবার কতদিনে ঘটিবে! ইতিমধ্যে কত বাধাবিঘ্নও আসিতে পারে তাহা কে বলিতে পারে। 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি' এই কথা শাস্ত্রে আছে, সুতরাং আমার কি করা কর্তব্য। পিতামাতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বাড়ী ফিরিয়া যাইব—না পরমহংসদেবকে দর্শন করিবার জন্য কালীবাড়ীতেই আজ রাত্রিযাপন করিব? এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে আমার চিত্ত দোলায়মান হইল। আমি পূর্বের ন্যায় কোন-কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলাম। আমার অবস্থা হইল কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জুনের মতো। ভীষণ সমস্যায় পতিত হইয়া নীরবে ভাবিতে লাগিলাম—কর্তব্য কি? শশিভূষণ আমার মনের অবস্থা বুঝিয়া বলিল: 'ভাই, এত ভাবনা কিসের

জন্য ? এই দেখ—আমিও পিতামাতাকে না বলে এখানে এসেছি। আজ রাত্রে এখানেই থাকব। তোমার অবস্থা আমারই মতো। পিতামাতা একটু চিন্তা ক'রে কাতর হবে, তারপর যখন তোমাকে নিকটে পাবে তখন আবার আনন্দিত হবে। তুমি যখন এখানে সমস্ত দিন কাটালে তখন আর অল্পক্ষণের জন্য কেন বাড়ী ফিরে যাবে। এখানে রাত্রিযাপন ক'রে আগামীকাল প্রাতে কলকাতায় ফিরে যাবে। আজ আমার সঙ্গে এই পবিত্র স্থানেই রাত্রিযাপন কর।'

শশিভূষণের উপদেশে আমার বাড়ীর ও মাতাপিতার চিন্তা প্রশমিত হইল। স্থির করিলাম যোগী-পরমহংসদেবকে দর্শন না করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইব না, অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার ঘটুক। তাহার পর শান্ত মনে আমি পরমহংসদেবের দর্শনাভিলাষে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ সূর্য অস্তাচলে গমন করিল ও সন্ধ্যার অন্ধকার আসিয়া সমগ্র পৃথিবী আবৃত করিল। এইদিকে দক্ষিণেশ্বরে দেব-দেবীর মন্দিরে আরাত্রিকের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। শশিভূষণ আমাকে লইয়া কালীমন্দিরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর আরাত্রিক দেখিতে চলিল। এইরূপ জাগ্রত প্রতিমা মা কালীর আরাত্রিক দর্শন করিয়া আমি মনে-প্রাণে অভূতপূর্ব শান্তি ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। আরাত্রিকের পর দেবীকে প্রণাম করিয়া শশিভূষণের সঙ্গে পরমহংস-দেবের ঘরের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। শশিভূষণ নানান্ প্রসঙ্গ তুলিয়া আমার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজারী রামলালদাদা শীতলভোগের প্রসাদ দুইখানি লুচি ও একটু চিনি শশিভূষণ ও আমাকে দিয়া জলযোগ করিতে বলিলেন। প্রসাদ পাইয়া দুইজনে মন্দিরে শয়ন করিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শন ও দীক্ষাদান ॥

আমি ইতঃপূর্বে জটাজুটপূর্ণ মস্তক, কৌপীনধারী ও ভস্মাচ্ছাদিত অঙ্গ, লোহার চিমটাহস্তে এবং গৈরিকবসনাবৃত সন্ন্যাসী দেখিয়াছিলাম। এখন কল্পনা করিতে লাগিলাম পরমহংসদেব বোধ হয় সেই ধরনের জটাধারী, কৌপীনধারী চিমটাহস্তে, ভস্মমাখা একজন সন্ন্যাসীবেশধারী সাধু হইবেন। এইরূপ কল্পনায় আমার প্রাণে অত্যন্ত ভয় হইল যে, তিনি যদি অসন্তুষ্ট হইয়া চিমটা লইয়া আমায় প্রহার করেন, অথবা তাড়াইয়া দেন! তখন নানান্ চিন্তা আমার মনে উদিত হইতে লাগিল। এমন সময়ে দূরে একখানি ছ্যাক্ড়া গাড়ীর চাকার ঘরঘর শব্দ শুনিয়া শশিভূষণ ও রামলালদাদা বলিলেন: 'এবার পরমহংস-দেবকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ী আসছে। তিনি কলকাতায় গৃহস্থবাড়ীতে কোনদিন রাত্রিযাপন করেন না।' তখন আমরা সকলেই পরমহংস-দেবের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ ছ্যাকৃড়া গাড়ী পরমহংসদেবের ঘরের উত্তর-পূর্বদিকে সিঁড়ির ধারে আসিয়া থামিল। শশিভূষণ, রামলালদাদা ও আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম। আমার বুকের ভিতর দুরদুর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরমহংসদেব গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া বারান্দার সিঁড়ির উপর দিয়া দক্ষিণে বারান্দায় প্রবেশ করিবার দ্বার দিয়া আসিতেছেন এবং গুরুগম্ভীর স্বরে 'কালী, কালী, কালী' তিনবার উচ্চারণ করিলেন। তাহার পর তিনি তাঁহার ঘরের মধ্যে পাতা একটি ছোট তক্তাপোষে উপবেশন করিলেন। পশ্চাতে একজন সেবক (লাটু মহারাজ) পরমহংসদেবের গামছা ও বটুয়া (যাহাতে এলাইচ প্রভৃতি মুখশুদ্ধি থাকিত) লইয়া প্রবেশ করিলেন। পরমহংসদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালদাদা (মা কালীর পূজারী) ও শশিভূষণ ঘরে প্রবেশ

করিয়া পরমহংসদেবের শ্রীচরণে প্রণাম করিলেন এবং আমার আগমন-বৃত্তান্ত তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। আমি তখনও ভয়ে ও ভক্তিতে নির্বাক হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছি। মনে কোনপ্রকার প্রশ্নই উঠিতেছে না, অথচ কত-কিছু ভাবিয়া চলিয়াছি। এমন সময়ে রামলালদাদা আমার নিকট আসিয়া বলিলেন: 'পরমহংসদেব তোমায় আহ্বান করছেন।' আমি ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম ও পরমহংসদেবের শ্রীচরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিলাম। তখন শরীরের সমস্ত গ্লানি দূর হইয়া যেন পরমাশান্তির স্রোতে ভরিয়া গেল। পরমহংসদেব সস্নেহে আমাকে মাদুরের উপর উপবেশন করিতে বলিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: 'তুমি কে? বাড়ী কোথায়? নাম কি? তুমি কি জন্য এত কষ্ট করে এখানে এসেছ? কি চাও?' ইত্যাদি কত-কিছু। আমি ভক্তিগদগদকণ্ঠে বলিলাম: 'আমার যোগ শিক্ষা করার ইচ্ছা। আপনি কি আমায় যোগসাধনা শিক্ষা দেবেন?' পরমহংসদেব এই কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন: 'তোমার এই অল্পবয়সে যোগসাধন করার ইচ্ছা হয়েছে—এ খুব ভাল লক্ষণ। তুমি পূর্বজন্মে এক বড় যোগী ছিলে। একটু বাকী ছিল। এই তোমার শেষজন্ম। হ্যাঁ, আমি তোমায় যোগ শিক্ষা দেব। আজ রাত্রি এখানে বিশ্রাম কর, কাল প্রাতে আবার এসো।' আমি শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম ও পরমহংসদেবের শ্রীচরণে বারবার প্রণাম করিয়া তাঁহার ঘর হইতে বাহিরে বারান্দায় আসিলাম। দেখিলাম, পরমহংস-দেবের বাইরের বেশভূষা ও আড়ম্বর কিছুই নাই। একেবারে সাধারণ ও সাদাসিধা দেখিয়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—কই, ইঁহার জটা, গেরুয়াবস্ত্র অথবা সন্ন্যাসীর চিমটা প্রভৃতি কিছুই দেখিতেছি না। ইঁহার মস্তকও মুণ্ডিত নহে। বরং মস্তকে অল্প চুল ও দাড়ি রহিয়াছে এবং পরিধানে লালপেড়ে সাদা কাপড়, পায়ে চটিজুতা, গায়ে একটি জামা এবং কোঁচার খোঁট কাঁধে ফেলা রহিয়াছে।

দেখিলাম, ঘরে খাটের উপর গদি ও তাকিয়া রহিয়াছে। আমি

বিহ্বলান্তঃকরণে দাঁড়াইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। ইতি-মধ্যে শশিভূষণ পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং রামলালদাদাও আমার সঙ্গে মাছুরে শয়ন করিলেন। কিন্তু আমার চক্ষে নিদ্রাদেবী কিছুতেই আবির্ভূত হইলেন না। সমস্ত রাত্রি নানাপ্রকার চিন্তায় অভিভূত হইয়া নিস্তব্ধে পড়িয়া রাত্রিযাপন করিলাম। ক্রমে প্রাতঃকালে বিহঙ্গমকুলের কূজনে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্তে পরমহংসদেবের বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং কখন্ তাঁহার সহিত আবার সাক্ষাৎ হইবে তাহা ভাবিতে লাগিলাম। বলিতে কি—মনের মধ্যে তখন এক পবিত্র ভাব ও অব্যক্ত আনন্দের হিল্লোল বহিতেছিল।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম উপদেশ ॥

কিছুক্ষণ পরে রামলালদাদা আমায় পরমহংসদেবের ঘরে যাইতে বলিলেন। আমি প্রবেশ করিয়া পরমহংসদেবের চরণে প্রণাম করিলাম এবং তাঁহার আদেশে মাছুরের উপর উপবেশন করিলাম। পরমহংসদেব আমার দিকে চাহিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'তুমি কতদূর পড়েছ ?'

আমি বলিলাম, 'আজ্ঞে, এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়ছি।'

পরমহংসদেব। 'তুমি সংস্কৃত জান ? কোন্ কোন্ শাস্ত্র পড়েছ ?'

আমি। 'আমি রঘুবংশ, কুমারসম্ভবাদি কাব্য এবং ভগবদ্গীতা, পাতঞ্জলদর্শন, শিবসংহিতা প্রভৃতি পড়েছি।'

পরমহংসদেব 'বেশ, বেশ' বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। পরে আমায় ঘরের উত্তরদিকের বারান্দায় লইয়া গেলেন। সেইখানে একটি তক্তাপোষ পাতা ছিল, তিনি তাহার উপর আমায় সস্নেহে বসিতে আদেশ করিলেন। আমি উপবেশন করিলে পরমহংসদেব আমায় জিহ্বা বাহির করিতে বলিলেন। আমি জিহ্বা বাহির করিলে তিনি তাঁহার দক্ষিণহস্তের মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা জিহ্বায় একটি মূলমন্ত্র

লিখিয়া শক্তি সঞ্চার করিলেন ও তাঁহার দক্ষিণহস্ত দ্বারা বক্ষঃস্থলে উধ্বর্দিকে শক্তি আকর্ষণ করিয়া মা কালীর ধ্যান করিতে বলিলেন। আমি তাহাই করিলাম। আমি ধ্যান করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম। গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া যেন সমাধিস্থ হইয়া কাষ্ঠবৎ অবস্থান করিতে লাগিলাম এবং অন্তরে এক অপূর্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। তখন জগতের সমস্ত বিষয় ভুল হইয়া গেল। এই-ভাবে কতক্ষণ ছিলাম জানি না, তবে কিছুক্ষণ পরে পরমহংসদেব আমার বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া কুণ্ডলিনীশক্তি নিম্নদিকে নামাইয়া আনিলেন। তখন আমার বাহ্যচৈতন্য ফিরিয়া আসিল এবং অপূর্ব এক নির্মল আনন্দস্রোতে সমগ্র শরীর পূর্ণ হইয়া গেল! আমার সেই অবস্থা দেখিয়া পরে রামলালদাদা ও গোলাপ-মা বলিয়াছিলেন: 'কি আশ্চর্য, তোমাকে স্পর্শ করামাত্র তুমি কাষ্ঠবৎ ধ্যানমগ্ন হয়ে গিয়েছিলে।' যাহা হউক, আমি গভীর ধ্যানে কি অনুভব করিয়াছিলাম পরমহংসদেব সস্নেহে আমায় জিজ্ঞাসা করিলে আমি সমস্তই তাঁহাকে বলিলাম। তিনি শুনিয়া আনন্দে হাসিতে লাগিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন: 'তোমার বিবাহ কর্‌বার ইচ্ছা আছে?' আমি বলিলাম: 'না।' তখন পরমহংসদেব বলিলেন: 'তুমি বিবাহ করো না।' তাহার পর কিরূপে ধ্যান করিতে হয় তাহা শিক্ষা দিয়া তিনি বলিলেন,

> শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
> দুই সতীনে পিরীত হ'লে তবে শ্যামা মাকে পাবি॥[১]

১। এখানে উল্লেখ করিলে বোধহয় অসমীচীন হইবে না যে, পরবর্তী কালে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিযাছিলেন: 'শ্রীশ্রীঠাকুর যখন আমায় এই কথা বলিয়া এইভাবে আমাকে দীক্ষা দান করেন তখন কথাগুলির গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। পরে বুঝিয়াছি, দুইয়ের পারে না গেলে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অনুভূতি লাভ করা দুরূহ। শুচি বা ভালোর জ্ঞান থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে অশুচি বা মন্দের জ্ঞানও থাকিবে, দুইয়ের জ্ঞান লইযাই সংসারের ব্যবহার। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে দুই জ্ঞানের (সৎ ও অসৎ) অতীত হইতে হয়। করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর তাই দীক্ষার প্রথমেই আমায় শুচি অশুচি এই দ্বৈতজ্ঞানের পারে যাইবার উপদেশ দিয়াছিলেন। ভেদবুদ্ধিই অজ্ঞান।

করুণাময় পরমহংসদেব এইরূপে আমায় দিব্যভাবের দীক্ষা দান করিয়াছিলেন এবং প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রে শয়নের পূর্বে বিছানায় বসিয়া ধ্যান করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া যখন যাহা ধ্যানে দর্শন হইবে তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে তিনি আদেশ দিয়াছিলেন।

তৎপরে পরমহংসদেব আমাকে মা কালীর মন্দিরে গিয়া ধ্যান করিতে আদেশ করেন। আমি মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিলে পরমহংসদেব আমার হস্তে মিষ্টান্ন প্রসাদ দিয়া জলপান করিতে বলেন। আমি জলপান করিয়া কলিকাতায় কিরূপে ফিরিয়া যাইব ভাবিতে লাগিলাম। পরমহংসদেব বুঝিতে পারিয়া বলিলেনঃ 'তুমি পুনরায় এখানে আসবে।' পরে কি প্রকারে আসিতে পারা যায়—যথা নৌকা অথবা গাড়ী করিয়া, ভাড়া দক্ষিণেশ্বরে কত লাগে ইত্যাদি বলিয়া দিলেন। আমি বলিলামঃ 'আমি ভাড়া যদি যোগাড় করতে না পারি?' পরমহংসদেব বলিলেনঃ 'এখান থেকে তোমার যাতায়াতের ভাড়া দেওয়া হবে।'

ইতিমধ্যে কোন একজন ভক্ত কলিকাতা হইতে গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন পরমহংসদেব সেই গাড়ীতে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার জন্য আমায় আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীচরণে প্রণাম করিলাম ও তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম। আমি গাড়ীর কোচবক্সে বসিয়া কলিকাতা-অভিমুখে যাত্রা করিলাম এবং পরমহংসদেবের অপার করুণা ও স্নেহের কথা সমস্ত রাস্তা ভাবিতে লাগিলাম। পূর্বাহ্ণেই বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। আমাকে দেখিয়া আমার মাতা ও বাড়ীর সকলের আনন্দের সীমা রহিল না।

ব্রহ্মোপলব্ধি লাভ করিতে হইলে ভেদবুদ্ধি বা দ্বৈতজ্ঞানের পারে যাইয়া অদ্বৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়।'

॥ আমার বাড়ী আসার পূর্বে পিতামাতার অবস্থা ॥

রবিবার মধ্যাহ্ন পর্যন্ত আমি যখন ফিরিয়া আসিলাম না, তখন বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিয়া বলিলেন: 'খোঁজ খোঁজ, কালী কেন এল না? কালী কোথা গেল?' পিতা প্রতিবেশিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন আমার কোন সন্ধান পাইলেন না, তখন ভাবনায় অধীর হইয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই আমার কোন সংবাদ দিতে পারিল না। তিনি ভাবিলেন, বোধ হয় আমি গঙ্গার জলে ডুবিয়া গিয়াছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, ক্রমে রাত্রি হইল, তথাপি আমার কোন সংবাদ মিলিল না। অবশেষে আমার মাতার স্মরণ হইল যে, একদিন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ী কোন্ দিকে, সুতরাং বোধহয় আমি দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে গিয়াছি। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পিতাকে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। মাতার অনুরোধ পিতা অবহেলা করিতে পারিলেন না। তিনি পরদিন প্রাতে দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইদিকে আমিও পরমহংসদেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ছ্যাকড়া গাড়ী করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছি। যাহা হউক, তিনি দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া হন্তদন্তভাবে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন: 'এইমাত্র রওয়ানা হয়েছে।'

পিতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন। তিনি দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় ফিরিবার সময়ে পরমহংসদেবকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিলেন: 'কালীপ্রসাদ আমার পুত্র। সে যাতে বিবাহ ক'রে সংসারী হয় আপনি অনুগ্রহ ক'রে তাকে উপদেশ দেবেন।' পরমহংসদেব উত্তরে বলিয়াছিলেন:

'আপনার পুত্র পরমযোগী, সে যখন বিবাহ করতে চায় না তখন তাকে জোর করে বিবাহ দিলে কি কোন ফল হবে?' আমার পিতা বলিয়াছিলেন: 'পিতামাতার সেবাই পরমধর্ম।' ইহা শুনিয়া পরমহংসদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তখন আমার পিতা বুঝিতে পারেন নাই যে, পরমহংসদেব আমাকে জগৎপিতার সেবা করিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, আমার পিতা অবশেষে পরমহংসদেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন, নির্বিঘ্নে বাটীতে উপস্থিত হন।

ইতিমধ্যে আমি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছি। হারানো রত্ন প্রাপ্ত হইলে যেইরূপ আনন্দ হয় সেইরূপ আমাকে পাইয়া আমার মাতা আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। মাতাঠাকুরাণী আমায় বলিলেন: 'আমি তো অনুমান করেছিলাম যে, তুমি রাসমণির কালীবাড়ীতে গেছ আর সেজন্য তোমার পিতাকে আমি দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য অনুরোধ করি। এখন দেখছি আমার অনুমানই সত্য।' এই ঘটনার দুই তিন ঘণ্টা পরে আমার পিতাও গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। বাড়ীর অন্যান্য সকলেও শান্ত হইলেন এবং সকল গণ্ডগোল মিটিয়া গেল। আমার পিতা সৌভাগ্যক্রমে এই উপলক্ষ্যে পরমযোগী পরমহংসদেবের দর্শনলাভে কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনলাভ বহু পুণ্যফলে ঘটিয়া থাকে। পরমহংসদেবও বলিতেন: 'যার শেষজন্ম সে এখানে আসবে।' আমার পিতা যে পরমহংসদেবকে দর্শন করিয়াছেন এই কথা ভাবিয়া আমারও অত্যন্ত আনন্দ হইতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

॥ দিব্যদর্শন ॥

পরমহংসদেবকে দেখার পর হইতে ক্রমাগতই তাঁহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা আমার মনে বলবতী হইতে লাগিল। দক্ষিণেশ্বর যাইবার জন্য একটি তীব্র আকর্ষণ মনে অনুভব করিতে লাগিলাম। অনুভব করিতে লাগিলাম, পরমহংসদেব আমাকে যেন টানিতেছেন। রাত্রে শয়নের পূর্বে পরমহংসদেবের আদেশক্রমে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিছানায় বসিয়া ধ্যান করিতাম এবং প্রত্যহই আমার নূতন নূতন দিব্যদর্শন হইতে লাগিল। লেখাপড়ায় আর আমার মন বসিত না, কেবল ধ্যান করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইতে লাগিল। বাড়ীর কোন কাজকর্ম করিতে ভাল লাগিত না। এইরূপ উন্মনাভাব দেখিয়া আমার পিতামাতা আমাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু কাহাকেও কিছু না বলিয়া আমি আহিরীটোলার ঘাট হইতে নৌকায় এক আনা ভাড়া দিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই পলাইয়া যাইতাম। পরমহংসদেবও আমাকে ঘন ঘন যাইতে বলিতেন এবং মধ্যে মধ্যে নৌকাভাড়ার পয়সা যোগাড় করিয়া দিতেন। তিনি আমায় বলিতেন: 'তুই না এলে, তোকে না দেখলে, আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়। তোকে রোজ দেখতে ইচ্ছা হয়।' আমি উত্তরে বলিতাম: 'আমার পিতামাতা এখানে আসতে আমায় নিষেধ করেন।' তিনি বলিতেন: 'তুই কাকেও কিছু না বলে পালিয়ে আসবি। পয়সা না থাকলে এখান হতে নিবি।' পরমহংসদেবের স্নেহমাখা কথা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিত। ভাবিতাম—আহা, তাঁহার কি দয়া ও অপূর্ব ভালবাসা! পিতামাতার ভালবাসাও স্বার্থজড়িত থাকে, কিন্তু পরমহংসদেবের ভালবাসায় কোন স্বার্থ নাই। তিনি আমার কল্যাণ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আমাকে ভালবাসেন এবং তাই সর্বদা দেখিতে চাহেন।

এইরূপ নিঃস্বার্থ ভালবাসা আমি আর কখনও কাহারও নিকট পাই নাই।

দেখিলাম, ক্রমশই তাঁহার অহৈতুকী ভালবাসা ও প্রেমরজ্জু দ্বারা পরমহংসদেব আমার হৃদয় বাঁধিয়া ফেলিলেন। বাড়ীতে মন আর একেবারেই টিকিত না, সর্বদাই পরমহংসদেবের সঙ্গে থাকিব এই ইচ্ছা হইত। তাই সুবিধা পাইলেই দক্ষিণেশ্বরে পলাইয়া যাইতাম। এক-দিনের কথা, সেইদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য ভীষণ আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার পিতা আমাকে কিছুতেই বাড়ী হইতে বহির্গত হইতে দিবেন না। কি করি, কোন উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, বিপদ হইলে আরও অধিক। পিতা আমার ভাবগতিক দেখিয়া ঐদিন সদর-দরজায় তালা লাগাইয়া আমায় বন্ধ করিয়া রাখিলেন। নিরুপায় ভাবিয়া আমিও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলাম এবং ভাবিলাম, বাড়ীর সদর-দরজায় তালা বন্ধ করিয়া আর কতক্ষণ রাখিবেন, খোলা পাইলেই পলাইয়া যাইব। তখন বৈকাল হইবে। পিতা ভাবিলেন, আমি আর হয়ত বাহির হইব না। তিনি দরজা খুলিয়া দিলেন। আমি আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম ও দৌড়াইয়া আহিরীটোলার ঘাটে উপস্থিত হইলাম এবং একটি নৌকা দেখিয়া তাহাতে উঠিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলাম। পরমহংসদেব আমাকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। আমি তাঁহার চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিলাম এবং বাড়ীতে ধ্যানকালে যাহা দেখিতাম ও অনুভব করিতাম তাঁহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিলাম। আমার হৃদয় তখন আশ্বস্ত ও শান্ত হইল। পরমহংসদেব শুনিয়া বলিলেন: 'ঠিক হচ্ছে। ও'রকমই করবি। যা দেখবি ও অনুভব করবি এখানে এসে বলবি।' তাহাই করিতাম। বাড়ীতে থাকিয়া ধ্যান করিবার সময় ধ্যানে আরও যাহা যাহা দেখিতাম বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিয়া দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবকে সমস্ত বলিতাম। সেইদিন রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে

পরমহংসদেবের নিকট থাকিয়া গেলাম, তখন বাড়ীর কথা আর মনে রহিল না।

একদিন বাড়ীতে আমি ধ্যান করিতে করিতে ঈশ্বরের সর্বদর্শী দুইটি বৃহৎ চক্ষু (omnipresent eyes)—"দিবীব চক্ষুরাততম্" দেখিতে পাইলাম। বিশাল আকাশের ন্যায় বিস্ফারিত সেই চক্ষু সর্বত্র বিস্তৃত। এইরূপে প্রত্যহ প্রাতে ও শয়নের পূর্বে রাত্রে আমি গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকিতাম এবং নানান্ দেবদেবীর দিব্যরূপ দর্শন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া তাহাদের বিষয় বর্ণনা করিতাম। তাহার পর দক্ষিণেশ্বরে যাইলে পরমহংসদেবের অনুমতি লইয়া তাঁহার পদসেবা করিতাম। দক্ষিণেশ্বরের বাগানের উত্তরদিকে একটি বারুদখানা (powder magazine) ও ঝাউগাছের সারি ছিল। পরমহংসদেব সেই ঝাউগাছের তলায় গঙ্গার ধারে প্রতিদিন শৌচ করিতে যাইতেন। কখনও কখনও আমাকে তিনি গাড়ু লইয়া সঙ্গে যাইতে বলিতেন ও আমার স্কন্ধে হাত দিয়া উপদেশ দিতে দিতে পঞ্চবটী পার হইয়া ঝাউতলা যাইতেন। আমি গাড়ু লইয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতাম। এইরূপে পরমহংসদেব আমাকে যেন তাঁহার অন্তরঙ্গপার্ষদ করিয়া আমার স্কন্ধে হাত দিয়া কখনও পঞ্চবটীতে, কখনওবা বাগানে বেড়াইতেন। আমাকে গল্পচ্ছলে বাগবাজারের বলরাম, সুরেশ, গিরিশ ও রামবাবু, মহেন্দ্রমাষ্টার প্রভৃতি গৃহস্থভক্তের কথা বলিতেন; তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতে ও তাঁহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে বলিতেন। নরেন্দ্রনাথ ও বাবুরাম প্রভৃতি যুবক-ভক্তদের কথাও বলিতেন। একদিন আমাদের বাড়ীর ঠিকানা জানিতে পারিয়া বলিলেন: 'তোদের পাড়ায় দেবেন মজুমদার নামে একজন ভক্ত আছে। সে বেশ উন্নত। তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবি। সে প্রায় দক্ষিণেশ্বরে আসে। আমাকে তার বাসায় নিমন্ত্রণ করেও নিয়ে গিছলো। বাগবাজারে রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে বলরাম বসুর বাড়ী। সেখানে ও সিমলার রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে যখন

আমায় নিয়ে যাবে তখন সেখানে তুই যাবি এবং তাদের সঙ্গে আলাপ করবি।'

দক্ষিণেশ্বরে যাইতে যাইতে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে গৃহস্থ ও যুবক-ভক্তগণের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হইতে লাগিল। ১৫ই জুন, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সুরেশবাবুর বাগানে মহোৎসব হইয়াছিল। আমিও মহোৎসবে উপস্থিত ছিলাম। একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছি, সেইখানে আমার সহপাঠী বাবুরাম ঘোষকে (স্বামী প্রেমানন্দ) দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম। অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম: 'কি হে, তুমি এখানে?' বাবুরাম উত্তরে বলিল: 'কি, তুমিও এখানে?' দুইজনেরই মহা-আনন্দ হইল। সেইদিন হইতে বাবুরাম ও আমার মধ্যে চিরকালের জন্য আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইল। পরমহংসদেবের আদেশানুসারে আমি অনুসন্ধান করিতাম কখন্ কোন্‌দিন তিনি কোন্ গৃহস্থভক্তের বাড়ীতে কলিকাতায় যান এবং সেইখানে তাঁহার দর্শনলাভের জন্য আমি প্রতীক্ষা করিতাম। তিনি যখন কলিকাতায় বলরাম বসু, রাম দত্ত, সুরেশ মিত্র, গিরিশ ঘোষ প্রভৃতি ভক্তের বাড়ীতে পদধূলি দিতেন তখন আমি তথায় উপস্থিত থাকিতাম এবং তাঁহার ভক্তগণের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতাম।

একদিন বলরামবাবুর বাড়ীতে পরমহংসদেব আসিয়াছেন শুনিয়া আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। সেইখানে আমার সহপাঠী যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যকে দেখিয়া অবাক হইলাম ও জিজ্ঞাসা করিলাম: 'তুমি এখানে যে? কি করছ?' যজ্ঞেশ্বরও আমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইল। সে বলিল: 'আমি তো এখানে থাকি।' তাহার পরিচয় হিসাবে সে সেইদিন বলরামবাবুর গুরুপুত্র এই কথা জানাইয়া দিল।

নবম পরিচ্ছেদ

॥ বলরামবাবুর বাড়ীতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ॥

৩রা জুলাই, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। শশধর তর্কচূড়ামণি সেইদিন বলরাম বসুর বাড়ীতে আসিয়াছেন। বলরাম বসুর বাড়ীতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাঁহাদের নিত্যপূজা, আরাত্রিক ও অন্নভোগ হইত। পরমহংসদেব কলিকাতায় কাহারও বাড়ীতে অন্নগ্রহণ করিতেন না, কেবল বলরাম বসুর বাড়ীতে জগন্নাথের অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন। সেইদিন ঐ বাড়িতে রথযাত্রার দিন। একটি ছোট রথে জগন্নাথদেবের মূর্তি বসাইয়া দোতলার বারান্দার চারিদিকে রথ টানা হইত। সেইদিন পরমহংসদেব বলরামবাবুর বাড়ীতে আসিবেন সংবাদ পাইয়া চতুর্দিক হইতে ভক্তগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে সেইখানে সমবেত হইয়াছেন। আমি সংবাদ পাইয়া বৈকালে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি গৃহস্থ-ভক্তগণ ও নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যুবক ভক্তেরা খোল করতাল বাজাইয়া সঙ্কীর্তন করিতেছেন এবং পরমহংসদেব ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বসিয়া আছেন। ক্রমে রথ টানিবার সময় উপস্থিত হইল। পরমহংসদেব রথের সম্মুখে বারান্দায় ভাবাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলকেও তিনি নৃত্য করিতে আদেশ দিলেন। আমিও সেই দলে যোগদান করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলাম। সেই আনন্দোৎসবের আনন্দ-স্মৃতি আজিও আমার হৃদয়পটে চিরস্মরণীয়ভাবে অঙ্কিত হইয়া আছে।

॥ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান ও শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষের ষ্টার থিয়েটারে পরমহংসদেব যখন চৈতন্যলীলা[১] ও প্রহ্লাদচরিত্র[২] দেখিতে ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন তখন

১। ২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৯। ২। ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮৪

আমিও তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলাম। প্রতি সপ্তাহে শনিবার ও রবিবার দক্ষিণেশ্বরে ভক্তগণ পরমহংসদেবকে দর্শন করার জন্য সমবেত হইতেন। প্রতি শনিবারই বৈকালে আমি দক্ষিণেশ্বরে যাইতাম এবং সেই-খানে রাত্রিযাপন ও রবিবার বৈকালে ভক্তগণের সঙ্গে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিতাম। এইরূপে প্রত্যেক গৃহস্থ ও যুবক-ভক্তের সহিত আমি পরিচিত হইতে লাগিলাম।

পরমহংসদেবের উপদেশ শুনিয়া সত্যই প্রাণে অপূর্ব শান্তি অনুভব করিতাম। কখনও তিনি ভাবাবেশে হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন ও নাচিতেন, আবার কখনওবা সমাধিস্থ হইয়া থাকিতেন। আবার কখনওবা মধুরকণ্ঠে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণের রচিত গান করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। কখনও কখনও তিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা কীর্তন করিতেন। কখনও বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবমহাজন-রচিত 'পদাবলী' গান করিতেন এবং গভীরভাবে মাতোয়ারা হইয়া গানে নূতন নূতন আখর দিতেন। কখনও বা পরমবৈষ্ণব তুলসীদাস যেইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন সেইরূপে রাম-সীতার লীলা বর্ণনা করিতে করিতে ভাবাবেশে তিনি পরমানন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া যাইতেন। সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাব পরমহংসদেবের জীবনে প্রত্যহ প্রতিফলিত হইতে লাগিল ও সকলকে তিনি 'যত মত তত পথ' এই সার্বভৌমিক ভাবের কথা উপদেশ দিতেন। আমি সেই সকল উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অপূর্ব আনন্দে মগ্ন থাকিতাম।

ক্রমে মহেন্দ্রমাষ্টার মহাশয়ের সহিত আলাপ-পরিচয় হইবার পর একদিন তিনি আমায় বলিয়াছিলেন: 'তুমি পরমহংসদেবের উপদেশ যা শুনবে—সব লিখে রাখবে। আমি ডায়েরীতে লিখে রাখি, কিন্তু আমি তো সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত থাকি এবং স্কুলে পড়াই, সেজন্য প্রতিদিন আসতে সময় পাই না। তোমরা পরমহংসদেবের সঙ্গে অধিক সময় অতিবাহিত কর। তারি জন্য বলছি যে, তাঁর অসাধারণ উপদেশগুলি লিখে রাখবে।' এই কথা শুনিয়া আমি তখন হইতে

পরমহংসদেবের কথামৃত লিখিয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে ভাবিলাম যে, কাগজে লিখিয়া রাখিয়া কি হইবে—যদি না তাঁহার উপদেশানুযায়ী নিজের জীবন গঠন করিতে পারি! সেই অবধি আর কাগজে না লিখিয়া হৃদয়পটে সকল উপদেশ লিখিতে আরম্ভ করিলাম যাহাতে তাঁহার উপদেশ চিরস্মরণীয়ভাবে অঙ্কিত থাকে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে সকল ঘটনা শ্রীম-লিখিত "কথামৃত"-গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু আমি অল্পবয়স্ক ছিলাম বলিয়া বোধহয় কথামৃতের সকল জায়গায় আমার নাম উল্লেখ করা হয় নাই, ফলে আমি 'ইত্যাদি'-র মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি। এই কথা অবশ্য আমি 'শ্রীম'-র জীবদ্দশায় তাঁহাকে বহুবারই বলিয়াছি, কিন্তু কিজন্য জানিনা মাষ্টার-মহাশয় 'ইত্যাদি'-র গণ্ডীতেই আমাকে ফেলিয়া রাখিয়াছেন।

মধ্যে মধ্যে কেশববাবুর ব্রাহ্মসমাজের চিরঞ্জীব শর্মা (ত্রৈলোক্য-নাথ সান্ন্যাল) দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া সুমধুর কণ্ঠে একতারা বাজাইয়া পরমহংসদেবকে তাঁহার রচিত নূতন নূতন গান শুনাইতেন। একদিন তিনি গাহিলেন,

মন, চল নিজ নিকেতনে।
সংসারে-বিদেশে বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে॥
বিষয়পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেহ নয় আপন
পরপ্রেমে কেন হয়ে অচেতন, ভুলিছ আপনজনে॥

—প্রভৃতি।[১]

সৌভাগ্যক্রমে আমি সেদিন উপস্থিত ছিলাম। পরমহংসদেব ঐ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৎপরে ত্রৈলোক্যবাবু যখন তাঁহার রচিত 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি' ইত্যাদি (বাগেশ্রী রাগে) গাহিতে লাগিলেন তখনও আবার পরমহংসদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া বাহ্যজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। শ্রোতৃবর্গের

১ গানটি অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর রচিত।

সহিত আমিও তন্ময় হইয়া যেন জগন্মাতার আবির্ভাব অনুভব করিতে লাগিলাম। ত্রৈলোক্যবাবুর কণ্ঠ সাধনার জন্য সতেজ ও সুমিষ্ট ছিল। কিছুক্ষণ পরে ত্রৈলোক্যবাবু সঙ্গীতের শেষপদ গাহিলেন,

অভয় চরণতলে, প্রেমের বিজলী খেলে,
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি।

তিনি সঙ্গীত শেষ করিলেন। তখন পরমহংসদেব ভাবাবেশে হাসিতে হাসিতে বলিলেনঃ 'আচ্ছা, তোমরা সবাই দেবদেবীর মূর্তি মান না, কিন্তু নিরাকার মায়ের সাকার অভয় চরণ ও মুখমণ্ডল কি প্রকারে ভাবনা কর তা বুঝা যায় না।' এই কথা শুনিয়া ত্রৈলোক্যবাবু তাহার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, তিনি নীরবে বসিযা রহিলেন।

একদিন কেশববাবু-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পরমহংসদেবের চরণ বন্দনা করিলেন। আমি সেই সময়ে উপস্থিত ছিলাম। প্রতাপ মজুমদারকে দেখিয়া পরমহংসদেব সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব-সম্বন্ধে নানান্ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। প্রতাপবাবু অবনতমস্তকে সেই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি 'থিইষ্টিক রিভিউ' (Theistic Review) নামক ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকায় ইংরাজীতে পরমহংসদেবের ঐ সকল উপদেশ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ও কলিকাতার টাউন হলে একটি বক্তৃতার সময়ে পরমহংসদেবের অপূর্ব আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে সর্বসাধারণের সমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কতকগুলি উপদেশ পুস্তিকাকারে ছাপাইয়া বিতরণ করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে কলিকাতা নগরীতে কেশববাবুর বক্তৃতা-মারফৎ পরমহংসদেবের বিষয় প্রথম প্রচার হইয়াছিল।

পূর্বেই বলিযাছি যে, সুযোগ পাইলেই আমি বাড়ীতে আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া দক্ষিণেশ্বরে পলাইয়া যাইতাম এবং রাত্রিতে তথায় থাকিয়া পরমহংসদেবের পদসেবাদি করিতে সুযোগ পাইতাম।

একদিন পরমহংসদেবের পায়ে আমি হাত বুলাইতেছি, এমন সময়ে অনুভব করিলাম পরমহংসদেব যেন শ্রীশ্রীজগন্মাতা-রূপে আমায় স্তন্য পান করাইতেছে। মনে আছে, আমি তখন জাগতিক সকল বিষয় ভুলিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়াছিলাম। সেই অপূর্ব অনুভূতির কথা আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না!

পূর্বেই বলিয়াছি, আমি নিজের বাড়ীতে প্রত্যহ ধ্যানের সময়ে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি দর্শন করিতাম। দেখিলাম, একদিন গভীর রাত্রে ধ্যানস্থ হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পডিলাম, আর আমার আত্মা যেন দেহরূপ পিঞ্জর হইতে বহির্গত হইয়া শূন্যে আকাশে মুক্ত বিহঙ্গমের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। ক্রমশঃ তাহা উর্ধ্বে উঠিয়া অনন্তের দিকে ধাবমান হইল। তখন আমি অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে এক সুন্দর সুশোভিত প্রাসাদোপম সুরম্য স্থানে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া স্তরে স্তরে নানান্ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভাবের মূর্তিসকল দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলাম। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, খ্রীষ্টান, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও প্রতীক দেখিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। ক্রমে কোন মহান্ অতিবাহিক আত্মার প্রেরণায় যেন প্রণোদিত হইয়া এক বিরাট হলের ন্যায় কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, সেই কক্ষের চতুষ্পার্শ্বে এক একটি বেদীতে সকল দেবদেবী, অবতারপুরুষ ও ধর্ম-প্রবর্তকগণের মূর্তি—যথা হিন্দুদিগের দশাবতার, শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখ্রীষ্ট, জারাথুষ্ট্র, মহম্মদ এবং অন্যান্য ধর্মপ্রবর্তকগণ উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, আর সেই হলের মধ্যস্থলে পরমহংসদেব দণ্ডায়মান ছিলেন। আমি সেই অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করিতেছি! এমন সময়ে পরমহংসদেবের মূর্তি জ্যোতির্ময় হইয়া বিরাট আকার ধারণ করিল এবং তাঁহার মধ্যে সকল দেবদেবী, অধিকারিক ও অবতারপুরুষ (মৎস্য, কূর্ম, শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধ প্রভৃতি দশাবতার), শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখ্রীষ্ট, জারাথুষ্ট্র, নানক, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি আপনাপন আসন (বেদী) হইতে উঠিয়া

পরমহংসদেবের বিরাট শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন সেই অপূর্ব দর্শনের যথার্থ কোন মর্ম বুঝিতে না পারিয়া আমি দ্রুতপদে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া পরমহংসদেবকে সেই সকল কথা বর্ণনা করিলাম। পরমহংসদেব শুনিয়া বলিলেন: 'তোর বৈকুণ্ঠদর্শন হয়েছে। এবার দেবদেবীদর্শনের চরমসীমায় পৌঁছেছিস। তোর আর কিছু দর্শন করার বাকি নেই। এখন থেকে তুই অরূপ ও নিরাকারের ঘরে উঠলি।' আশ্চর্যের বিষয় যে, উপরি-উক্ত দর্শন হইবার পর হইতে ধ্যানে বসিলে আর কোন দেবদেবীর রূপ আমি দর্শন করিতাম না এবং মন তখন শান্ত ও সমাধিস্থ হইয়া সর্বদা অবস্থান করিত। পরে সেই অপূর্ব বৈকুণ্ঠদর্শন হইতে যাহা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আমার রচিত সংস্কৃত শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারস্তোত্রে বর্ণনা করিয়াছি।

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ নামক একটি যুবক একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া পরমহংসদেবের হৃদয়ে গোপালভাব জাগ্রত হইয়াছিল। তিনি তাহাকে কিছু খাওয়াইলে মহানন্দ অনুভব করিতেন। পূর্ণ তখন ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে পাঠ করিত। ঐ সেমিনারী আমার বাটীর নিকট জানিতে পারিয়া পরমহংসদেব আমাকে বলিলেন: 'ছাখ্, পূর্ণ নামে একটি ছোকরা এখানে আসে। সে খুব ভাল ছেলে। তার প্রতি আমার গোপালভাব হয় এবং তাকে খাওয়াতে ইচ্ছা করে। তুই তার স্কুলের ছুটির পর তোদের বাড়ীতে তাকে ডেকে নিয়ে আসবি এবং যে যে সন্দেশ দিব, তুই আমার হয়ে তাকে খাওয়াতে পারবি?' আমি বলিলাম: 'আজ্ঞে, হ্যাঁ পারব।' তখন পরমহংসদেব অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সহাস্যবদনে বলিলেন: 'তুই যেন আমার হয়ে বৃন্দে দূতি সাজ্‌বি।' তাহার পরে আমার হস্তে একটি ফজলী আম ও কিছু সন্দেশ দিলেন। আমি পরমহংসদেবের আদেশ শিরোধার্য করিয়া ঐ আম ও সন্দেশ লইয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। স্কুলের ছুটির পর পূর্ণচন্দ্রের

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে আমাদের নিমু গোস্বামী লেনস্থ নিজ বাড়ীতে ডাকিয়া আনিলাম এবং আমার নিজের ঘরে বসাইয় নিজহস্তে তাহাকে পরমহংসদেব-প্রদত্ত আম ও সন্দেশ খাওয়াইলাম পূর্ণ আনন্দের সহিত ভোজন করিয়া বলিল: 'আহা, পরমহংসদেবের কি দয়া ও স্নেহ। তাঁর স্নেহ ও ভালবাসা পিতামাতা অপেক্ষা অনেক বেশী। তোমাকে এত কষ্ট দিয়েছেন আমাকে খাওয়াবার জন্য!' পূর্ণ ছলছলনেত্রে সেই কথাগুলি বলিল! সেই অবধি পূর্ণের সহিত আমার হৃদ্যতা জমিয়া গেল। পরদিন আমি দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পরমহংসদেবকে পূর্ণের কথা সমস্ত নিবেদন করিলাম। তিনি আনন্দিত হইয়া আমাকে আদর করিয়া বলিলেন: 'পূর্ণ আসতে আমার ভক্তের সংখ্যা পূর্ণ হয়ে গেল। যারা আমার অন্তরঙ্গ তারা প্রায় সকলেই এসেছে। তোদের জন্য আমি কত কেঁদেছি। এখন মা তোদের সকলকেই এনে দিয়েছে।' কথাগুলি তিনি এমনিভাবে বলিলেন যেন তাঁহার কথাগুলির মধ্যে অপূর্ব ভাবের সহিত অপার্থিব প্রেম মিশানো ছিল!

দশম পরিচ্ছেদ

॥ শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে দক্ষিণেশ্বরে ॥

একদিন আমি দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছি। বেলা তখন প্রায় দুইটা। এমন সময় একখানি ভাড়াটিয়া ছ্যাক্‌রা গাড়ীতে চড়িয়া গিরিশচন্দ্র ঘোষ মাতালের মতো হইয়া পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আসিলেন। আমি ও উপস্থিত সকলে গিরিশচন্দ্রকে উন্মত্ত অবস্থায় দেখিয়া ভীত হইলাম। কিন্তু পরমহংসদেব গিরিশবাবুকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, বরং গিরিশবাবুকে ভৈরবের অংশ ও বীর সাধকরূপে সম্বোধন করিয়া রামপ্রসাদের রচিত একটি গান গাহিতে লাগিলেন—

সুরাপান করি না আমি সুধা খাই জয় কালী বলে।

আমার, মন-মাতালে মাতাল করে, সব মদ-মাতালে মাতাল বলে॥

প্রভৃতি। গিরিশবাবু তখন পরমহংসদেবের পদদ্বয় মস্তকে রাখিয়া কাতরভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন: 'আমায় কৃপা করে উদ্ধার করুন।' পরমহংসদেব ক্রমে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং ঐ অবস্থায় বলিতে লাগিলেন: 'বীরভক্ত গিরিশ ওসব করতে পারবে না মা।' পরমহংসদেবের ক্রমে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তিনি গিরিশবাবুর দিকে চাহিয়া তাঁহাকে "বকল্‌মা" দিতে আদেশ করিলেন। পরমহংসদেবের কথায় গিরিশবাবু তাঁহাকে বকল্‌মা দিলেন। ক্রমে গিরিশবাবুর মত্ততা কাটিয়া গেল এবং সহজভাবে সমবেত ভক্তগণের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্বে ষ্টার থিয়েটারে যখন পরমহংসদেব অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন তখন তিনি মাতাল হইয়া তাঁহাকে অশ্লীল ভাষায় অনেক গালাগালি (জগাই-মাধাইয়ের ন্যায়) করিয়াছিলেন। কিন্তু পরমহংসদেব তাহাতে কিছু মনে না করিয়া বরং গিরিশবাবুকে অধিক পরিমাণেই কৃপা করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব

গিরিশবাবুর আন্তরিক ভক্তি ও বিশ্বাস বুঝিয়া ভক্তগণের নিকট বলিতেন : 'গিরিশের পাঁচসিকা পাঁচআনা বিশ্বাস।' সত্যই পরমহংস-দেবের প্রতি গিরিশবাবুর অগাধ ভক্তিনিষ্ঠা ছিল।

একদিন পরমহংসদেব সিমলার মধু রায়ের লেনে রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে আগমন করিবেন এই সংবাদ পাইয়া কলিকাতার ভক্তগণ সেইখানে সমবেত হইয়াছেন। আমিও দক্ষিণেশ্বর হইতে পরমহংসদেবের সঙ্গে সেইখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম একঘর লোক, সকলেই পরমহংসদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। রামবাবু পরমহংসদেবকে অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানায় সমবেত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে আসন পাতিয়া দিয়া বসাইলেন। পরমহংসদেব চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন : 'কই, নরেনকে তো দেখছি না। নরেন কোথায়?' রামবাবু বলিলেন : 'নরেনের মাথার অসুখ হয়েছে, সেজন্য সে আসতে পারেনি। সে বাড়ীতে অন্ধকার ঘরে মাথায় ভিজা গামছা দিয়ে শুয়ে থাকে। আলোর দিকেও চোখ খুলে চাইতে পারে না। বেশ যন্ত্রণা ভোগ করছে।' এই কথা শুনিয়া পরমহংসদেব কাতর হইয়া নরেন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ও বলিলেন : 'তাকে এখানে ডেকে নিয়ে এস।' সুতরাং নিরঞ্জন, আমি এবং আরও চারপাঁচজন নরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম নরেন্দ্রনাথ মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছে এবং নীচের ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ও মাথায় ভিজা গামছা দিয়া একটি তক্তাপোষের উপর শয়ন করিয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। নিরঞ্জন, আমি নরেন্দ্রনাথকে বলিলাম : 'পরম-হংসদেব রামবাবুর বাড়ীতে এসেছেন। তিনি তোমাকে সেখানে দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল হয়েছেন। তাই তোমায় সেখানে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের পাঠিয়েছেন। তোমাকে এখুনি যেতে হবে।' এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ বলিল : 'আমি মাথায় অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করছি। আমি চোখ খুলতেই পারছি না। তারপর আলোতে তো

মাথার যন্ত্রণা আরও বাড়ে, সুতরাং আমি ক্যামন করে যাব? পরমহংসদেবকে আমার নমস্কার দিয়ে বলবে যে, আমার যাবার ক্ষমতা নেই।' কিন্তু আমরা ছাড়িবার পাত্র নই, নরেন্দ্রনাথকে জিদ করিয়া বলিলাম: 'পরমহংসদেব যখন তোমাকে দেখার জন্য আকুল হয়েছেন, তখন তোমাকে যেতেই হবে। আমরা তোমায় ধরে ধরে নিয়ে যাব।' নরেন্দ্রনাথ বলিল: 'আমি চোখ খুলতেই পারছি না, সুতরাং ক্যামন ক'রে যাই বলো।' আমারা বলিলাম: 'তুমি চোখ বুজে আমাদের সঙ্গে এস, আমরা তোমায় হাত ধরে নিয়ে যাব।' অগত্যা নরেন্দ্রনাথ সম্মত হইল এবং একটি ভিজা গামছা মাথায় দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। আমরা হাত ধরিয়া গলির মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে রামবাবুর বাড়ীতে লইয়া আসিলাম।

পরমহংসদেব তখন বৈঠকখানায় ভক্তগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া সহাস্যে সকলের সহিত আলাপ করিতেছেন। ঘরটি লোকে পরিপূর্ণ। বাহিরের হলেও বেশ ভীড় জমিয়াছে। সেই ভীড়ের মধ্য দিয়া আমরা নরেন্দ্রনাথকে লইয়া পরমহংসদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। নরেন্দ্রনাথ পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে বসিল। তখন নরেন্দ্রনাথকে সম্মুখে দেখিয়া পরমহংসদেবের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি সস্নেহে নরেন্দ্রনাথের মস্তকে হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: 'কিরে, তোর মাথায় কি হয়েছে?' আশ্চর্যের বিষয়, যেই মুহূর্তে পরমহংসদেবের পদ্মহস্ত নরেন্দ্রনাথের মস্তকে পড়িল তাহার সমস্ত যন্ত্রণা কোথায় দূর হইয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ সুস্থ হইয়া বলিল: 'মহাশয়, আপনি কি করলেন যে, আমার সমস্ত যন্ত্রণা দূর হয়ে গেল?' পরমহংসদেব শুনিয়া হাসিলেন। তখন নরেন্দ্রনাথ চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিল—একঘর লোকের মধ্যে সে বসিয়া আছে। পরমহংসদেব সস্নেহে নরেন্দ্রনাথকে একটি গান গাহিতে বলিলেন। নরেন্দ্রনাথ আনন্দে বিহ্বল হইয়া সম্মুখে একটি তানপুরা পূর্ব হইতেই ছিল, তাহা লইয়া সুমিষ্ট কণ্ঠে গান আরম্ভ করিল।

সমবেত ভক্তমণ্ডলী নরেন্দ্রনাথের গুরুগম্ভীর কণ্ঠের সুমিষ্ট গানে মুগ্ধ হইয়া রহিল। পরমহংসদেব ভাবাবেশে ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বসিয়া রহিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, সেই মজলিসে নরেন্দ্রনাথ তিনঘণ্টা ধরিয়া গান করিয়াও কোন ক্লান্তি অনুভব করিল না। আমরা সকলে সেইদিন পরমহংসদেবের অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম।

সভা ভঙ্গ হইবার পর নরেন্দ্রনাথ আমাদিগকে বলিল: 'আমার মাথায় কী ভীষণ যে যন্ত্রণা হচ্ছিল তা মুখে বলার নয়। যেন কেউ একটা শাবল দিয়ে মাথার নীচে চাড়া দিচ্ছিল। কিন্তু সে ভীষণ যন্ত্রণা পরমহংসদেবের করস্পর্শে মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। কি আশ্চর্য শক্তি।' "Thus I have witnessed the most wonderful power, which our great Master Sri Ramkrishna possessed. But he seldom used the power;" অর্থাৎ 'আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণ যে অদ্ভুত শক্তির অধিকারী ছিলেন তা আমি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তবে সে শক্তি তিনি কদাচিৎ ব্যবহার করিতেন।'

এইরূপে সমস্ত বিকালবেলা মহানন্দে কোথা দিয়া কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় সঙ্কীর্তন আরম্ভ হইল। মূলগায়ক মহাশয় বৃন্দাবনলীলা 'মাথুর'-পদাবলী গাহিতে লাগিলেন—

যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল।
তবে এ' হেন জীবন পরশরতন কাচের সমান ভেল॥
আমি যোগিনী হব।
প্রাণবঁধু লাগি আমি যোগিনী হব॥
আমি গেরুয়াবসন অঙ্গেতে পরিব, শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
আমি যাব সেই দেশে যোগিনীর বেশে যথায় নিঠুর হরি॥
আমি মথুরানগরে প্রতি ঘরে ঘরে খুঁজিব যোগিনী হয়ে।
যদি কোন ঠাঁই মিলে প্রাণবঁধু, বাঁধিব আঁচর দিয়ে।
তারে ছাড়িব না হে!

আপন বঁধু বলে তারে ছাড়িব না হে !
পুনঃ ভাবি মনে বাঁধিব কেমনে নবীন নাগর হাতে।
আমি চরণে ধরিয়ে মিনতি করিয়ে রাখিব হামারি সাথে ॥

এই পদকীর্তন শুনিয়া পরমহংসদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। সমবেত ভক্তগণও ভাবে মুগ্ধ ও বিহ্বল হইয়া রহিলেন। পরমহংসদেবের মুখে অপূর্ব জ্যোতি ও প্রসন্নতা বিরাজ করিতে লাগিল। তাহার পর যখন আবার 'নদে টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে' বলিয়া কীর্তন আরম্ভ হইল তখন পরমহংসদেব দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং কোমরে কাপড় জড়াইয়া মত্ত সিংহের ন্যায় নাচিতে আরম্ভ করিলেন। উদ্দাম সেই নৃত্য অথচ মুখে প্রসন্ন হাসি ও ভাব! ইহা দেখিয়া মনে পড়ে শ্রীচৈতন্যদেবের নৃত্য দেখিয়া তাঁহার ভক্তগণের কথা! তাঁহারা বলিয়াছিলেন : 'গোরা আমার মাতাহাতী।' সেইদিন আমরা সেই মত্তহস্তীর ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দাম নৃত্য দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছিলাম।

আর একদিনের কথা। সুরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় পরমহংসদেবের দাঁড়ানো ফটো তোলাইবার জন্য কলিকাতায় রাধাবাজারে বেঙ্গল ফটোগ্রাফ কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া একদিন তাঁহাকে তথায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। পরমহংসদেব সুরেশবাবুর অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। যেইদিন পরমহংসদেব ঐ ফটোগ্রাফ-ষ্টুডিওতে গাড়ী করিয়া গিয়াছিলেন সেইদিন আমি ও লাটু সেই গাড়ীতে পরমহংসদেবের সঙ্গে রাধাবাজারে গিয়াছিলাম এবং ঐ দাঁড়ানো ফটো লইবার সময় উপস্থিত ছিলাম (কথামৃত অনুসারে ৩০শে জুন, ১৮৮৪)। শশধর তর্কচূড়ামণি দক্ষিণেশ্বরে যেইদিন পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন সেইদিনও আমি দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত ছিলাম। আজও সেই সকল স্মৃতি আমার হৃদয়ে জাগরূক আছে !

আমার ধ্যানে বৈকুণ্ঠদর্শন হইবার পর হইতে পরমহংসদেব আমাকে তাঁহার নিজ মূর্তির ধ্যান করিতে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন : 'আমার

স্বামী অভেদানন্দের গর্ভধারিণী জননী

স্বামী অভেদানন্দের পূর্বাশ্রমের বাটী

(২২নং নিমু গোস্বামি লেন, আহিরীটোলা)

১নং বাড়ীর প্রবেশ-পথ, ২নং যে ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার জানালা।
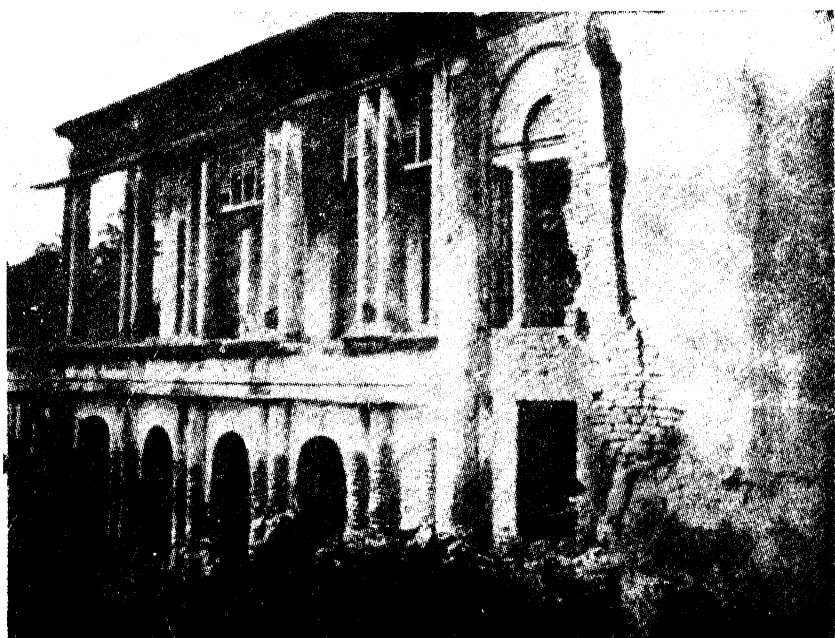
বরাহনগর মঠ
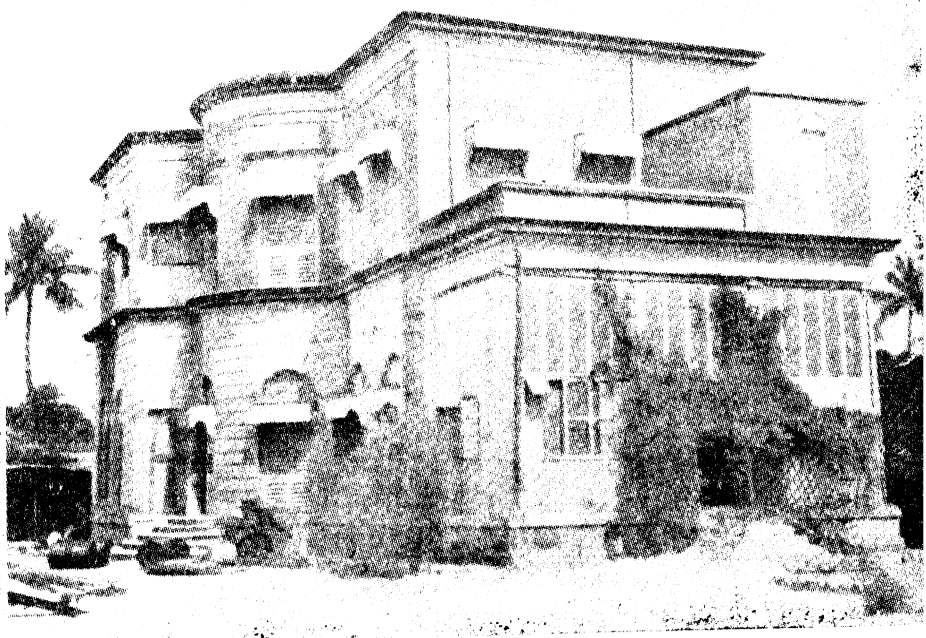
কাশীপুর-উদ্যানবাটী

এইখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধি হয়।

শ্রীশ্রীভবতারিণী

(দক্ষিণেশ্বর)

ঠাকুরের বাটী

দক্ষিণেশ্বর

দক্ষিণেশ্বর-পঞ্চবটী
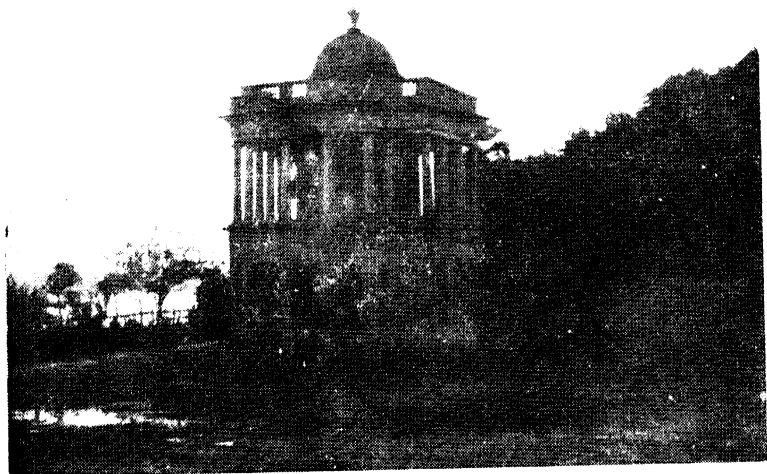
নহবৎখানা
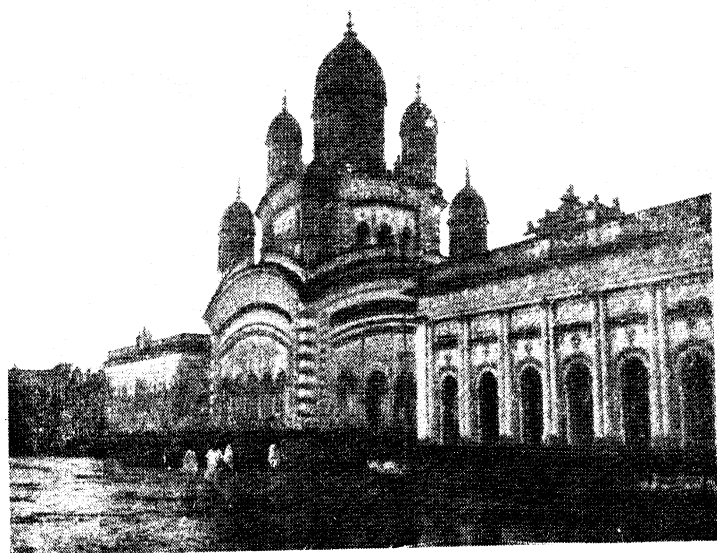
ভবতারিণীর মন্দির
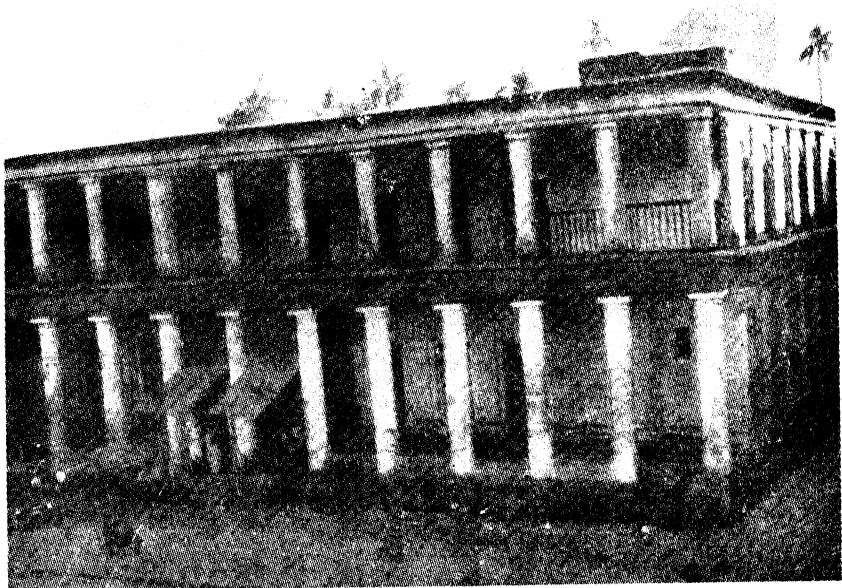
(১) আলমবাজার-মঠ (২) বরাহনগরে গৃহীত আলোকচিত্র।

সর্বদক্ষিণে কালীপ্রসাদ উপবিষ্ট।
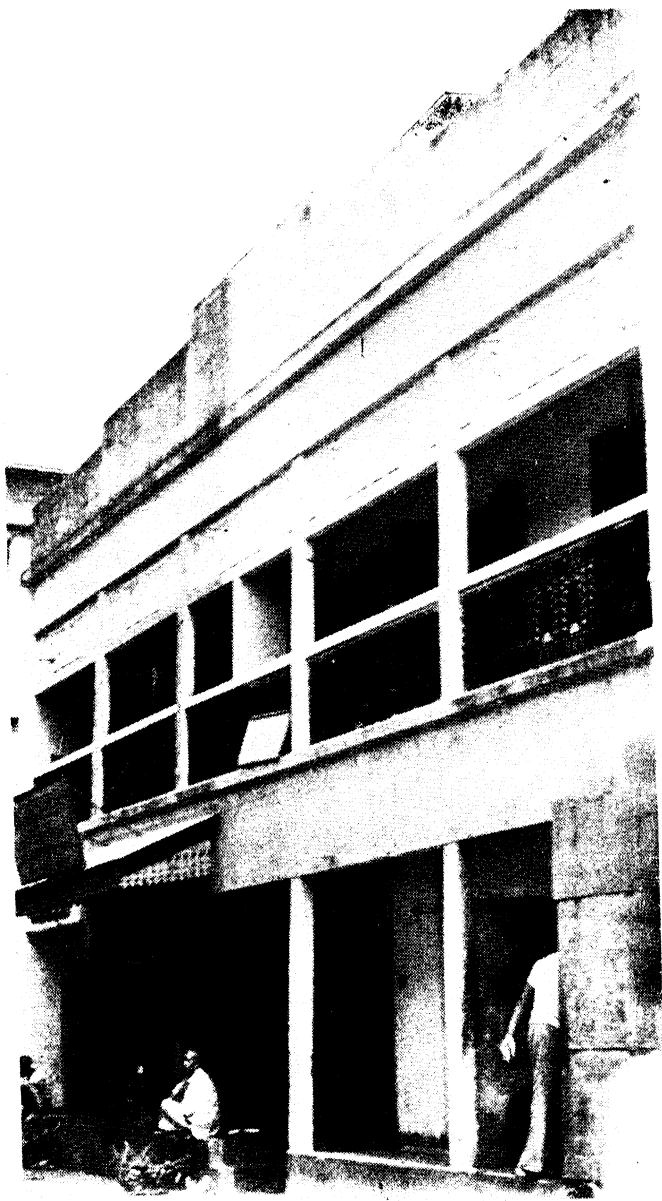
শ্যামপুকুরের বাটী

দেহের মধ্যে মা কালী ও সমস্ত দেবদেবী আছেন। তাই আমার মূর্তি ধ্যান করলেই সকল দেবদেবীর ধ্যান করা হবে।' পরমহংসদেবের এই কথা অর্জুনের "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" বা "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্" প্রভৃতি অভয়বাণীর কথা মনে পড়ে।

যোগীরা দীপশিখার ধ্যান করেন। উহার বহির্ভাগ স্থূল, কিন্তু স্থূলের পর সূক্ষ্ম এবং তাহার পর কারণ। প্রথম স্থূলের ধ্যান করিতে হয়; পরে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে কারণের ধ্যান করিতে হয়। আমি একদিন ঐরূপে দীপশিখার ধ্যান করিতে করিতে জগতের আদিকারণ যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম।

স্মরণীয় একদিনের কথা! দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেব তাঁহার ছোট ঘরটিতে বসিয়া আছেন এবং আমি পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছি। তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন: 'ব্রহ্মজ্ঞান কি সহজে লাভ করা যায়?' আমি বলিলাম: 'পাতঞ্জলদর্শনে একটি সূত্র আছে: 'তীব্র সম্বেগনামাসন্নঃ' (১।২১); অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে তীব্র সংবেগ (শ্রদ্ধা, বীর্যাদি) থাকে তাহাদের শীঘ্র সমাধি হয়।' তিনি আমাকে সহাস্যে আশ্বাস দিয়া বলিলেন: 'তোর ব্রহ্মজ্ঞান হবে।' তাহার পর তিনি আমার কপালে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে আজ্ঞাচক্রে নিজ অঙ্গুলির নখদ্বারা জোরে চিমৃটি কাটিয়া বলিলেন: 'এ-স্থানে মন স্থির করবি। ন্যাংটা (তোতাপুরী) আমার কপালে একটা কাচখণ্ড দিয়ে বিদ্ধ করে সেই বিন্দুতে মন স্থির করতে বলেছিল। আমি সে রকম করলে আমার নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল। সে অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান থাকে না। আমিও তিনদিন তিনরাত্রি সমাধিস্থ হয়ে ছিলাম। আমার অবস্থা দেখে ন্যাংটা বলেছিল—'ক্যা দৈবী মায়া হ্যায়! চাল্লিশ বরষ সাধন করকে হামকো যো ন নির্বিকল্প সমাধি মিলা রই হ্যায়, তিন রোজমে সিদ্ধ কর্ লিয়া'—অর্থাৎ, কি

দৈবী মায়া ! আমি চল্লিশ বছর কঠোর সাধন করেও যে সমাধি লাভ করতে পারি নি, আর রামকৃষ্ণ তা তিনদিনে লাভ করলো। তাহার পর পরমহংসদেব আমাকে পঞ্চবটীর নীচে বসিয়া ধ্যান করিতে আদেশ দিলেন। তখন হরিশ নামক একজন সেবক আসিল। আমি পরমহংসদেবের সেবার ভার তাহাকে দিলাম এবং পরমহংস-দেবকে প্রণাম করিয়া পঞ্চবটীর তলায় ধ্যান করিতে অগ্রসর হইলাম। সেইখানে আমি ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে মন স্থির করিয়া ধ্যান করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কতক্ষণ সমাধিস্থ ছিলাম জানি না, তবে ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে আমি উঠিয়া আসিয়া পরমহংসদেবের চরণে প্রণাম করিলাম। তিনি সস্নেহে আমার মাথায় হস্ত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন। আমি এইরূপে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশানুযায়ী নিজ আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করিতে যত্নবান হইয়াছিলাম এবং সেই সঙ্গে আমার উপর পরমহংসদেবের অপার কৃপার কথা ভাবিয়া আজিও আনন্দে অধীর হইয়া উঠি।

॥ নীলকণ্ঠের যাত্রায় গমন ॥

একদিন পরমহংসদেব কোন ভক্তমুখে শুনিলেন নীলকণ্ঠ একজন প্রেমিক সাধক ও পরমভক্ত। কলিকাতার হাটখোলায় বারোয়ারী-তলায় তাহার শ্রীকৃষ্ণযাত্রা হইবে। নীলকণ্ঠ যখন বৃন্দেদূতি সাজিয়া গান করে তখন শ্রোতৃবর্গ কাঁদিয়া আকুল হয়। এই সংবাদ পাইয়া পরমহংসদেব নীলকণ্ঠের যাত্রা শুনিবার জন্য বালকের ন্যায় অধীর হইয়া উঠিলেন। সুতরাং যাত্রা শোনার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা হইল। প্রাতে দক্ষিণেশ্বর হইতে একখানি গাড়ী ভাড়া করা হইল। পরমহংসদেব সেবক লাটু ও আমাকে সঙ্গে লইয়া গাড়ী করিয়া হাটখোলার বারোয়ারী ঘাটে উপস্থিত হইলেন। তখন যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে এবং বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। যাত্রা শুনিবার জন্য লোকের ভীড় এত অধিক হইয়াছে যে, তাহার মধ্য দিয়া আসরে

প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব হইয়াছিল। কোন প্রকারে আমি ও লাটু আসরের মধ্য দিয়া গিয়া নীলকণ্ঠকে সংবাদ দিলাম যে, দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাহারযাত্রা শুনিতে উপস্থিত হইয়াছেন। গায়ক নীলকণ্ঠ পরমহংসদেবের কথা শুনিয়া শশব্যস্তে ভীড়ের মধ্যে পথ করিয়া পরমহংসদেবের হাত ধরিয়া আসরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পরমহংসদেবকে সম্মুখে বসাইয়া আবার গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি আনন্দে অধীর হইয়া গাহিতে লাগিলেন: 'পীরিতি, এ'তিন আখর কে সৃজিল রে'। শ্রীরাধার প্রেমে গদগদ হইয়া 'পীরিতি' শব্দটি তিনি বারবার উচ্চারণ করিবার সময় পরমহংসদেবের ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল। সুমিষ্ট কণ্ঠে ভাবের সহিত যখন নীলকণ্ঠ আবার গাহিতে লাগিলেন, তখন পরমহংসদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। অপূর্ব সেই মূর্তি। নীলকণ্ঠও ভাবে গদগদ হইয়া দুই হস্তে পরমহংসদেবের শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া বারবার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে পরমহংসদেব বসিয়া আবার গান শুনিতে লাগিলেন। তিনি তখন যেন আবার সাধারণ মানুষ। শ্রোতৃবর্গ অবাক হইয়া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল: 'ইনি কে? এই মহাপুরুষ কোথায় থাকেন? এ'রকম অপূর্ব রূপ তো কখনও দেখি নাই।' নীলকণ্ঠের গানের সঙ্গে পরমহংসদেব মধ্যে মধ্যে আখর দিতে লাগিলেন। শ্রোতৃ-বর্গ তাহা শুনিয়া বিমুগ্ধ হইল। প্রায় বেলা দশটার সময় যাত্রা ভঙ্গ হইল। তখন গাড়ী ভাড়া করিয়া পরমহংসদেবকে লইয়া আমরা বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলাম। ক্রমে বিডন স্কোয়ারে উপস্থিত হইলাম। সেই সময়ে ঐ স্কোয়ারের চতুর্দিকে ফুলের কেয়ারীর মধ্যে ফ্রিম্যাসনদের 'মিষ্টিক সিম্বলস্' বা প্রতীকসকল সুন্দর-রূপে নানাবর্ণের সিমেণ্ট দ্বারা অঙ্কিত ছিল। সেই প্রতীকগুলি দেখিবার জন্য পরমহংসদেব তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আমার ও লাটুর স্কন্ধে হাত দিয়া স্কোয়ারের চতুর্দিক পদচারণ করিয়া প্রতীকগুলি

দেখিতে লাগিলেন। আমি যতদূর সম্ভব তাঁহাকে প্রতীকগুলির অর্থ বুঝাইয়া দিতে লাগিলাম। অবশেষে সেই গাড়ী করিয়া বলরাম-ভবনে আসিয়া তিনজনে বিশ্রাম ও মধ্যাহ্নভোজন করিলাম। অপরাহ্নে নানাস্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া সমবেত হইলেন এবং ভগবৎ-প্রসঙ্গে দিন অতিবাহিত হইল। অবশেষে সন্ধ্যার পর কিছু জলযোগ করিয়া একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া লাটু ও আমি পরমহংসদেবকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিলাম। আমি ঐদিন আর কলিকাতায় ফিরিতে পারিলাম না, দক্ষিণেশ্বরেই রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন প্রাতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ

॥ পরমহংসদেবের ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান ॥

পরমহংসদেব প্রায়ই আমাদিগকে করতালি দিয়া 'হরিবোল হরিবোল' উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দিতেন। কোন জিজ্ঞাসু করতালি দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, গাছের ডালে অনেক পাখি বসিয়া থাকে, কিন্তু হাতের তালি দিলে যেমন পাখিরা পলাইয়া যায় তেমনি করতালি দিয়া হরিনাম করিলে দেহরূপ বৃক্ষ হইতে পাপরূপ পাখিসকল পলাইয়া যায়। দক্ষিণেশ্বরে আমরা দেখিয়াছি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় পরমহংসদেব আপন বিছানার উপর উত্তরমুখী হইয়া বসিয়া করতালি দিয়া উচ্চৈস্বরে বারম্বার 'হরিবোল হরিবোল' বলিতেন এবং 'হরিগুরু, গুরুহরি', 'হা কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ', 'প্রাণ হে, গোবিন্দ মম জীবনং', 'নাহং নাহং—তুঁহু তুঁহু', অর্থাৎ 'আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী' ইত্যাদি শব্দগুলি কিছুক্ষণ আবৃত্তি করিয়া ভাবাবেশে আবিষ্ট হইতেন। সেই অবস্থায় বালকের ন্যায় মা কালীর নিকট তিনি আব্দার করিতেন, কিন্তু তাহা আমাদের কর্ণগোচর হইত না। আমরা অবাক্ হইয়া তাঁহার এই অপূর্ব অবস্থা কেবল লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতাম এবং ভাবিতাম পরমহংসদেব নিশ্চয়ই মা কালীকে দর্শন করেন এবং তাঁহার সহিত কথাবার্তা কহেন। প্রশ্ন করিলে তিনি তাহার উত্তরও পাইয়া থাকেন। পরমহংসদেব নিশ্চয়ই মানুষ নন,—ইনি দেবতা—এই সব কথাই তখন বারবার আমাদের মনে উদিত হইত।

॥ জপ-ধ্যানের কথা ॥

পরমহংসদেব আমাদিগকে নিত্য নিয়মমত প্রাতে, ব্রাহ্মমুহূর্তে ও সন্ধ্যায় জপ-ধ্যান করিতে শিক্ষা দিতেন। তিনি ন্যাংটা তোতাপুরীর ধ্যানের কথা বলিতেন। ন্যাংটা বলিত যেমন রোজ লোটা না মাজিলে

তাহাতে ময়লা ধরে সেইরূপ ধ্যানদ্বারা মনকে প্রতিদিন পরিষ্কার না করিলে মনে মলিনতা জমিয়া থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য পরমহংসদেব প্রায়ই আপন সাধনার কথাও বলিতেন। তিনি বলিতেন: 'আমি যখন ধ্যান করতাম তখন পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে যেতাম। মাথায় পাখি এসে বসত, টেরও পেতাম না।' সত্যই যখন গভীর ধ্যানে মন স্পন্দহীন ও স্থির হয় তখন গায়ে মশা মাছি বসলেও টের পাওয়া যায় না। তিনি বলতেন এইগুলি চিত্ত স্থির হওয়ার লক্ষণ।

॥ তোতাপুরীর বেদান্তমত ॥

পরমহংসদেব বলিতেন: 'ন্যাংটা বেদান্তমতে নেতি নেতি বিচার ক'রে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিল। কিন্তু ন্যাংটা ব্রহ্মের শক্তি মানত না। ব্রহ্মের শক্তিকে বলত মায়া ও মিথ্যা এবং এই বলে সে শক্তিকে উপেক্ষা করত। কিন্তু এখানে এগার মাস থেকে ব্রহ্ম ও মায়াশক্তি অভিন্ন এই অদ্বৈতজ্ঞান মা কালী তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ন্যাংটা বুঝেছিল যে, অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি অভিন্ন। তেমনি ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন।'

॥ মায়া ব্রহ্মের শক্তি ॥

আচার্য শঙ্কর মায়ার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তি-
রণাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা।
কার্যানুমেয়া সুধিয়ৈব মায়া,
যয়া জগৎ সর্বমিদং প্রসূয়তে ॥
সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো,
ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো।

সাঙ্গাপনঙ্গা হ্যভয়াত্মিকা নো,
মহাদ্ভুতাঽনির্বচনীয়রূপা ॥
—বিবেকচূড়ামণি। ১০৭-১০০

মায়া কি ? অব্যক্ত নামধেয় পরমেশ্বরের শক্তি। অনাদি অবিদ্যা-রূপিণী সত্ত্বরজস্তমো গুণময়ী মায়া সমগ্র বিশ্ব প্রসব করে। জ্ঞানীরা কার্য দেখিয়া কারণরূপ এই মায়াশক্তির অনুমান করেন। মায়া সৎ নহে বা শশশৃঙ্গের মতো অসৎ বা অলীকও নহে, আবার সদসৎও নহে। মায়া ভিন্ন নহে, অভিন্ন নহে, ভিন্নাভিন্ন নহে। সঙ্গ নহে, অসঙ্গ নহে এবং সঙ্গাসঙ্গও নহে। ইনি অতিশয় অদ্ভুত এবং অনির্বচনীয়রূপা। শঙ্করের এই তত্ত্ব পরমহংসদেবও বিশ্বাস করিতেন।

॥ ব্রহ্ম ও মায়া ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সরল ভাষায় উদাহরণ দ্বারা ব্রহ্ম এবং মায়ার গভীর তত্ত্বসকল আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। তিনি বলিতেন: 'ব্রহ্ম নির্গুণ এবং সগুণ। নির্গুণব্রহ্ম কেমন জানিস্? যেমন সাপ স্থির হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, আবার সেই সাপ যখন এঁকে বেঁকে চলছে তখন সগুণব্রহ্ম। নির্গুণব্রহ্ম অখণ্ড স্থির সমুদ্র। তাঁতে তরঙ্গ অথবা কোন ক্রিয়া নেই, অচল অটল ও সুমেরুবৎ। মায়াশক্তি ব্রহ্মে যেন সুপ্তাবস্থায় লীন হয়ে থাকে। সেই অবস্থায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জীবগৎও মহাপ্রলয়ে লীন হয়ে থাকে। মায়াশক্তি জাগ্রত হয়ে সেই সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রে তরঙ্গ হতে থাকে। সেই অবস্থাকে বেদান্তশাস্ত্রে সগুণব্রহ্ম বলা হয়েছে। তখন ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বা প্রকৃতিতে গুণক্ষোভ হয় এবং সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হয়। এই সগুণব্রহ্মই 'অর্ধনারীশ্বর' বা 'হরগৌরী' নামে শাস্ত্রে অভিহিত।' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই ধরনের বেদান্তজ্ঞান ও বেদান্তনিষ্ঠা ছিল অদ্ভুত।

॥

ব্রহ্ম নিজ মায়াশক্তির প্রভাবে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা সগুণ ঈশ্বররূপে প্রতীয়মান হন। সগুণব্রহ্মে "একোঽহং বহুস্যাম্"—'আমি এক বহু হইব' এই সঙ্কল্প হইবামাত্র শক্তির বিকাশ এবং স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। মায়াশক্তিসমন্বিত সগুণব্রহ্মই নিজ মায়া বা প্রকৃতি হইতে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করেন: "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"। পরিদৃশ্যমান জগৎ ত্রিগুণময়ী মায়ার বিকারমাত্র। প্রকৃতির পরিণাম হয়, কিন্তু ব্রহ্ম অপরিণামী।

॥ মায়ার দুই শক্তি ॥

মায়ার দুইটি শক্তি: একটি আবরণ ও অপরটি বিক্ষেপ। আবরণশক্তি অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ নির্গুণব্রহ্মকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে এবং বিক্ষেপশক্তিতে এক অদ্বিতীয় সত্তা বহুরূপে প্রতীয়মান হয়। সেই ভাব কোন এক সাধক তাঁহার গানে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,

ত্বমেকা প্রকৃতি ব্রহ্ম-আচ্ছাদিনী,
মহামায়ারূপে ত্রিজগতমনোমোহিনী,
সৃজন-পালন-নিধনকারিণী,—ইত্যাদি।

নির্গুণব্রহ্মে মায়ার তিনটি গুণ অব্যক্ত থাকিলেও এক অখণ্ড সত্তাই খণ্ডরূপে প্রতীত হয়। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'একজ্ঞানই সত্য, বহুজ্ঞান অজ্ঞান, সুতরাং কাল্পনিক বা মিথ্যা।' এই একত্বের জ্ঞানকে তিনি 'অদ্বৈতজ্ঞান' বলিতেন। আরও বলিতেন: 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।' অর্থাৎ অগ্রে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিয়া সংসারের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম করিলে ঐ জ্ঞান (যাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলে) দ্বারা অবিদ্যাপ্রসূত অজ্ঞান ও তাহার বন্ধন ছিন্ন হয় এবং মানুষ মুক্তি লাভ করে। আমি আমার জ্ঞান হল অজ্ঞান। বলিতেন: 'মুক্তি হবে কবে—আমি যাবে যবে।' 'আমি

মলে ফুরায় জঞ্জাল'। শাস্ত্রে আছে: "ভ্রান্তিবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ ভ্রান্তিমুক্তঃ সদাশিবঃ"। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে সংসার-ভ্রম হয়। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে অঘটনঘটনপটিয়সী মায়ার নাশ হয়। যেমন রজ্জুতে রজ্জুজ্ঞান হইলে সর্পভ্রম দূর হয়।

ব্রহ্ম নির্গুণ। তিনি দেশ, কাল, নিমিত্ত দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও মায়ার বশে পরিচ্ছিন্নের ন্যায় মায়াধীশ সগুণ ঈশ্বর এবং জীব ও জগৎরূপে বিবর্তিত হন। তিনিই আবার মায়াকে আপন বশে রাখিয়া ইন্দ্রজাল দেখান। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" (বৃহঃ উপঃ ২।৫।১৯), অর্থাৎ পরমেশ্বর মায়াশক্তির দ্বারা প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ হইয়াছিলেন। জগতে আপনার রূপ প্রকাশের জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি নাম-রূপজনিত মিথ্যা অভিমান দ্বারা বহু রূপে প্রতিভাত হন। তিনিই মায়াধীন হইয়া জীব এবং মায়াধীশ হইয়া ঈশ্বর হন। বদ্ধজীব আত্মস্বরূপকে জানিলে অজ্ঞানের কার্য দূর হয় ও আপনাকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জ্ঞানে কৃতকৃতার্থ হইয়া মোক্ষলাভ করে। "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি"—ব্রহ্মকে জানার নামই ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন: 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে'। ন্যাংটা তোতাপুরী ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ হইয়াও যখন রক্ত আমাশয়ে ভুগিতেছিলেন, তখন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিলেন। মায়ার কি অসীম শক্তি!

॥ জীব ও ব্রহ্ম ॥

প্রকৃতপক্ষে মানুষ বা জীব অখণ্ড ব্রহ্ম হইতে কখনও ভিন্ন নহে। কেবল অজ্ঞানের জন্য নিজেকে পাঞ্চভৌতিক দেহবিশিষ্ট মনে করিয়া স্বরূপ হইতে পৃথক ধারণা করে এবং জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক, ব্যাধি, দুঃখ, কষ্ট ভোগ করিয়া কষ্ট পায়। কিন্তু যখন সে বোঝে যে, শাশ্বত আত্মা অশোক, তখন সে আনন্দসত্তায় অধিষ্ঠিত হয়।

॥ মায়ার শক্তি ॥

পরমহংসদেব সুমিষ্ট কণ্ঠে প্রায়ই রামপ্রসাদের গান গাহিতেন। একদিন তিনি গাহিতেছেন—

এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক ক'রে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য, জীবে কি তা জানতে পারে ॥—ইত্যাদি।

অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবও মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন থাকেন, সুতরাং সাধারণ মানুষের কথা আর কি।

একদিন একজন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জিজ্ঞাসা করিল: 'মহাশয়, ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ?' উত্তরে পরমহংসদেব বলিলেন: 'ব্রহ্মজ্ঞান কি তা মুখে বলা যায় না। বোবার স্বপ্ন দেখার মতো। সকল শাস্ত্রজ্ঞান উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না।' আমিও তখন সেই স্থানে উপস্থিত ছিলাম। এই কথা শুনিয়া তখন আমার জ্ঞানসঙ্কলিনী-তন্ত্রের শ্লোকটি মনে পড়িল। শ্লোকটি হইল—

উচ্ছিষ্টং সর্বশাস্ত্রাণি সর্ববিদ্যা মুখে মুখে।

নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানং অব্যক্ত চেতনাময়ম্ ॥

ব্রহ্ম কি বস্তু তাহা কেহ কখনও মুখে বলিতে পারে না। সেইজন্য ব্রহ্ম কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না। যাহা উচ্চারণ করা যায় তাহাই উচ্ছিষ্ট হয়। উপনিষদে আছে: "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" অর্থাৎ বাক্য ও মন যেখানে না পৌঁছিতে পারিয়া ফিরিয়া আসে সেই আনন্দস্বরূপই (সচ্চিদানন্দ) ব্রহ্ম। তবে বেদ ও পুরাণে ব্রহ্মার সম্বন্ধে যতটুকু বলা সম্ভব ততটুকুই বলা হইয়াছে। সমাধিস্থ হইলে ব্রহ্মদর্শন অর্থাৎ বোধিতে বোধ (অনুভব) হয়। তখন বিচার থাকে না, বাক্য ও মন স্থির হইয়া যায়। যেমন নুনের পুতুল সমুদ্র মাপিতে গিয়া গলিয়া যায় সেইরূপ ব্রহ্মদর্শন হইলে মানুষ স্থির হইয়া যায়। তাঁহার স্বরূপ মন ও বাক্য দ্বারা নির্ণয় করিতে অক্ষম হয়। সমাধিস্থ পুরুষ নির্বিকল্প অবস্থায় আবার বেশীক্ষণ থাকিতে পারেন না। তিনি

লোকশিক্ষা দিবার জন্য নীচে (ঐন্দ্রিয়িক জগতে) নামিয়া আসেন। ইহাকেই বলে ব্রহ্মজ্ঞান। **পরমহংসদেব বলিয়াছেন, সেই উচ্চ অবস্থায় সাধক নাকি একুশদিন সমাধিস্থ হইয়া থাকিতে পারেন। তাহার পর তাঁহার শরীরপাত হয়।**

ন্যাংটা তোতাপুরী ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি করা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিল : মন বুদ্ধিতে লয় কর এবং বুদ্ধি আত্মাতে লয় কর, তবেই স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি হইবে। গীতা ও উপনিষদের উপদেশ যে, জ্ঞানীর উদ্দেশ্য স্বরূপসত্তা আত্মাকে জানা। প্রকৃতপক্ষে আমি (জীব) ও পরমব্রহ্ম এক, কেবল মায়ার জন্য স্বরূপকে জানা যায় না, মায়া সরিয়া গেলে ব্রহ্মসূর্য আপনা হইতে প্রকাশিত হন। অবিদ্যা মানুষকে সংসারে মুগ্ধ করে। অবিদ্যা হইতেই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি জন্মে এবং মানুষ সংসারে বদ্ধ হয়। বিদ্যাশক্তি হইতে বিবেক, বৈরাগ্য, কামিনী ও কাঞ্চন-ত্যাগ, বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান ও প্রেম সমস্তই হয়। ইহারাই ঈশ্বর ও মুক্তির দিকে লইয়া যায়। বিদ্যাশক্তির পূজা ও উপাসনা করিলে অবিদ্যা কাটিয়া যায়। সেইজন্য তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তিপূজার বিধি আছে। মহামায়াকে প্রসন্ন করিবার জন্য নানাভাবে শক্তিপূজার বিধি-ব্যবস্থা আছে। দাস্য, বীর, সন্তান প্রভৃতি ভাব আশ্রয় করিয়া সাধন করিলে ঈশ্বর লাভ হয়। পরমহংসদেব বলিতেন : 'আমি দাসীভাবে ও সখীভাবে দুই বৎসর সাধনা করে-ছিলাম। বীরভাবে আমি পূজা করি নাই, কেননা আমার সন্তানভাব, আমি রমণীর স্তনকে মাতৃস্তন মনে করি। শক্তিসাধনা অত্যন্ত উৎকট সাধনা, চালাকির জিনিষ নয়। শক্তিসাধনায় সংযম দরকার। শক্তি-সাধনায় শক্তি ও শিবকে লাভ করাই উদ্দেশ্য।'

'গৌরীপণ্ডিত বলেছিল, কালী ও গৌরাঙ্গ এক বোধ হলে তবে ঠিক জ্ঞান হয়। যিনি ব্রহ্ম, তিনি শক্তি (কালী), তিনিই নবরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন : 'আদ্যাশক্তির সহায়ে অবতার-লীলা। তাঁর

শক্তিতে অবতার। অবতার যে কাজ করেন সে সব মায়ের শক্তি। বাজীকর—ঈশ্বর ও বাজীকরের খেলা—জীবজগৎ। কিন্তু বাজীকরই সত্য, আর তাঁর খেলা সব স্বপ্নের মতো। সুতরাং খেলা সত্য ও নিত্য নয়। যার ঈশ্বর লাভ হয়েছে সে সবটাই দেখে যে, ঈশ্বর (বাজীকর), জীব, জগৎ, মায়া সবই। সবই তাঁর বাজীখেলা। এদের অস্তিত্ব আছে, আবার নাইও। যতক্ষণ 'আমি' আছে ততক্ষণ সবই আছে। জ্ঞান দ্বারা বিচার করলে দেখা যায় কিছুই থাকে না, থাকে একমাত্র ব্রহ্ম। তখন নিজের 'আমি' পর্যন্ত বাজীকরের বাজী হয়ে দাঁড়ায়। যতক্ষণ এতটুকুও 'আমি' থাকে ততক্ষণ আদ্যাশক্তির এলাকা, ততক্ষণ আদ্যাশক্তির খেলা খেলে। এই খেলার পরপারে ব্রহ্ম।'

কলির শেষে কল্কি অবতারের অভ্যুদয় হইবে। ব্রাহ্মণের ছেলে সে কিছুই জানে না—হঠাৎ ঘোড়া আর তরবারি লইয়া আবির্ভূত হইবে। পরমহংসদেব গাহিতেন—

গর্ভে ছিলাম যোগে ছিলাম ভূমে পড়ে খেলাম মাটি।
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ী কিসে কাটি॥

—ইত্যাদি।

॥ হঠযোগী ও রাজযোগী ॥

হঠযোগী দেহের কতগুলি কসরৎ করে মাত্র। তাহাদের উদ্দেশ্য কিছু সিদ্ধাই যেমন অষ্টসিদ্ধি, দীর্ঘায়ু ইত্যাদি লাভ। কিন্তু অনিমাদি সিদ্ধাই বা বিভূতির একটিও থাকিলে ঈশ্বরলাভ হয় না। সিদ্ধাই-লাভে শক্তির অধিকারী হওয়া যায়, কিন্তু শক্তিমানকে ধরাছোঁয়া যায় না। রাজযোগীর উদ্দেশ্য ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান, বৈরাগ্য লাভ করা। তাই হঠযোগ অপেক্ষা রাজযোগ ভাল। রাজযোগের ষট্‌চক্র বেদান্তের সপ্তভূমির সঙ্গে অনেকটা মিল খায়। প্রথম তিনটি চক্র হইল মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর; এই তিন চক্রে গুহ্য, লিঙ্গ ও নাভিতে মনের স্থিতি হয়। বেদান্তের ইহাই প্রথম তিন ভূমি। মন

চতুর্থ ভূমিতে অর্থাৎ অনাহতপদ্মে উঠিলে জ্যোতি দর্শন হয়। পঞ্চম ভূমি অর্থাৎ বিশুদ্ধচক্রে মন উঠিলে ঈশ্বরের কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। ষষ্ঠ ভূমি আজ্ঞাচক্র। আজ্ঞাচক্রে মন উঠিলে ঈশ্বরদর্শন হয়। কিন্তু সেখানে একটা ব্যবধান থাকে। যেমন লণ্ঠনের মধ্যে আলো আছে, কিন্তু কাচের ব্যবধান থাকাতে আলো স্পর্শ করা যায় না। ষট্‌চক্র-ভেদের পর সপ্তম ভূমি। সেখানে মনের লয় হয় এবং সমাধিতে জীবাত্মা পরমাত্মা এক হয়। তখন ভেদবুদ্ধি থাকে না, সুতরাং নানাজ্ঞান দূর হয়। নেতি নেতি বিচার করিলে শুদ্ধজ্ঞানরূপ তত্ত্ব নিশ্চয় হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই সকল বিষয় শিক্ষা দিতেন।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্তমত ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন: 'ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। শক্তি না থাকলে জগৎ মিথ্যা মনে হয়। তখন আমি, তুমি, ঘর, বাড়ী, পরিবার—এ সবই মিথ্যা বলে জ্ঞান হয়। তাই আদ্যাশক্তি আছেন বলে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে। তিনিই জীবজগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন, সুতরাং জীব ও জগৎকে বাদ দেবে ক্যামন ক'রে? তাহলে সে ওজনে কম পড়বে। বেলের বিচি, শাঁস ও খোলা বাদ দিলে সমস্ত বেলটার ওজন পাওয়া যায় না।'

'সত্য কথাই কলির তপস্যা। ভক্তি পাকলে ভাব হয়। তারপর মহাভাব। তারপর প্রেম, তারপর ঈশ্বরলাভ। শ্রীগৌরাঙ্গের এই মহাভাব ও প্রেম হয়েছিল। এই প্রেম হলে জগৎ ভুল হয় এবং এমনকি নিজের দেহ যে এত প্রিয় তাও ভুল হয়ে যায়। শ্রীগৌরাঙ্গের সেই প্রেম হয়েছিল। তাই সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।'

'জীবের মহাভাব হয় না। তাদের ভাব পর্যন্ত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশা হত। তিনি অন্তর্দশায় সমাধিস্থ থাকতেন, অর্ধবাহ্যদশায় নৃত্য করতেন এবং বাহ্যদশায় নামসংকীর্তন করতেন।'

॥ মায়া কি ॥

কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। যোগের অর্থ কি জান? পরমাত্মা যেন চুম্বকপাথর, আর জীবাত্মা একটি ছুঁচ। তিনি টানিয়া লইলেই যোগ। কিন্তু ছুঁচের গায়ে মাটি লাগিয়া থাকিলে চুম্বক টানে না, মাটি পরিষ্কার করিয়া দিলে তবে টানে। কামিনী-কাঞ্চন আসক্তিরূপ মাটি। এই মাটি পরিষ্কার করিয়া দিলে যোগ আপনি হইতেই হয়। ব্যাকুল হইয়া কাঁদিলে বৈরাগ্য-সলিল লাগিয়া সংসার-মৃত্তিকা ধৌত হইয়া যায়। ঈশ্বরের জন্য কাঁদিতে পারিলে তাঁহার দর্শন হয় এবং সমাধি হয়। ব্যাকুল হইয়া কাঁদিলে কুম্ভক আপনা হইতেই হয়। তাহার পর সমাধি। ধ্যান করাও কেমন জান? দেহ যেন পাত্র এবং মন ও বুদ্ধি জল। সেই জলে সচ্চিদানন্দরূপ সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। সেই প্রতিবিম্ব আসল সূর্যের। ধ্যান করিতে করিতে যথার্থ সূর্যের দর্শনলাভ হয়, তাঁহার কৃপায় হয়।

একদিন পরমহংসদেবকে একজন প্রশ্ন করিলেন: 'জগৎ কি মিথ্যা?' পরমহংসদেব বলিলেন: 'মিথ্যা কেন? ওসব বিচারের কথা। প্রথমে নেতি নেতি বিচার করার সময় তিনি জীব নন, জগৎ নন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নন—এই বিচার করতে হয় এবং তাহলেই এ'সব স্বপ্নবৎ হয়ে যায়। তারপর অনুলোম-বিলোম বিচার। তখন তিনিই জীব-জগৎ হয়েছেন বলে বোধ হয়। 'আমি'-জ্ঞান যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ জীব-জগৎ সবই থাকে। ঈশ্বরদর্শন বা ব্রহ্মজ্ঞান হলে তখন সব চিন্ময় বলে বোধ হয়। কালীঘরে গিয়ে দেখি—প্রতিমা চিন্ময়, দেবী, কোষাকুষি, চৌকাঠ, মার্বেল পাথর সমস্তই চিন্ময়। তখন বিড়াল পর্যন্ত চিন্ময়ী মা-ই সব হয়েছেন এ'জ্ঞান হয়।'

'বেদান্তমতে সমগ্র জগৎ মিথ্যা—স্বপ্নবৎ। কিন্তু পুরাণমতে বা ভক্তিশাস্ত্রমতে ঈশ্বরই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সব হয়েছেন। তাঁকে অন্তরে বাহিরে পূজা করতে হয়।'

সন্ধ্যার পর একদিন পরমহংসদেব মা'র সহিত কথা কহিতেছেন। তিনি মাকে বলিতেছেন: 'মা, আমি ব্রহ্মজ্ঞান চাইনে মা! ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁশ করে রাখিসনে আমায়, বেদান্ত জানিনে মা, জানতে চাইনে মা! তোকে পেলে বেদ-বেদান্ত কত নীচে পড়ে থাকে, ব্রহ্মজ্ঞানকে আমার কোটি নমস্কার। ও যাদের দিতে হয় তাদের দাও গে। আমি যে ছেলে তোমার, আমার মা চাই। মা আনন্দময়ী।'

'যারা নিত্যসিদ্ধ তারা সংসারে বদ্ধ হয় না। তাদের ভোগের বাসনা জন্ম থেকে মিটে গেছে। বেদান্তমতে স্বরূপকে চিনতে হয়। কিন্তু অহং ত্যাগ না করলে হয় না।'

একদিন আমি পরমহংসদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, জীব ও ব্রহ্মে পার্থক্য কি? তিনি বলিয়াছিলেন: 'নদীর স্রোতে জলের উপরে একটা লাঠি এড়োভাবে ধরলে জলকে দু'ভাগ হয়েছে দেখায়, কিন্তু নীচে একই জল থাকে। সেই রকম অহং-লাঠি দিয়ে জীব ও ব্রহ্ম পৃথক বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক ভেদ নেই। ব্রহ্মজ্ঞান হলে ভেদভাব দূর হয়।'

অহং একটি লাঠির স্বরূপ। লাঠি যেন জলকে দুই ভাগ করিয়াছে। তখন আমি আলাদা ও তুমি আলাদা। অমি অমুক, আমি পণ্ডিত—এই রকম মনে হয়। তাই 'আমি'-কে ত্যাগ করিতে হয়। তবে বিদ্যার 'আমি'তে দোষ নাই। শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য বিদ্যার 'আমি' রাখিয়াছিলেন।

॥ সন্ন্যাসীর লক্ষণ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন: 'হাজার ভক্ত হলেও বা জিতেন্দ্রিয় হলেও সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসে কথা কবে না। 'কাজল কি ঘরমে যেত্তা সেয়ান্ হোয়, থোড়া দাগ লাগে পর লাগে; যুবতীকে সাথমে যেত্তা সেয়ান হোয়, থোড়া কাম জাগে পর জাগে'।'

'ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর খাওয়ার বিচার থাকে না। শূকরমাংস পর্যন্ত তখন পবিত্র মনে হয়।' খাওয়া-দাওয়া বিচার নিম্ন-অধিকারীর

পক্ষে, উচ্চ-অধিকারী উপায়ে মন না দিয়ে লক্ষ্যে মন দেয়। খাওয়া-দাওয়ার বিচার উপায়, আর লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ।

॥ যোগ-সম্বন্ধে উপদেশ ॥

একদিন মহিমাচরণকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। পরমহংসদেব বলিতেছেন: 'যোগ মোটামুটি দু'প্রকার—কর্মযোগ আর মনোযোগ। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চার আশ্রমের মধ্যে তিনটিতে কর্মযোগ করতে হয়। সন্ন্যাসীরা দণ্ড, কমণ্ডলু ও ভিক্ষাপাত্র ধারণ করে যোগ সাধনা করে। গৃহস্থেরা নিষ্কাম-কর্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করে ও জ্ঞানলাভ করে।'

'পরমহংস অবস্থায় সকল কর্ম যেমন পূজা, জপ, তর্পণাদি কর্ম আর থাকে না। তখন কেবল স্মরণ-মননাদি থাকে এবং লোককল্যাণ-কামনা থাকে। অবতারাদির বেলায় তাই।'

মহিমাচরণ 'নারদপঞ্চরাত্র' হইতে আবৃত্তি করিলেন: "অন্তর্বহিঃ যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নান্তর্বহিঃ যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্" ইত্যাদি। পরে আমি পাঠ করিলাম: "যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং, চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্" ইত্যাদি এবং 'নির্বাণষটক্' হইতে আবৃত্তি করিলাম: "ওঁ মনো বুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তাদি নাহম্" ইত্যাদি। তাহার পর দেখি মহিমাচরণ 'শিবোঽহম' 'শিবোঽহম্' যতবার বলিতেছেন পরমহংসদেব ততবার বলিতেছেন: 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু, সচ্চিদানন্দ'। সেই দৃশ্য উপভোগ করিবার জিনিস। তাহার স্মৃতি আজিও আমার হৃদয়ে জাগরূক আছে।

॥ নিত্য ও লীলা ॥

পরমহংসদেব বলিতেন: 'যারই নৃত্য তারই লীলা। যেমন ছাদ আর সিঁড়ি। নিত্য সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তিনি নির্গুণ আবার সগুণ দুই-ই। তিনিই নিত্য ও লীলা। লীলা কিনা ঈশ্বরলীলা

দেবলীলা, নরলীলা, বিশ্বলীলা প্রভৃতি। নরলীলায় অবতার। ঈশ্বরই মানুষ হয়ে লীলা করেন ও তিনিই অবতার। সেই সচ্চিদানন্দই বহুরূপে জীব হয়েছেন এবং তিনিই মানুষরূপে লীলা করছেন—এই বিশ্বাস হলে তবে পূর্ণজ্ঞান হয়। নরলীলা কি রকম জান? যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে হুড় হুড় করে পড়ছে। সেই সচ্চিদানন্দের শক্তি একটা প্রণালী অর্থাৎ নলের ভিতর দিয়ে আসছে।'

নরেন্দ্রনাথের হস্তের মাংসপেশী টিপিয়া বলিলেন: 'তোর বিয়ে হবে না এবং স্ত্রীসঙ্গও হবে না।' এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ গাড়ীতে উঠিয়া দক্ষিণেশ্বর চলিয়া গেলেন। করুণাময় পরমহংসদেব যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। নরেন্দ্রনাথের বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। পরমহংসদেব বলিতেন: 'ঈশ্বর লাভ করতে হলে বীর্যধারণ করতে হয়। শুকদেবাদি উর্ধ্বরেতা ছিলেন। বার বৎসর উর্ধ্বরেতা অর্থাৎ ব্রহ্মচারী থাকলে বিশেষ শক্তি লাভ হয়। তখন মেধানাড়ী জন্মে। সকল বিষয় স্মরণে থাকে। যাবতীয় জ্ঞানলাভের শক্তি হয়।'

'গৃহস্থেরা সাধুদের টাকাপয়সা না দিলে তারা কি করে জীবন-ধারণ করবে? এখানে—পরমহংসদেবের নিকট প্যালা দিতে হয় না, তাই সকলে আসে।'

জনৈক তান্ত্রিক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল: 'তান্ত্রিকী ক্রিয়ায় আজকাল ফল হয় না কেন?' উত্তরে রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন: 'সর্বাঙ্গীন এবং ভক্তিপূর্বক হয় না। সেইজন্য ফল হয় না।'

॥ সাকার ও নিরাকার ॥

পরমহংসদেব বলিতেন: 'যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার। ঈশ্বরের সাকার রূপকেও জানতে হবে। সাধক যে রূপ চিন্তা বা ধ্যান করে সেইরূপই দর্শন করে। পরে অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মিলিয়ে যায়। তখন সাকার নিরাকার হয়ে যায়।'

পরমহংসদেব নিজমুখে তাঁহার লীলাপার্ষদ ও অন্তরঙ্গ ভক্তদের

নিকট তিনি যে 'পূর্ণ-অবতার' সেই কথা বলিতেন। তিনি বলিতেন: 'ভগবান অবতার হয়ে জীবকে জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা দেন। আমাকে তোদের কিরূপ মনে হয়?' তিনি নিজেই উত্তর দিলেন: 'আমার বাবা গয়াতে গিয়েছিলেন। গদাধর তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন—আমি তোমার সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করবো।' বাবা স্বপ্নে বলেছিলেন—'ঠাকুর, আমি গরীব ব্রাহ্মণ, কেমন করে আপনার সেবা করবো?' গদাধর বলেছিলেন—'তা' হয়ে যাবে। বুঝ্‌লি?' আমরা সকলে অবাক্ হয়ে তাঁর কথা শুনে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম। তিনি সহাস্যবদন।

॥ সর্বধর্ম সমন্বয় ॥

পরমহংসদেব বলিতেন: 'সব মতের লোকেরা আপনার মতকেই বড় করে গেছে। বৈষ্ণবেরা শাক্তদের খাটো করার চেষ্টা করে, আবার শাক্তেরা বৈষ্ণবদের খাটো করে। বৈষ্ণবেরা বলেন, কৃষ্ণমন্ত্র না নিলে ভবসাগর পার হওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী। তার বদলে শাক্তেরা বলেন—তা তো ঠিক, তবে আমাদের মা রাজরাজেশ্বরী, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভবপার করার জন্য রেখে দিয়েছেন। কিন্তু আমি দেখি সবই এক। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, বেদান্তমত সব মতই সেই সচ্চিদানন্দকে নিয়ে। যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার, আবার তাঁরই নানা রূপ।

নির্গুণ মেরা বাপ, সগুণ মাতারি।
কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারি॥'

'যিনি সর্বধর্মমতের সমন্বয় করতে পারেন তিনিই খাঁটি লোক। অন্য সবাই একঘেয়ে। বেদে যাঁকে 'ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম' বলেছে, তন্ত্রে তাঁকেই 'ওঁ সচ্চিদানন্দ শিব' বলা হয়েছে, আবার পুরাণে বলা হয়েছে 'ওঁ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ'। আবার বৈষ্ণবেরাই স্বীকার করেন শ্রীকৃষ্ণ কালী হয়েছিলেন। আসলে একই সচ্চিদানন্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যত

মত তত পথ। তাঁকে পাবার জন্য নানা মত ও নানা পথ, কিন্তু লক্ষ্য একটাই।'

॥ বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

১৫ই জুলাই ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সুরেশচন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে মহোৎসব। আমি সেই মহোৎসবে উপস্থিত ছিলাম। প্রতাপ মজুমদার প্রভৃতি ব্রাহ্ম-ভক্তেরাও গিয়াছিলেন।

রথযাত্রা ৩রা জুলাই (১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ)। রথযাত্রার দিন বৈকালে পরমহংসদেব বলরাম-মন্দিরে আসিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া আমিও তথায় যাইয়া দেখি যে, বড় হলঘরে (দ্বিতলে) পরমহংসদেব ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির সহিত কথোপ-কথন করিতেছেন। বলরামবাবুর পিতা, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপ মজুমদার, রামচন্দ্র দত্ত, মহেন্দ্র মাষ্টার প্রভৃতি সকলেই মজলিসে বসিয়া সেই কথাবার্তা শুনিতেছেন। আমিও একপার্শ্বে বসিয়া তাঁহাদের দুইজনের কথা শুনিতে লাগিলাম। পরমহংসদেব শশধর পণ্ডিতকে বলিলেন: 'জ্ঞানীর লক্ষণ শান্ত স্বভাব ও নিরভিমানী। বিজ্ঞানীর স্বভাব বালকবৎ, উন্মাদবৎ, জড়বৎ ও পিশাচবৎ।' শশধর পণ্ডিত সেই কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। পরমহংসদেব শাস্ত্র পড়েন নাই, কিন্তু সকল শাস্ত্রের চরমতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয় দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত ও স্তব্ধ।

॥ ভক্তি তিন প্রকারের ॥

পরমহংসদেব বলিতেন: 'ভক্তি তিন প্রকার: সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক। সাত্ত্বিক ভক্ত গোপনে সাধন-ভজন করে। লোকে যাতে না জানতে পারে সেরূপ মশারির মধ্যে বসে জপ, ধ্যান করে। সত্ত্বের সত্ত্ব অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্ব হলে ঈশ্বরদর্শন অতি নিকটে। রাজসিক ভক্তিতে একটু লোকদেখানো ভাব থাকে; যেমন ষোড়শোপচারে

পূজা ও বাহ্যিক আড়ম্বর। রামপ্রসাদ তাই বলেছেন: 'জাঁকজমকে করলে পূজা, অহংকার হয় মনে মনে'। জাঁকজমকে পূজা করলে মনে অহংকারের উদয় হওয়া সম্ভব। তামসিক ভক্তিতে জোর-জবরদস্তি,—যেমন শাক্ত ও শৈবদিগের 'জয় মা', 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' ইত্যাদি। কিন্তু বৈষ্ণবদের ভক্তিতে অতি দীনহীন ভাব। তারা মালা জপে এবং কেঁদে বলে: 'হে কৃষ্ণ, আমায় দয়া কর। আমি অধম, আমি মহাপাপী। আমায় উদ্ধার কর।' তাদের এমনই জ্বলন্ত বিশ্বাস নেই যে, আমি তাঁর (ভগবানের) নাম একবার করেছি, সুতরাং আমার সব পাপ নষ্ট হয়ে গেছে। জ্ঞানীরা বলেন: 'আমার আবার পাপ কোথায়?' এই বলিয়া পরমহংসদেব নিজে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া মধুর কণ্ঠে গান গাহিতে লাগিলেন। শশধর পণ্ডিতের চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল এবং সকলে নির্বাক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সেইদিনের সেই অপূর্ব ঘটনার কথা আমার হৃদয়ে আজও অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

তাহার পর কথক বৈষ্ণবচরণ কীর্তন আরম্ভ করিলেন। তিনি গাহিতে লাগিলেন: 'দুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার' ইত্যাদি। পরমহংসদেবও ভাবাবিষ্ট হইয়া গাহিতে লাগিলেন: 'যশোদা নাচাত তোমায় বলে নীলমণি' ইত্যাদি। তৎপরে উভয়ের কীর্তন শেষ হইলে উভয়ে পরস্পরে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলিলেন। ইতিমধ্যে উপরের ঘরের বারান্দায় জগন্নাথদেবের ছোট রথটি সুসজ্জিত করিয়া আনা হইল। পরমহংসদেব ভক্তগণের সঙ্গে রথের দড়ি ধরিয়া একটু টানিলেন এবং গাহিতে লাগিলেন: 'নদে টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোরে' ইত্যাদি। তাহা এক অপূর্ব দৃশ্য। পরমহংসদেব ভাবাবেশে গানের সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তেরাও সেই নৃত্যে যোগদান করিয়াছিলেন। এইরূপে সঙ্কীর্তন ও নৃত্যের মাতামাতির পর পরমহংদেব হলঘরে আসিয়া বসিলেন এবং পণ্ডিত শশধরকে বুঝাইতে লাগিলেন: 'একে বলে ভজনানন্দ। সংসারীরা কাম-কাঞ্চন দিয়ে বিষয়ানন্দ উপভোগ করে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা ভজনানন্দ করতে করতে ব্রহ্মানন্দ লাভ করে।'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

॥ গলরোগের আরম্ভ (২৪শে এপ্রিল, ১৮৮৫) ॥

এইরূপে জমাট আনন্দের মধ্য দিয়া ভক্তদের সঙ্গে পরমহংসদেবের দিন কাটিতেছে। হঠাৎ একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়া দেখি তাঁহার গলায় বেদনা হইয়াছে। তিনি বালকের ন্যায় সকলকে গলা দেখাইতেছেন এবং যে যাহা ব্যবস্থা দিতেছে তাহাই করিতে উদ্যত হইতেছেন। তিনি কুল্পির বরফ খাইতে ভালবাসিতেন। বৈশাখ মাসে অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। একজন ভক্ত এক হাঁড়ি কুল্পির বরফ দক্ষিণেশ্বরে আনিয়া তাঁহাকে দিয়াছিল। তিনি তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য প্রচুর পরিমাণে সেই বরফ খাইয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার গলায় বেদনার সূত্রপাত হইয়াছিল। বেদনা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিছুতেই আর কমে না। ঢোক গিলিতে, কথা কহিতে এবং আহার করিতেও কষ্ট হইতে লাগিল।

একদিন গোলাপ-মা পরমহংসদেবকে বলিলেন, কলিকাতার দুর্গা-চরণ ডাক্তার একজন বড় চিকিৎসক, তাঁহাকে দেখাইলে তিনি সম্ভবত যথার্থ ব্যবস্থা বলিয়া দিতে পারেন। পরমহংসদেব শুনিয়া সেই ডাক্তারকে দেখাইতে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। আমিও সেই রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে ছিলাম। লাটু এবং গোলাপ-মাও দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিতে ছিলেন। পরদিবস প্রাতে নৌকারোহণে কুমারটুলি ঘাটে যাওয়া স্থির হইল। একখানি নৌকাও ভাড়া করা হইল। পরমহংসদেবের সঙ্গে লাটু, গোলাপ-মা ও আমি কলিকাতা যাত্রা করিলাম। নৌকা হইতে নামিয়া তিনি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে করিয়া বিডন-বাগানে ডাক্তারের নিকট যাওয়া স্থির করিলেন। নিজপার্শ্বে আমায় কৃপা করিয়া বসাইলেন। লাটু ও গোলাপ-মা অপরদিকে বসিলেন (এখানে রামকৃষ্ণপুঁথিতে ভুল আছে)। পরমহংসদেব গাড়ীতে গোলাপ-মার

সঙ্গে এক আসনে বসেন নাই এবং অঞ্জলি করিয়া তাঁহাকে জল খাওয়ান নাই (যাহা রামকৃষ্ণপুঁথিতে আছে)। বিডন স্কোয়ারে আমার স্কন্ধে ভর দিয়া তিনি পদচারণ করিতে লাগিলেন। আমি ফ্রিম্যাসনদের প্রতীকসমূহ (symbols) দেখাইয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলাম। ডাক্তারকে গলা দেখানো হইল। তিনি যথোচিত ব্যবস্থা লিখিয়া দিলেন। তাহার পর আহিরীটোলার ঘাট হইতে নৌকারোহণে সকলে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিতে লাগিলাম। বেলা প্রায় আড়াই প্রহর হইয়াছে, কাহারও কিছু খাওয়া হয় নাই। দেখিলাম, পরমহংস-দেবেরও অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে। তিনি মাঝিকে বরাহনগরের প্রামাণিক ঘাটে নৌকা ভিড়াইতে আদেশ করিলেন। সেখান হইতে বাজার অত্যন্ত নিকটে, সুতরাং দোকান হইতে কিছু জলখাবার ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য তিনি আমাকে আদেশ করিলেন। গোলাপ-মার নিকট এক আনা মাত্র পয়সা ছিল। সেই পয়সা লইয়া আমি তৎক্ষণাৎ বাজার হইতে ঠোঙ্গায় করিয়া ছানার মুড়কি লইয়া আসিলাম এবং পরমহংসদেবকে দিলাম। তিনি ছানার মুড়কির সমস্তগুলি পরমানন্দে আহার করিয়া পাতার ঠোঙ্গা গঙ্গায় ফেলিয়া দিলেন এবং হাত ধুইয়া অঞ্জলি অঞ্জলি গঙ্গাজল পান করিয়া ঢেঁকুর তুলিলেন। এইদিকে আমরা তিনজনে ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিলাম। পরমহংসদেব তাহা জানিতেন। কিন্তু তিনি ঐ ছানার মুড়কির কিছুও আমাদের কাহাকে না দিয়া নিজেই ভক্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, পরমহংসদেব ঢেঁকুর তুলিবামাত্র আমাদের সমস্ত ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল। আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তখন নীরবে তাকাইতে লাগিলাম। ইহা দেখিয়া পরমহংসদেব হাসিতে লাগিলেন এবং আমাদের সহিত বালকের ন্যায় ঠাট্টা-তামাসা করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হইলেন। দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ীর ঘাটে নৌকা থামিল। আমরা সকলেই নৌকা হইতে নামিলাম। আমরা আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির বিষয় পরস্পরে আলোচনা করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম এবং

বুঝিলাম যে, ইহা পরমহংসদেবের একটি বিভূতি বা 'মিরাকেল' (miracle)। শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র লীলা এবং 'তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট' —এই কথার মর্ম সেইদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলাম।

॥ পানিহাটীর মহোৎসব ॥

প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লা-ত্রয়োদশী তিথিতে পানিহাটীতে চিড়ার মহোৎসব হইয়া থাকে। পরমহংসদেব প্রতি বৎসর পানিহাটীর মহোৎসবে যাইতেন। সেইবার তাঁহার গলায় ব্যথা, তথাপি তিনি পানিহাটীর উৎসবে যাইবেন স্থির করিলেন। একখানি নৌকা ভাড়া করা হইল। তাঁহার সঙ্গে আমি, লাটু এবং আরও কয়েকজন ভক্ত যাত্রা করিলাম। পরমহংসদেব, আমি ও লাটু একটি নৌকায় এবং ভক্তগণ অপর নৌকায় যাত্রা করিলেন। পানিহাটীর মহোৎসবে উপস্থিত হইয়া পরমহংসদেব সংকীর্তনে মাতিয়া মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধিতে মগ্ন হইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে ভাবে নৃত্য করিতেছেন। তাহা এক অপরূপ দৃশ্য! সন্ধ্যার সময় সকলে নৌকায় করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলাম। এই যাত্রায় ঠাণ্ডা লাগিয়া পরমহংসদেবের গলার বেদনা আরও বাড়িয়া গিয়াছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আশ্বিন। সেই সময় হইতে শ্যামপুকুরের বাসায় পরমহংসদেব তিন মাস ছিলেন। রামচন্দ্র দত্ত, সুরেশ মিত্র প্রভৃতি গৃহস্থ-ভক্তগণ তাঁহার গলার অসুখের চিকিৎসা করাইবার জন্য কলিকাতায় ৫৫নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর হইতে গাড়ী করিয়া লইয়া আসিলেন। সঙ্গে সেই গাড়ীতে লাটু ও আমি আসিয়াছিলাম। প্রথমে সেই বাড়ী ভাড়া লইবার পূর্বে পরমহংসদেব বলরামবাবুর বাড়ীতে প্রায় এক সপ্তাহ অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্যামপুকুরের বাড়ীতে পরমহংসদেব ও আমাদের রান্না করিবার জন্য ভক্তিমতী সেবিকা গোলাপ-মা আসিয়াছিলেন। কিছুদিন

পরে রামবাবু প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীমাকে তথায় আনাইবার প্রস্তাব করিলেন। পরমহংসদেব ঐ প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন: 'লোকে বলবে কি! এক পরমহংস এক পরমহংসীকে নিয়ে শ্যামপুকুরে বাস করছে।' কিন্তু ভক্তেরা বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিলেন তাঁহার সেবার ত্রুটি হইতেছে। শ্রীমা আসিয়া সেবা করিলে তাঁহার কোন কষ্ট হইবে না এবং ভক্তেরাও নিশ্চিন্ত থাকিবে। অবশেষে তিনি সম্মতি দান করিলেন। শ্রীমাকে দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্যামপুকুরের বাড়ীতে লইয়া আসা হইল। ঠিক সেই সময় হইতে আমিও একেবারে গৃহত্যাগ করিয়া পরমহংসদেবের সেবায় নিযুক্ত হইলাম এবং সকল সময় তাঁহার নিকটে থাকিতাম। ঐ সময় নরেন্দ্রনাথও সর্বদা পরমহংসদেবের কাছে থাকিতেন এবং সেইজন্য personal attache to his Holiness Sree Ramakrishna এই আখ্যা দিয়া তখন সকলে আমাদের সম্বোধন করিত।

আমি ডাঃ প্রতাপ মজুমদার, ডাঃ মহেন্দ্র সরকার প্রভৃতির নিকট তাঁহার গলার অসুখের দৈনন্দিন বিবরণ দিয়া ঔষধাদি লইয়া আসিতাম। ডাঃ মহেন্দ্র সরকার পরমহংসদেবের প্রতি এমনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে দেখিতে আসিলে চার পাঁচ ঘণ্টা বসিয়া তাঁহার উপদেশাবলী শ্রবণ করিতেন এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও নরেন্দ্রনাথের সহিত ধর্ম, অবতারবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করিতেন। আমি মন দিয়া সেই সকল আলোচনা ও তর্কবিতর্ক শ্রবণ করিতাম। শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতেও এই সকল বিষয়ের বর্ণনা আছে।

একদিন পরমহংসদেব সমাধিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া আছেন। ডাঃ মহেন্দ্র সরকার তাঁর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, পাল্‌স নাই এবং নাড়ী পরীক্ষার যন্ত্র দিয়া হৃৎপিণ্ডের কোন শব্দও পাইলেন না। উন্মীলিত চক্ষুদ্বয়ের গোলকে অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করিতেও পরমহংসদেবের কোন বাহ্য জ্ঞান আসিল

না দেখিয়া ডাক্তার অবাক হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পরমহংস-দেবের সমাধিভঙ্গ হইলে তিনি আবার ডাক্তার সরকারের সহিত আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন ঈশ্বরের অবতার স্বীকার করিত না। গিরিশচন্দ্র ঘোষ অবতারবাদ মানিতেন এবং সেইজন্য নরেন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্রের মধ্যে বেশ তর্কবিতর্ক চলিত। পরমহংসদেব একদিন নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলিলেন: 'নরেন্দ্রের নিরাকারে নিষ্ঠা স্বতঃসিদ্ধ। সে সাকার দেবদেবী মানৃত না। মা কালীকে যা ইচ্ছা তাই বলত। আমি বিরক্ত হয়ে একদিন তাকে বলেছিলাম, শ্যালা, তুই আর এখানে আসিস্ নি। তখন সে আমার জন্য তামাক সাজতে লাগল। কিছুই বললো না। কি জানিস্, আপনার লোককে তিরস্কার করলেও সে কিছু বলে না।' পরমহংসদেবের বলার উদ্দেশ্য যে, নরেন্দ্রনাথ তাঁহার অত্যন্ত আপনার ও অন্তরঙ্গ লোক। সেইজন্য নরেন্দ্রনাথকে তিরস্কার করিলেও নরেন্দ্রনাথ তাহার কোন প্রতিবাদ করে না বা কোন দুঃখ অভিমান করে না। এই সকল কথা হইতে শিষ্য, ভক্ত ও অন্তরঙ্গ সন্তানদিগের উপর পরমহংসদেবের কি অপার ভালবাসা ছিল তাহা বোঝা যায়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

॥ শ্যামপুকুরের বাড়ীতে ॥

শ্যামপুকুরের বাড়ীতে একদিন (৩১শে অক্টোবর, ১৮৮৫) একজন কোয়েকার-সম্প্রদায়ভুক্ত মিশ্র নামক খ্রীষ্টান পরমহংসদেবকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। আমি তখন উপস্থিত ছিলাম। মনে আছে, মিশ্র-মহাশয় সাহেবী পোষাক পরিধান করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি যীশুখ্রীষ্টের পরমভক্ত ছিলেন। তিনি বলিলেন, যীশুখ্রীষ্ট মেরীর পুত্র নহে, স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার। তাহার পর তিনি যীশুখ্রীষ্টের অলৌকিক শক্তি ও গুণমহিমা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিতে শুনিতে পরমহংসদেব বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ভাবাবেশে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কোয়েকার-ভক্ত মিশ্র মহাশয় পরমহংসদেবের প্রশান্ত মূর্তি ও হস্তের ভঙ্গি দেখিয়া তাঁহার ভিতর তাঁহার ইষ্টদেবতা যীশুখ্রীষ্টকে যেন দর্শন করিলেন। তিনি স্তব করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি সমাগত ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: 'আপনারা এঁকে চিনতে পারছেন না। ইনি ও যীশুখ্রীষ্ট অভিন্ন। আজ এঁর যে ভাব দর্শন করলাম, যীশুখ্রীষ্টেরও ঠিক এরূপ ভাব হত। আমি ইতিপূর্বে যীশুখ্রীষ্ট এবং পরমহংসদেবকে স্বপ্নে (vision) দেখেছি। ইনিই বর্তমানে যীশুখ্রীষ্ট।' এই কথা আমরা সকলে শুনিয়া নির্বাক হইয়া রহিলাম।

একদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকা হইতে শ্যামপুকুরের বাড়ীতে অকস্মাৎ পরমহংসদেবকে দেখিতে আসিলেন। আমি পরমহংসদেবের পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলাম। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পরমহংসদেবকে বলিলেন: 'আমি আপনাকে সেখানে (ঢাকাতে) এইরকম স্থূলশরীরে দেখেছি। আপনি সেখানে গিয়েছিলেন কি?' পরমহংসদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন: 'আপনার ভক্তির জোরে আপনি আমাকে দেখেছেন!' এই কথা বলিয়া পরমহংসদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং বিজয়-

কৃষ্ণের বক্ষে দক্ষিণপদ স্থাপন করিলেন। তখন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া ভাবে অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন। আমরা সকলে অবাক্ হইয়া সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ভাবিলাম তাহা দেবলীলাই বটে!

স্বামী সারদানন্দ-রচিত শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—পঞ্চম খণ্ডে (ঠাকুরের নিজভাব ও নরেন্দ্রনাথ) ৩১৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে: "(অধুনা পরলোকগত) বৃদ্ধ স্বামী অদ্বৈতানন্দ অথবা স্বামী অদ্ভুতানন্দের দ্বারা শ্রীমা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নিম্নে সংবাদ প্রেরণ করিতেন।" যথার্থ ঘটনা হইল, বৃদ্ধ স্বামী অদ্বৈতানন্দ (বুড়োগোপাল) শ্যামপুকুরের বাসায় কখন কখন আসিত। কিন্তু সে কোনদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাকার্যে নিযুক্ত হয় নাই। আমি অথবা লাটুর দ্বারাই শ্রীমা তাঁহার সকল সংবাদ পরমহংসদেবের নিকট প্রেরণ করিতেন। শশী, যোগেন, শরৎ, নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম তখনও নিজ নিজ বাড়ীতে থাকিত এবং মধ্যে মধ্যে পরমহংসদেবকে দেখিতে আসিত। তারকদা (শিবানন্দ) এবং নৃত্যগোপালও তাহাদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে আসিত। অবশ্য গলরোগ যখন বৃদ্ধি পাইল তখন নরেন্দ্রনাথ প্রতিদিনই আসিত ও পরমহংসদেবের নিকট থাকিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিত।

শ্যামপুকুরের বাড়ীতে একদিন সন্ধ্যার পর কালীপদ ঘোষ (কালীদাদা) অভিনেত্রী বিনোদিনীকে কোট প্যাণ্ট পরাইয়া পরমহংসদেবের পদধূলি ও আশীর্বাদ লইবার জন্য সঙ্গে আনিয়াছিল। বিনোদিনী 'চৈতন্যলীলা' নাটকে শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করিত। আমরা সাহেবী পোষাক দেখিয়া কিম্‌কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরমহংসদেবের নিকট নিবেদন করিলাম যে, কোন এক সাহেব তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি তখন শশব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং সর্বাঙ্গে কাপড় দিয়া আচ্ছাদন করিতে লাগিলেন। তাহার পর যখন তিনি জানিতে পারিলেন সাহেবী পোষাকে যে আসিয়াছে সে আর কেহ

নহে—অভিনেত্রী বিনোদিনী, তখন তিনি হাসিতে লাগিলেন। আমরাও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এইরূপ রঙ্গ-তামাসাও মাঝে মাঝে পরমহংসদেবের নিকট ঘটিত।

॥ পরমহংসদেবের শ্যামপুকুরে অবস্থান ॥

শ্যামপুকুরের বাসায় যতদিন পরমহংসদেব ছিলেন ততদিন শশী, শরৎ, যোগেন, নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম ও বুড়োগোপাল নিজ নিজ বাড়ী হইতে আসিয়া পরমহংসদেবের সেবা-শুশ্রূষা করিত। অবশ্য নিরঞ্জন ঘোষ (নিরঞ্জনানন্দ) প্রতিদিন পরমহংসদেবের দ্বারপালকরূপে আমাদের সঙ্গে থাকিতেন। নিরঞ্জনের শরীরের দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল না, কারণ তাহার স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল। একদিন এক টিন খাঁটি ঘৃত আনিয়া শ্যামপুকুরের বাড়ীর এক কোণে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। অন্তর্যামী শ্রীশ্রীঠাকুর নিরঞ্জনের কাণ্ডকারখানা বুঝিতে পারিয়া আমাদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন: 'নিরঞ্জনের ঐ ঘিয়ের টিন কেড়ে লে। বেশী ঘি খেলে ও মস্তি রাখবে কোথা ? শেষে মাগী ধরবে' ইত্যাদি। আমরা সেই ঘৃতের টিন সকলে ভাগ করিয়া ভাতের সহিত খাইতে লাগিলাম। পরমহংসদেব শুনিয়া আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্যামপুকুরের বাড়ীতে গোলাপ-মা ভক্তদের জন্য পাক করিতেন সেই কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

॥ সন্ধিপূজার দিন ॥

শারদীয়াপূজার মহাষ্টমীর দিন সন্ধ্যার পর সন্ধিপূজার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ ভাবাবেশে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। নরেন্দ্রনাথ, আমি, লাটু, নিরঞ্জন এবং অন্যান্য ভক্তগণ তাঁহার শ্রীচরণে আনন্দে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া রহিলেন। পরে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন: 'একটা জ্যোতির রাস্তা দেখলাম। সেই রাস্তা এখান থেকে সুরেন্দ্রের (সুরেশচন্দ্র মিত্রের)

ঠাকুরদালানে শেষ হয়েছে সেখানে মা দুর্গার প্রতিমার এক পার্শ্বে দেখলাম সুরেন্দ্র কাঁদছে।' আমরা ইহা শুনিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

সেই রাত্রে সুরেশবাবুর বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথের, আমার ও ভক্ত-দিগের নিমন্ত্রণ ছিল। আমরা তাঁহার পূজার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সুরেশবাবুর মুখে শুনিলাম, জ্যেষ্ঠভ্রাতার তিরস্কারে তাঁহার প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগায় তিনি কাঁদিতেছিলেন এবং হৃদয়ের ব্যথা দেবী দুর্গাকে জানাইতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন পরমহংসদেব শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমার এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন এবং তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতেছেন। এই অপূর্ব দর্শনের পর তাঁহার প্রাণে শান্তি ও মহানন্দ বিরাজ করিতে লাগিল। সুরেশবাবুর কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবাবস্থায় আমাদের যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সত্যতা দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া গেলাম। বিজয় গোস্বামীকে ঢাকায় দর্শনদানের ও সন্ধিপূজার ঘটনা দেখিয়া আমরা ভাবিলাম: 'These two instances prove that Sri Ramakrishna could project his double and appear at a distance'—অর্থাৎ ঐ দুইটি ঘটনা হইতে প্রমাণ হইল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার নির্মাণকায় সৃষ্টি করিতে পারিতেন এবং বাহিরে দূরেও আবির্ভূত হইতে পারিতেন। যোগের ইহাও একটি শক্তি। তবে শ্রীশ্রীঠাকুর যোগ-বিভূতির প্রশ্রয় দিতেন না।

॥ শ্যামপুকুরে কালীপূজা ॥

দেবেন্দ্রনাথ-প্রমুখ ভক্তগণের ইচ্ছা ছিল যে, কালীপ্রতিমা আনিয়া পূজা করা হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহার পূর্বদিনে ভক্তদিগের সহিত কথা কহিতে কহিতে বলিয়াছিলেন: 'কাল মা কালীর পূজা করতে হবে। সংক্ষেপে পূজার উপকরণগুলি আয়োজন করে রাখিস্।' তখন ভক্তেরা প্রতিমাপূজার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু পূজার

আয়োজন কম নয়। অধিকন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর অসুস্থ এবং ভক্তদের উত্তেজনায় তাহা আরও অবসন্ন হইতে পারে ইত্যাদি চিন্তা করিয়া ভক্তগণ পঞ্চোপচারে পূজার দ্রব্য—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য (ফল মিষ্টান্নাদি) সংগ্রহ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে রাখিল। শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর নিজের বিছানায় স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। ভক্তেরা কিভাবে কালীপূজা হইবে ভাবিতেছে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর ধুনা আনিতে বলিলেন। ইতিমধ্যে তিনি দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া পূজার দ্রব্যাদি নিজের মধ্যে বিরাজমানা জগন্মাতাকে নিবেদন করিলেন এবং সমবেত ভক্তগণকে ধ্যান করিতে বলিলেন। ভক্তগণ মা কালীর পরিবর্তে পরমহংসদেবের মূর্তির ধ্যান করিতেছেন। এমন সময় তিনি বরাভয়মুদ্রা-হস্তে উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া সমাধিস্থ হইলেন। তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে অপূর্ব জ্যোতির প্রকাশ পাইতেছিল। অকস্মাৎ পার্শ্বে উপবিষ্ট ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলিয়া উঠিলেন: 'আমাদের সামনে আজ জীবন্ত মা কালী বিরাজ করছেন। এসো, আমরা এঁর পূজা করি। এঁর পূজা করলেই মা কালীর পূজা করা হবে।' এই কথাগুলি বলিয়া তিনি মালা ও পুষ্পচন্দন লইয়া 'জয় মা' বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া গিরিশচন্দ্রের পূজা গ্রহণ করিলেন। আমি, নিরঞ্জন ও গৃহস্থ-ভক্তগণও একে একে 'জয় মা কালী' বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলাম। তাহার পর শ্রীশ্রীঠাকুর মিষ্টান্নাদি প্রসাদ করিয়া দিলেন। তাহা ভক্তগণের মধ্যে বণ্টন করা হইল। সকলে প্রসাদ পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিল। গিরিশচন্দ্র-প্রমুখ ভক্তগণ সমস্বরে তখন জগন্মাতার স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। সেই ঘটনার কথা আজও আমার মনে জাগরূক আছে, সেই অপূর্ব দৃশ্য আমরা জীবনে কোনদিন ভুলিতে পারিব না।

॥ শ্রীশ্রীঠাকুরের গলার অসুখ ॥

এখন প্রশ্ন হইতে পারে শ্রীশ্রীঠাকুরের গলরোগের সৃষ্টি হইল কেন? ইহার উত্তর দেওয়া সত্যই কঠিন। শ্যামপুকুরের বাসায় অবস্থান-কালীন শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন: 'মা আমায় বুঝিয়ে দিলেন যে, লোকে নানাপ্রকার পাপকর্ম করার পর আমার পদস্পর্শ করে পবিত্র হয়। তাদের পাপভার আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছে এবং তারই ফলে এই গলরোগ ভোগ করতে হচ্ছে।' ইহাকে বলে 'vicarious atonement'—যাহা যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার জীবনে ভোগ করিয়াছিলেন। একদিন নরেন্দ্রনাথও বলিয়াছিল: 'All this will appear like a dream in our lives, only its memory will remain with us'—অর্থাৎ 'এই সমস্তই আমাদিগের জীবনে যেন স্বপ্নের মতো মনে হইবে এবং ইহার স্মৃতি অন্ততঃ আমাদের মধ্যে থাকিয়া যাইবে।' নরেন্দ্রনাথের কথাগুলি আজিও আমার কর্ণে যেন প্রতিধ্বনিত হইতেছে!

॥ শ্যামপুকুর হইতে কাশীপুরের বাগানবাটীতে ॥

শ্যামপুকুরে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসায় যখন গলরোগের উপশম ইহল না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন ডাক্তারেরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্থান পরিবর্তন করিতে উপদেশ দিলেন। ভক্তগণ অনেক অনুসন্ধান করিয়া কাশীপুরে গোপালচন্দ্র ঘোষের সুবৃহৎ বাগানবাড়ী মাসিক ৮০৲ টাকা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বাসের জন্য ভাড়া করিলেন। ভক্তপ্রবর সুরেন্দ্র (সুরেশচন্দ্র মিত্র) ঐ বাটীভাড়ার সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন এবং নয় মাসের লিজ (lease) লইলেন (for six months first and three months after-wards)। ২৭শে অগ্রহায়ণ (ইং ১১ই ডিসেম্বর ১৮৮৫) শুভদিনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে শ্যামপুকুর হইতে কাশীপুরে আনয়ন করা হইল।

সেবকরূপে আমরা এবং শ্রীশ্রীমা ও গোলাপ-মা তাঁহার সঙ্গে কাশীপুরের বাগানবাটীতে উপস্থিত হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে ও উপস্থিত সকল সন্তানকে একদিন বলিলেন: 'ছাখ্, আমার এই গলার ঘা একটি উপলক্ষ্য মাত্র। এই কারণে তোরা সকলে একত্র হয়েছিস্।'

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

॥ কাশীপুরে অবস্থান ॥

প্রথম প্রথম আমরা দুই-তিনজন শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষা করিতাম। শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের পথ্য রন্ধন করিতেন। গোলাপ-মা ও লক্ষ্মীদিদি শ্রীমাকে সাহায্য করিতেন। গোলাপ-মা উপস্থিত সেবকদিগের জন্য পাক করিতেন। ক্রমে সেবকগণের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন একটি পাচকব্রাহ্মণ ও একজন দাসীও নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

কলিকাতার বদ্ধ আবহাওয়া পরিবর্তন করিয়া কাশীপুরের বাগানে অবস্থান করাতে কিছুদিনের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের গলার অসুখের কিছু উপশম হইল। বাগানবাড়ীতে দ্বিতলের গোল-ঘরটিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়নকক্ষ নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। তাহার দক্ষিণে গাড়ীবারান্দার উপরে ছাদ ছিল, সেইখানে দাঁড়াইয়া তিনি বাগানের বৃক্ষ-লতাদি দর্শন করিতেন। মুক্ত বায়ু সেবন করিয়া সত্যই তাঁহার স্বাস্থ্যের উপকার হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণের মনে আশা হইয়াছিল শীঘ্রই তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন।

একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার শরীর সুস্থ ভাবিয়া উপর হইতে নীচে নামিয়া বাগানের চতুষ্পার্শ্বে পদচারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ঐরূপ পদচারণ করিতে দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দিত হইল এবং ভাবিল তিনি প্রতিদিন যদি ঐরূপ পদচারণা করিতে পারেন তাহা হইলে শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিবেন। কিন্তু বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস শরীরে লাগাতে তাঁহার গলার বেদনা পরদিন আবার বর্ধিত হইল; শরীরও অত্যন্ত দুর্বল হইল। চিকিৎসকরা তাঁহার জন্য বলকারক পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে কচিপাঁঠার মাংসের ক্বাথ বা সুরুয়া খাওয়াইতে হইবে এবং তাহা হইলে তিনি শরীরে শক্তি পাইবেন। চিকিৎসকগণের ব্যবস্থা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর সেবকগণকে

বলিলেন: 'ছাখ্, তোরা যে দোকান থেকে পাঁঠার মাংস কিনে আন্‌বি, দেখবি—সেখানে কষাই-কালীমূর্তি যদি না থাকে তাহলে মাংস কিনিস্ নি। যে দোকানে কষাই-কালীর প্রতিমা থাক্‌বে সেই দোকান থেকে মাংস আন্‌বি।' ভক্তেরা তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া মাংস লইয়া শ্রীমার নিকট প্রদান করিত, শ্রীমা তাহাকে কয়েক ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া ও ছাঁকিয়া মাত্র ক্বাথটুকু শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাইতে দিতেন।

সেবকগণ পালাক্রমে সমস্ত কার্য, যথা গৃহ পরিষ্কার করা, বাসন মাজা, বাজার করা ইত্যাদি ভাগ করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং ক্রমশঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষার জন্য বেশী সেবকের আবশ্যক হইয়া পড়িল। তখন তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ—নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, যোগেন, শরৎ, শশী, বুড়োগোপাল, বাবুরাম, ছুটগো গোপাল প্রভৃতি আসিয়া আমাকে ও লাটুকে সাহায্য করিতে লাগিল। তাহারা কাশীপুরের বাগানে আসিয়া ক্রমশঃ অবস্থান করিতেও লাগিল।

তখন তারকদাদা (স্বামী শিবানন্দ) ভক্ত রাম দত্তের বাড়ীতে থাকিতেন। নৃত্যগোপাল মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিবার জন্য কাশীপুরের বাগানে আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে তারকদাদাও আসিতেন। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর তারকদাদাকে একাকী পাইয়া বলিয়াছিলেন: 'তুই নৃত্যগোপালের পিছনে পিছনে বেড়াস্ কেন? ও এখানকার নয়। তুই এখানে ছেলেদের সঙ্গে থাক্।' তারকদাদা সেই কথা শুনিয়া একটু চিন্তিত হইয়াছিলেন, কেননা হঠাৎ বাড়ী ছাড়িয়া কাশীপুরের বাগানে আসিয়া থাকার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। অতঃপর একদিন নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ ও অভিপ্রায় অবগত হইয়া তারকদাদাকে (তারকদাদা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া আমরা সকলে তাঁহাকে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিতাম) নিভৃতে পাইয়া জোর করিয়া বলিয়াছিল: 'আর কেন? এখানে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় জীবন সার্থক করুন।'

নরেন্দ্রনাথের কথা তারকদাদা আর এড়াইতে পারিলেন না। তাঁহার মনোভাবের পরিবর্তন হইল। ক্রমে তারকদাদা নৃত্যগোপালের নিকট হইতেও বিদায় লইয়া কাশীপুরে আমাদের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবকরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তারকদাদা প্রথম হইতে সকলের সহিত মিশিতে পারিতেন না, সেইজন্য তিনি প্রায় আপন মনে চুপকরিয়া থাকিতেন।

নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে যুবক-সেবকগণের অগ্রণী হইয়া সেবাকার্য বিভাগ করিয়া দিল এবং তদনুযায়ী প্রত্যেকেই পালাক্রমে দিবারাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল। বারোজন সেবকের মধ্যে প্রত্যেকের দুই ঘণ্টাকাল শ্রীশ্রীঠাকুরকে পর্যবেক্ষণ (watch) করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমি দুই ঘণ্টা দিনে ও দুই ঘণ্টা রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষা করিতাম। দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীঠাকুরের গায়ে তৈল মাখাইয়া গাড়ীবারান্দার ছাদের উপর জলচৌকিতে বসাইয়া স্নান করাইতাম। স্নানের সময়ে ও পরে কত কথাই না তিনি আমাকে বলিতেন এবং গভীর অধ্যাত্মতত্ত্বসমূহ বুঝাইয়া দিতেন। একদিন একটি ছোট কাঠি লইয়া দেয়ালের বালির উপর একটি পাখি বসিয়া আছে তাহা অতি সুন্দরভাবে আঁকিলেন। পাখিটি জীবন্ত পাখীর ন্যায় দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন: 'আমি ছেলেবেলায় সব পোটোকে (পটুয়াকে) ছবি এঁকে অবাক্ করে দিতাম।' শ্রীশ্রীঠাকুরকে সেবা-শুশ্রূষা করার সময়ে আমি গভীর রাত্রি পর্যন্ত প্রত্যহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতাম। নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সকলে ঐ একইভাবে দুই ঘণ্টা পালাক্রমে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা নিয়মিতভাবে করিত। এইরূপে কিছুদিন চলিতে লাগিল। এইদিকে প্রতিদিন বহু ভক্তের সমাগম হইতে লাগিল। চিকিৎসকেরা তাঁহাকে কথাবার্তা কহিতে নিষেধ করিতেন, কিন্তু তিনি শুনিতেন না। তিনি সকলের কল্যাণের জন্য সদুপদেশ দিতে বিরত হইতেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কল্পতরু হইয়াছিলেন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী।

সকল অফিসের ছুটির দিন থাকায় একদিন বৈকালে গিরিশ ঘোষ প্রভৃতি গৃহস্থ-ভক্তগণ কাশীপুর বাগানে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেইদিন পূর্বাপেক্ষা সুস্থ অনুভব করিয়া একাকী সেবক-যুবকদিগকে কিছু না বলিয়া নীচে নামিয়া বাগানে পদচারণা করিতে লাগিলেন। গৃহস্থ-ভক্তগণ তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতে আরম্ভ করিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর সংজ্ঞালাভ করিয়া সকলকে আশীর্বাদ করিতে করিতে বলিলেন: 'তোমাদের চৈতন্য হোক্! তোমাদের চৈতন্য হোক্!' কাহাকেও বা স্পর্শ করিয়া তাহার অধ্যাত্মনেত্র খুলিয়া দিলেন এবং যে যাহা প্রার্থনা করিল তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন: 'তোর হবে'।

ভাই ভূপতি সমাধি প্রার্থনা করিয়াছিল। তাহাকে শ্রীশ্রীঠাকুর কৃপা করিয়া বলিয়াছিলেন: 'তোর সমাধি হবে।' উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের) অত্যন্ত গরীব অবস্থায় অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছিল বলিয়া অর্থ প্রার্থনা করিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে কৃপা করিয়া বলিলেন: 'তোর অর্থ হবে।' রামলাল দাদা, বৈকুণ্ঠ সান্যাল প্রভৃতি গৃহস্থ-ভক্তদিগকে তাহাদের যাহা যাহা প্রার্থনা ছিল তাহা তিনি আশ্বাস দিয়া 'পূর্ণ হবে' বলিয়া কৃপা করিলেন। ভক্ত গিরিশচন্দ্র, দত্ত রামচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসকলকে ডাকিয়া বলিলেন: 'তোরা কে কোথায় আছিস্ আয়, আজ শ্রীশ্রীঠাকুর কল্পতরু হয়েছেন এবং সকলকে বর দিচ্ছেন'। কিন্তু যুবক-সেবকগণ সেই সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের কার্যে ব্যস্ত ছিল, সেইজন্য তাহারা নীচে বাগানপথে উপস্থিত ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার পর রামলাল-দাদাকে বলিলেন: 'শালাদের (সকল ভক্তদের) পাপ নিয়ে আমার অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। গঙ্গাজল নিয়ে আয়, গায়ে মাখি।' রামলালদাদা গঙ্গাজল আনিলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা গ্রহণ করিয়া সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া দিলে তবে জ্বালার নিবারণ হইল।

এই ঘটনার পর আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের গলার বেদনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন চিকিৎসকেরা গুগ্‌লির ঝোল খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীমা জীবন্ত গুগ্‌লির ঝোল রাঁধিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে বলিলেনঃ 'আমি খাব, আমার জন্য রাঁধবে, তাতে কোন দোষ হবে না। ছেলেরা পুকুর থেকে গুগ্‌লি এনে তৈরী করে দেবে, তুমি রান্না করবে।'

তাহাই হইল। সেইদিন হইতে আমি নিকটের ছোট পুষ্করিণীর ঘাটের পার্শ্ব হইতে গুগ্‌লি সংগ্রহ করিতাম এবং খোলা ভাঙ্গিয়া প্রস্তুত করিয়া শ্রীমাকে দিতাম, শ্রীমা তাহা সিদ্ধ করিয়া ঝোল তৈয়ারী করিতেন এবং ভাতের মণ্ডের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাওয়াইতেন। তখন তিনি তরল খাদ্য ভিন্ন অন্য কিছু গলাধঃকরণ করিতে পারিতেন না। রাত্রে একটু সুজী অথবা ভারমিশেলি (vermicelli) সিদ্ধদুগ্ধের সহিত আহার করিতেন। এইরূপে কিছুদিন কাটিতে লাগিল। করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু পূর্বের ন্যায়ই সমাগত সেবক ও ভক্তগণকে দিবারাত্র উপদেশ দান করিয়া ঈশ্বরীয় ভাবে উদ্দীপিত করিয়া দিতেন।

॥ কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথ ॥

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। নরেন্দ্রনাথ এই বৎসর আইন পরীক্ষায় বি. এল. দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সেইজন্য কলিকাতায় বাস করিয়া সে অধ্যয়ন করিত এবং মধ্যে মধ্যে কাশীপুরে আসিত। এইদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুখ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে সেবা-শুশ্রূষা করিবার ইচ্ছাও তাহার বলবতী হইতে লাগিল। তখন নরেন্দ্রনাথ স্থির করিল, আইন-সংক্রান্ত পুস্তকগুলি কাশীপুরে বাগানে আনিয়া সময়মত পাঠ করিবে ও শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষা করিবে। আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সংকল্প তাহার মনে দৃঢ়ই রহিয়াছে। কয়েকদিন এমন হইয়াছে যে, আইন-সংক্রান্ত পুস্তকপাঠে ব্যস্ত থাকার জন্য নরেন্দ্রনাথ উপরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে যাইতে

পারে নাই। তাহারই মধ্যে একদিন সন্ধ্যার সময়ে উপরে নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে গিয়াছে। প্রণাম করিয়া বসিলে শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন : 'কিরে, তুই আর আমার কাছে আসিস্ নি কেন?' নরেন্দ্রনাথ বলিলেন : 'মশাই, আইন-পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, পুস্তকপাঠে ব্যস্ত থাকি, তার জন্য উপরে আসার সময় পাই না।' ইহা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন : 'দ্যাখ্, তুই যদি উকিল হস্ তাহলে তোর হাতের জল আর আমি খেতে পারব না।' এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ অতিশয় চিন্তিত হইল। আমিও সেই সময়ে উপস্থিত ছিলাম। দেখিলাম নরেন্দ্রনাথ স্তব্ধ হইয়া গভীরভাবে কি চিন্তা করিতেছে। তাহার পর নরেন্দ্রনাথের মনে প্রশ্ন উঠিল : 'আমি এমন কাজ কেন করিব যাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর আমার হাতের জল খাইতে পারিবেন না! তাহা কখনই হইতে পারে না।' সে ভাবিতে ভাবিতে গম্ভীরভাবে নীচে হলের পার্শ্বের ছোট ঘরে যাইয়া আইন-সংক্রান্ত পুস্তকগুলি বন্ধ করিয়া আমাদের বলিল : 'আমার আইন-পরীক্ষা দেওয়া বোধহয় আর হোল না।' আমরা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম। হইলও তাহাই। নরেন্দ্রনাথের মন হইতে আইন-পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা ধীরে ধীরে একেবারে দূর হইয়া গেল। সে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষাব পর জপ, ধ্যান, সাধনাদিতে ডুবিয়া থাকিতে চেষ্টা করিল। দ্বাদশজন সেবক শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাকার্য পালাক্রমে দিবারাত্র সম্পাদন করিতে লাগিল এবং অবসর পাইলেই পরস্পরে শাস্ত্রচর্চা, জপ, ধ্যান, জ্ঞানবিচার, সংকীর্তনাদি করিয়া মহানন্দে দিনযাপন করিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থার উন্নতি হইতেছে না দেখিয়া একদিন রাত্রে নরেন্দ্রনাথ মহাচিন্তিত হইল। সে আমাদের (শরৎ, নিরঞ্জন প্রভৃতিও ছিল) লইয়া বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিল : 'শ্রীশ্রীঠাকুরের যেরূপ কঠিন ব্যাধি, তা দেখে কিছু বুঝতে পারা যায় না যে, তাঁর কি ইচ্ছা। হয়তো তিনি দেহরক্ষা করার সংকল্প করেছেন। এখন আমরা

প্রাণ ঢেলে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করি এসো এবং সঙ্গে সঙ্গে জপ, ধ্যান, সাধন-ভজন প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাক্‌ব।' কিছুক্ষণ পদচারণা করিয়া নরেন্দ্রনাথ আমাদের সকলকে লইয়া বাগানের একটি গাছতলায় উপবিষ্ট হইল। পৌষ মাসের রাত্রি, বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে, সকলেই অত্যন্ত শীত অনুভব করিতে লাগিলাম। আমাদের সম্মুখে শুষ্ক ডালপালার স্তূপ রহিয়াছে দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া বলিল: 'সাধুরা শীতনিবারণের জন্য ধুনি জ্বালায়। আমরাও আজ ধুনি জ্বালিয়ে এখানে বসে ধ্যান করি এসো।' সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে শুষ্ক ডালপালা চারিদিক হইতে সংগ্রহ করিয়া সকলে "অগ্নয়ে স্বাহা" বলিয়া আহুতি প্রদান করিতে লাগিলাম এবং মনে মনে চিন্তা করিলাম, অন্তরের বাসনাসমূহকে ব্রহ্মাগ্নিতে হোম করিতেছি। এইরূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া সকলে ধ্যানস্থ হইয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে রাত্রি শেষ হইয়া গেল।

সেই অবধি প্রত্যেক রাত্রিতে আমরা আপন আপন পালা বা কর্তব্য শেষ করিয়া পূর্বের ন্যায় আগুন জ্বালাইয়া ধুনির পার্শ্বে বসিয়া ধ্যান, বেদান্তবিচার, গীতাপাঠ ও শাস্ত্রালাপ করিতাম। তাহার পর শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর ও নির্বাণাষ্টকের স্তোত্রগুলি আবৃত্তি ও তাহাদের অর্থের ধ্যান করিতাম। সেই সময় হইতেই আমি ও শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সমস্ত আদেশ পালন করিতাম এবং ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। নরেন্দ্রনাথ আমার ও শরতের নাম দিয়াছিল 'কেলুয়া' ও 'ভুলুয়া'। তখন কখনও অষ্টাবক্রসংহিতা, বা যোগবাশিষ্ঠ পাঠ করা হইত, কখনও ভাগবতের 'গোপীগীতা' আবৃত্তি করা হইত। নরেন্দ্রনাথ সুমধুর কণ্ঠে রামপ্রসাদী গান, ব্রহ্মসঙ্গীত এবং শ্রীশ্রীঠাকুর যে সমস্ত গান গাহিতেন সেই সমস্ত গাহিয়া আমাদের সকলকে মাতাইয়া রাখিত। আবার কখনও বা আমরা 'জয় রাধে' বলিয়া সংকীর্তনে মাতিয়া নৃত্য করিতাম।

॥ নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ॥

নরেন্দ্রনাথ আমার অপেক্ষা প্রায় চারি বৎসরের বড় ছিল। আমি নরেন্দ্রনাথকে সেই অবধি আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় দেখিতাম ও ভালবাসিতাম। নরেন্দ্রনাথও আমায় আপনার সহোদরতুল্য ভালবাসিত। তাহা ছাড়া আমি যে তাহাকে শুধু ভালবাসিতাম তাহা নহে, তাহার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া সকল কাজই করিতাম। বলিতে গেলে আমি ছায়ার মতো সর্বদা নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম ও নরেন্দ্রনাথ যাহা করিত আমিও নির্বিবাদে তাহা করিতাম। তাহা ছাড়া নরেন্দ্রনাথ যাহা করিতে বলিত অকুণ্ঠিত হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তাহা করিতাম।

নরেন্দ্রনাথ ও আমি জ্ঞানমার্গের 'নেতি নেতি' বিচার করিতাম এবং অদ্বৈতবেদান্তমতের একান্ত পক্ষপাতী ছিলাম। নরেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য দর্শন, ন্যায়, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিল। ঐ সকল বিষয়ে তাহার সহিত আলোচনা করিতে করিতে আমার জ্ঞানপিপাসা দিন দিন আরও বর্ধিত হইতে লাগিল। তাহা ছাড়া সকল বিষয়ে নরেন্দ্রনাথকে আমি এত অধিক অনুকরণ করিতাম যে, যখন নরেন্দ্রনাথ ধ্যান করিতে বসিত, তখন আমিও ধ্যান করিতাম। নরেন্দ্রনাথ যেমনটি ভাবে ও সুরে মোহমুদ্গর, কৌপীনপঞ্চক, বিবেকচূড়ামণি ও অষ্টাবক্রসংহিতা প্রভৃতি আবৃত্তি করিত আমিও তদনুরূপ করিতাম। আমাদের দুইজনের মধ্যে ছিল এক নিবিড় সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্ক চিরদিন অটুট ছিল!

॥ আমাদের কুসংস্কারভঙ্গ ॥

আত্মজ্ঞান লাভ করা-সম্বন্ধে বিচার করিতে করিতে একদিন নরেন্দ্রনাথ হিন্দুদিগের আহারাদি সম্বন্ধে সে সকল কুসংস্কার (prejudice) আছে তাহার বিরুদ্ধে জোর করিয়া আমাদিগকে বলিতেলাগিল। শরৎ, যোগেন, তারকদাদা ও আমি এই বিষয় লইয়া তাহার

সহিত বিচার করিতে লাগিলাম। নরেন্দ্রনাথ বলিল, 'ব্রহ্মজ্ঞান হলে সকলের হাতে খাওয়া চলে ; তখন কেউ কাকেও ঘৃণা করে না। যতদিন কুসংস্কার থাকবে ততদিন ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।' আমরা কেহই মুসলমানের হাতের রান্নাকরা খাদ্য পূর্বে কখনও খাই নাই। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদিগের ন্যায় জাতিবিচার মানিত না। তাহার মত ছিল উদার, তাই সে সকলের হাতের রান্না খাদ্য খাইয়াছে। সেইদিন নরেন্দ্রনাথ আমাদের বলিল : 'চলো, আজ তোমাদের কুসংস্কার ভেঙ্গে আসি।' আমি তৎক্ষণাৎ নরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে রাজী হইলাম এবং শরৎ ও নিরঞ্জন আমার কথায় সায় দিল। সন্ধ্যার সময়ে কাশীপুর বাগান হইতে পদব্রজে নরেন্দ্রনাথ আমাদের লইয়া বিডন ষ্ট্রীটে (বর্তমানে যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার হইয়াছে) পীরুর রেস্টুরেণ্টে উপস্থিত হইল। নরেন্দ্রনাথ ফাউলকারীর অর্ডার দিল এবং আমরা সকলে বেঞ্চিতে নীরবে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ফাউলকারী আসিলে আমরা সকলে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কুসংস্কার ভাঙ্গিতেছি ও ঘৃণা দূর করিতেছি এই ধারণা হৃদয়ে রাখিয়া তাহার অল্পমাত্র গ্রহণ করিলাম। নরেন্দ্রনাথ মহানন্দে প্রায় সমস্তটাই আহার করিল। আমরা একটুতেই সন্তুষ্ট। নরেন্দ্রনাথের কাণ্ডকারখানা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম এবং তাহার খাওয়া শেষ হইলে সকলে মহানন্দে পুনরায় কাশীপুরের বাগানে ফিরিয়া আসিলাম।

তখন রাত্রি প্রায় দশটা। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আমি শশব্যস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর বহুক্ষণ আমাদের কাহাকেও কাশীপুরের বাগানে দেখিতে না পাইয়া উদ্বিগ্ন ছিলেন দেখিলাম। আমাকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন : 'কিরে, কোথায় সব গিয়েছিলি ?'

আমি বলিলাম : 'কলকাতায় বিডন ষ্ট্রীটে পীরুর দোকানে।'

—'কে কে গিছ্‌লি ?'

আমি সকলের নাম করিলাম। তিনি সহাস্যে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন: 'সেখানে কি খেলি?'

আমি বলিলাম: 'মু—র ডালনা।'

তিনি বলিলেন: 'ক্যামন লাগলো তোদের?'

আমি: 'আমার ও শরৎ প্রভৃতির খুব ভাল লাগেনি। তাই একটুখানি মুখে দিয়ে কুসংস্কার ভাঙলাম।'

শ্রীশ্রীঠাকুর উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন: 'বেশ করেছিস্। ভাল হোল, তোদের সব কুসংস্কার দূর হয়ে গেল।'

আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের অভয়বাণী শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম।

॥ কাশীপুরের বাগানে মাছধরা ॥

কাশীপুরের বাগানে দুইটি পুষ্করিণী ছিল। দুইটিতেই বহু মৎস্য ছিল। একদিন নরেন্দ্রনাথ আমাদের একটি পুকুর দেখাইয়া বলিল: 'এসো, এই পুকুরে ছিপ দিয়ে মাছ ধরি।' আমি তাহার কথা শুনিয়া প্রস্তুত হইলাম, কারণ পূর্বে বাড়ীতে থাকিতে আমি মাছ ধরিতে শিখিয়াছিলাম। নিরঞ্জনও আমাদের সঙ্গে ছিল। আমরা তিনজনে ছিপ লইয়া পুকুরে মাছ ধরিতে চলিলাম। নরেন্দ্রনাথ ও নিরঞ্জনের পূর্ব হইতে মাছ ধরার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না, সুতরাং যে সময়ের মধ্যে তাহারা একটি মাছ ধরিতেছিল সেই সময়ে আমি চার পাঁচটি মাছ ধরিয়া ফেলিলাম। আমার মাছ ধরার দক্ষতার কথা ক্রমশঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের কর্ণগোচর হইল। একদিন সন্ধ্যার পর যখন আমি তাঁহার সেবা করিতে গিয়াছি তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'কিরে, তুই নাকি পুকুরে ছিপ ফেলে খুব মাছ ধরিস্?'

আমি বলিলাম: 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

শ্রীশ্রীঠাকুর: 'ছিপ দিয়ে মাছ ধরা পাপ, কেননা তাতে জীবহত্যা করা হয়।'

আমি বলিলাম: 'কেন গীতায় তো আছে—

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥

'যে ব্যক্তি আত্মাকে হন্তা বলিয়া জানে, অথবা যে ব্যক্তি ইহাকে হত বলিয়া জানে তাহারা উভয়েই আত্মা যে হন্তা নহে এবং কোনদিন হতও হইতে পারে না ইহা বুঝিতে পারে না। সুতরাং আত্মা যখন অমর তখন মাছ ধরলে পাপ কি।'

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু হাসিয়া আমাকে নানাপ্রকার যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে প্রয়াস পাইলেন। তিনি বলিলেন: 'ঠিক ঠিক জ্ঞান হলে বেতালে পা পড়ে না।' তখন হঠাৎ তাঁহার কাসির উপক্রম হইল। কফের সঙ্গে একটু রক্তও বাহির হইল। আমি ভীত হইয়া বলিলাম: 'অধিকক্ষণ কথা বল্লে আপনার গলার অসুখ বেড়ে যাবে। সুতরাং আপনি আর কথা কহিবেন না।' তাহাতে অহেতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন: 'আমি তোকে ছেলেদের মধ্যে বুদ্ধিমান ব'লে জানি। আমি যা বল্লাম তুই তা ধ্যান কর, বুঝতে পার্‌বি।'

তাহার পর তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমি তাঁহার উপদেশমতো দিবারাত্র ধ্যান করিতে লাগিলাম। ক্রমাগত তিনদিন ধ্যান করিবার পর আমি তাঁহার উপদেশের সত্যতা উপলব্ধি করিলাম ও তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলাম: 'আমি এখন বুঝেছি যে, মাছ-ধরা কেন অন্যায়। এ' ধরনের কাজ আমি আর করবো না, আমায় ক্ষমা করুন।' শ্রীশ্রীঠাকুর আমার কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন: 'মাছ ধরায় বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। খাবারের লোভ দেখিয়ে বড়শি লুকিয়ে রাখা আর অতিথি বা বন্ধুকে নিমন্ত্রণ ক'রে তার মধ্যে বিষ লুকিয়ে রাখা একই পাপ।' আমি অবনত মস্তকে তাঁহার কথা স্বীকার করিলাম ও তাঁহার অসীম করুণা বুঝিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলাম। তিনি আমার ভাব দেখিয়া আরও বলিলেন: 'আত্মা মরে না বা অপরকে মারেও না, আর এ জ্ঞান যার হয়েছে সে আত্মস্বরূপ। সুতরাং তার অপরকে হত্যা

করতে প্রবৃত্তিই হবে কেন? যতক্ষণ হত্যার প্রবৃত্তি থাকে, ততক্ষণ সে আত্মস্বরূপ হয় নাই এবং তার আত্মজ্ঞানও হয় নাই। তাই বল্‌ছি যে, ঠিক ঠিক জ্ঞান হ'লে মানুষের আর বেতালে পা পড়ে না। জানবি, আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির পারে—সাক্ষীস্বরূপ।' আমি তাঁহার সকল কথা মাথা পাতিয়া লইলাম। আমি সেই বিষয়ে আরও ধ্যান করিতে করিতে আত্মার যথার্থ স্বরূপ 'সাক্ষীশ্চেতা··· নির্গুণশ্চ' এই তত্ত্ব সেইদিন তাঁহার কৃপায় উপলব্ধি করিলাম এবং তাঁহার নিকটে গিয়া এই বিষয় বর্ণনা করিলাম। তিনি বলিলেন: 'এর নামই আত্মজ্ঞান।'

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

॥ ভাবীজীবনের পূর্বাভাস ॥

কাশীপুরের বাগানে অবস্থানকালে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য ন্যায় ও দর্শন প্রভৃতি পড়িবার বাসনা আমার অন্তরে বলবতী হইল। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'সায়েন্স এসোসিয়েশন-'এ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বক্তৃতা শুনিতে যান জানিতে পারিয়া আমিও কাশীপুর হইতে পদব্রজে বৌবাজারে তথায় কয়েকবার গিয়াছিলাম। ক্রমে বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি পড়ার ইচ্ছা আমার পূর্ণ হইয়াছিল। আমি পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পাঠে মনোনিবেশ করিলাম। ক্রমে গ্যানোর পদার্থবিজ্ঞান (Physics), হার্সেলের জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy), জন ষ্টুয়ার্ট মিলের তর্কশাস্ত্র (Logic) ও ধর্মের বক্তৃতাবলী (Three Essays on Religion), লুইসের দর্শনের ইতিহাস (History of Philosophy), হ্যামিল্টনের দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ আয়ত্ত করিলাম। কখনো কখনো রাত্রিতে পরমহংসদেবের সেবা করিতে করিতে ইংরাজ-দার্শনিক মিলের তর্কশাস্ত্র পড়িতাম। একদিন সেই তর্কশাস্ত্র পড়িবার সময়ে পরমহংসদেব আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন: 'কিরে, কি বই পড়ছিস?'

আমি উত্তর করিলাম: 'ইংরাজী ন্যায়শাস্ত্র।'

পরমহংসদেব বলিলেন: 'ওতে কি শেখায়?'

আমি বলিলাম: 'এতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণসম্বন্ধে তর্ক, যুক্তি ও বিচার শেখায়।'

পরমহংসদেব বলিলেন: 'তুই তো দেখছি এখানে ছেলেদের মধ্যে বই পড়া ঢোকালি। তবে কি জানিস, বই পড়া বিদ্যা কিছু নয়। আপনাকে মারতে গেলে একটা নরুণ দিয়ে মারা যায়, কিন্তু

অপরকে মারতে গেলে ঢাল তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের দরকার হয়। বই পড়া তারই জন্য। যারা লোকশিক্ষা দেবে তাদের পড়ার দরকার আছে।'

এই বলিয়া তিনি নীরব থাকিলেন, কিন্তু আমাকে বই পড়িতে নিষেধ করিলেন না। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, তিনি আমাকে সর্বশাস্ত্রবিশারদ করিয়া ভবিষ্যতে প্রচারকার্যে নিযুক্ত করিবেন এবং সেইজন্য আমাকে বই পড়িতে নিষেধ করেন নাই। তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাবে আমি সকলেরই প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলাম। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মাঝে মাঝে তুমুল তর্কও করিতাম। আমার বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া একদিন পরমহংসদেব আমায় ডাকিয়া বলিলেন: 'ছেলেদের মধ্যে তুইও বুদ্ধিমান। নরেনের নীচেই তোর বুদ্ধি। নরেন যেমন একটা মত চালাতে পারে, তুইও সে রকম পারবি।'

॥ আমার নাস্তিকতা ॥

পরমহংসদেবের আশ্বাস ও আশীর্বাদ পাইয়া আমার মন তখন উৎসাহে ও শক্তিতে ভরিয়া উঠিত। ভাবিতাম—পরমহংসদেবের কি অসীম ভালবাসা ও করুণা! আমি যখন অদ্বৈতবেদান্তের মতে 'নেতি নেতি' বিচার ও অষ্টাবক্রসংহিতা পাঠ করিতেছিলাম তখন আমার সঙ্গে যে কেহ বিচার করিতে আসিত, আমি তাহাদিগের সকল মত শুনিতাম ও খণ্ডন করিয়া দিতাম। ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কত যুক্তি-তর্কই না কত লোকের নিকটে শুনিতাম, কিন্তু সমস্তই ন্যায়বিচার দ্বারা খণ্ডন করিয়া দিতাম। অন্ধবিশ্বাসের প্রসঙ্গ উঠিলে আমি যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া তাহাও খণ্ডন করিয়া দিতাম। আমার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বুড়ো গোপালদাদা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) পরমহংসদেবের নিকট যাইয়া বলিলেন: 'মহাশয়, কালী কিছুই মানে না, একেবারে নাস্তিক হয়ে গেছে।'

পরমহংসদেব শুনিয়া হাসিতেন। একদিন একটি ঘটনা ঘটিল।

আমি পরমহংসদেবের সেবা করিতে গিয়াছি, তখন ঘরে অপর আর কেহ ছিল না। তিনি আমাকে একাকী পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: 'হ্যাঁরে, তুই নাকি নাস্তিক হয়ে গেছিস্?' আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন: 'তুই ঈশ্বর মানিস্? তুই শাস্ত্র মানিস্? তুই লোকাচার মানিস্?' আমি তাঁহার সকল প্রশ্নের উত্তরে কেবল 'না' বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন: 'অপর কোন সাধুর কাছে এ'রকম বল্লে সে তোর গালে চড় মারতো।' আমি বলিলাম: 'আপনিও মারুন। যতক্ষণ না ঈশ্বর আছেন এবং বেদ সত্য এ কথা ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি ততক্ষণ আমি অন্ধবিশ্বাস করে ঐ সকল মানব কি ক'রে? আমাকে বুঝিয়ে দিন ও আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিন, তখন আমি সব মানব।' পরমহংসদেব আমার উত্তর শুনিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া বলিলেন: 'একদিন তুই সব জানবি ও সব মানবি। এই ছাখ্, নরেন আগে কিছুই মানত না, কিন্তু এখন 'রাধে রাধে' বলে কাঁদে ও কীর্তনে নৃত্য করে। এর পর তুইও সব মানবি।' আমি বলিলাম: 'আমাকে জানিয়ে দিন, আমি জানতে পারলেই সব মানবো, নতুবা মানবো না।' দেখিলাম করুণাময় পরমহংসদেব আমার সরলতা ও আন্তরিকতা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। তিনি প্রসন্নচিত্তে বলিলেন: 'সময়ে তুই সব বুঝতে পারবি ও সব মানবি। কিন্তু তুই কখনও একঘেয়ে হস্নি। আমি একঘেয়ে ভাব ভালবাসিনে।' আমি অবনতমস্তকে তাঁহার সকল কথা মানিয়া লইলাম। সত্যই বলিতেছি, ইহার কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আমার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিলেন। তখন আমি সাধনরহস্যের সকল কথাই জানিতে পারিলাম ও সকল জিনিস তখন মানিতে লাগিলাম। আর শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপার কথা ভাবিলে আজিও আমার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে!

॥ আমার দিব্যজ্ঞানলাভ ॥

একদিনের কথা। আমি পরমহংসদেবের নিকট যাইয়া কাতর হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমার ব্যাকুলতা দর্শনে প্রীত হইয়া বলিলেন: 'তোর ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান হবে।' পরমহংসদেবের বাক্য অচিরে সফল হইল। একদিন ধ্যানযোগে সত্যই নির্বিকল্প-সমাধির অবস্থায় উপনীত হইয়া আমি পরমতত্ত্বসমূহ উপলব্ধি করিলাম ও পরমহংসদেবের নিকট গিয়া তাহার বিষয় যথাযথ বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন: 'এই ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান।' আমার সকল সংশয় তখন দূর হইয়া গেল ও ঈশ্বরের চিন্ময় সত্তার সম্যক্-উপলব্ধি করিয়া আমার নাস্তিকতার অজ্ঞানাবরণ চিরদিনের জন্য অপসারিত হইয়া গেল।

॥ নানান কথা ॥

একদিনের কথা আমার মনে হইতেছে! আমি একাকী বসিয়া পরমহংসদেবকে পাখার বাতাস করিতেছি। হঠাৎ বালকের মতো হাসিতে হাসিতে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'ছোক্‌রাদের মধ্যে কেউ কেউ নরেনকে আমার চেয়েও বড় মনে করে। তোকে আমি বুদ্ধিমান বলে জানি, তুই কি বলিস?'

আমি নির্ভয়ে বলিলাম: 'যে নরেনকে আপনার চেয়ে বড় মনে করে সে কিছুই জানে না। সে আপনাকে চিনতেই পারেনি।'

তিনি বলিলেন: 'কেন?'

আমি বলিলাম: 'নরেন আপনার হাতের তৈরী। আপনার শক্তিতেই সে যা-কিছু শিখেছে। আপনিই তার ইষ্টদেবতা। সে যদি আপনার চেয়ে বড়ই হয় তবে আপনার পায়ে মাথা দিয়ে সে জ্ঞানভিক্ষাই বা করবে কেন? সে যা জেনেছে সে তো আপনার কৃপাতেই। তাই নরেন আপনার চেয়ে বড় বা আপনার তুল্য কিছুতেই হতে পারে না।'

পরমহংসদেব আমার উত্তর শুনিয়া ঈষৎ হাসিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন : 'তোর খুব বুদ্ধি, তুই ঠিকই বলেছিস।' সেইদিন প্রত্যক্ষ করিলাম তাঁহার বালকের মতো সরলতা।

আর একদিনের ঘটনার কথা বলি। আমি কাশীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত আছি। তিনি আমাকে বলিলেন : 'তোর বাবা আজ এসে বললো যে, তোর মা কেঁদে কেঁদে অস্থির হচ্ছে। আপনি কালীকে একবার তার মার সঙ্গে দেখা করার জন্য বাড়ীতে যেতে বলুন। আমি তোর বাবাকে বললাম, আচ্ছা, আমি তোমার ছেলেকে বলে দেব। তাই তোকে আমি বলছি যে, তুই একবার বাড়ী গিয়ে তোর মার সঙ্গে দেখা ক'রে আয়।' আমি অবনতমস্তকে বলিলাম : 'যে আজ্ঞা।' তাহার পর পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া সন্ধ্যার সময়ে পদব্রজে আমি আহিরীটোলার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। পিতা এবং মাতা আমাকে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। মা সাশ্রুনয়নে আহারাদি করিয়া রাত্রিতে থাকিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অর্ধঘণ্টাকালও সেখানে থাকিতে আমার প্রাণে অশান্তি হইতে লাগিল। অনুভব করিতে লাগিলাম, আমি যেন নরককুণ্ডে পড়িয়াছি। প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, আর ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল কাশীপুরে পরমহংসদেবের কথা। দৌড়াইয়া পলাইয়া যাইবার জন্য প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই ভাব থামাইবার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সক্ষম হইলাম না। তাড়াতাড়ি মিষ্টিমুখ করিয়া পিতামাতার নিকট বিদায় লইয়া দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইলাম এবং একনিঃশ্বাসে কাশীপুরে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে দেখিয়া যেন অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : 'কিরে, তুই বাড়ী যাস্‌নি ?'

আমি বলিলাম : 'আজ্ঞে হ্যাঁ, গিছলাম।'

তিনি বলিলেন : 'বাড়ীতে থাকার জন্য তোর বাবা মা নিশ্চয়ই বলেছিল। তুই থাক্‌লিনি কেন ?'

আমি : 'ছিলুম তো।'

শ্রীশ্রীঠাকুর : 'কতক্ষণ ছিলি ?'

আমি : 'আধ ঘণ্টা মাত্র।'

শ্রীশ্রীঠাকুর : 'তবে তুই ফিরে এলি কেন ?'

আমি : 'আজ রাত্রে বাড়ীতে থাকব মনে করে গিছলাম। বাবা-মাও থাকার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কিন্তু আমি সেখানে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলাম। আপনার কাছে ফিরে আসার জন্য মন ছট্‌ফট্ করতে লাগল। সেখানে আমার মনে হচ্ছিল যেন নরকে এসে পড়েছি। তাই একটু মিষ্টি মুখে দিয়েই বিদায় নিয়ে দৌড়ে এখানে চলে এলুম। এখানে পৌঁছে তবে মনে শান্তি পেলুম।'

শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া আমাকে আদর করিয়া বলিলেন : 'বেশ করেছিস। এখানে শান্তি পাবি বৈকি !'

সত্য বলিতে কি, শ্রীশ্রীঠাকুরের শান্তিময় পরিবেশে থাকিলে মনে শান্তি ও আনন্দ অনুভব করিতাম। তাঁহার অপূর্ব ভালবাসার তুলনায় পিতামাতার স্নেহ অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হইত। শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন বৈকালে শুইয়া আছেন, নীচে মাঠে ঘাসের উপর একজন পদচারণা করিতেছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর আমায় বলিলেন : 'ছাখ্, ওকে ঘাসের ওপর দিয়ে চলতে বারণ কর্। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। ও যেন আমার বুকের উপর দিয়ে চলে বেড়াচ্ছে।' আমি শুনিয়া এবং তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। আমি তাড়াতাড়ি গিয়া লোকটিকে নিষেধ করিলে তিনি সুস্থবোধ করিলেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয় কোথায়ও পাওয়া যায় না। যীশুখ্রীষ্ট সকল মানবের ভিতর প্রেম শিখাইয়াছিলেন, বুদ্ধদেব সকল প্রাণীর ভিতর আত্মবুদ্ধি করিয়া ভাল-বাসিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত বৃক্ষতৃণ প্রভৃতিতে আত্মস্বরূপ বলিয়া অনুভূতি করিতেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

॥ কাশীপুরের বাগানে পাগলিনী ॥

কাশীপুরের বাগানে এক পাগলিনী শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিবার জন্য আসিত। তাহার গলার সুর অতিশয় মধুর ছিল। পাগলিনী গান গাহিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব হইত। পাগলিনীর একটি গান :

একবার এস মা এস মা,
ও হৃদয়-রমা, পরাণ-পুতলি গো।
আছি জন্মাবধি তোর মুখ চেয়ে,
জান গো জননী যে যাতনা সয়ে,
আমার, হৃদয়-কমল বিকাশ করিয়ে,
প্রকাশ তাহে আনন্দময়ী গো ॥

এই গানটি পাগলিনী যখন গাহিত তখন সকলকে ব্যাকুল করিত। শ্রীশ্রীঠাকুরও ভাবে বিভোর হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন।

পাগলিনী কিন্তু কাহারও কথা মানিত না। অবসর পাইলেই সে উপরে উঠিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিত। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে ঘরে আসিতে নিষেধ করিতেন, কারণ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি তাহার মধুর ভাব ছিল। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর বিরক্ত হইয়া আমাদের বলিলেন : 'ঐ পাগ্‌লীকে বাগান থেকে বার করে দে। ওকে এখানে থাকতে দিস্ নি। ও ঘরে এলে আমার ভয় হয়।' কিন্তু পাগলিনী কিছুতেই বাগানের বাহিরে যাইত না। যতবার তাহাকে আমরা তাড়াইয়া দিতাম, ততবারই সে ফিরিয়া আসিত। বাগানের ফটক বন্ধ করিয়া দিলে রাস্তায় বসিয়া থাকিত এবং কেহ ফটক খুলিলেই সে বাগানের ভিতর আসিত এবং উপরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিত। নিরঞ্জন লাঠি লইয়া তাহাকে তাড়া করিলেও সে তাহা মানিত না। আমি পাগলিনীর কাণ্ডকারখানা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট

নিবেদন করিলাম। তিনি বলিলেন: 'যা, ওকে পুলিশ ডেকে থানায় রেখে আয়।' তাহার পর আমি ও নিরঞ্জন পাগলিনীর হাত ধরিয়া টানিয়া কাশীপুরের থানায় লইয়া গেলাম। কনেষ্টবল পাগলিনীকে ধমকাইয়া তাড়াইয়া দিল। ছাড়া পাইয়া কিছুক্ষণ পরে পাগলিনী আবার বাগানে আসিয়া গান গাহিতে লাগিল:

মা মা বলে আর ডাকিব না,
তারা, দিয়াছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আরও কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী,
না হয় দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা মেঙ্গে খাব,
মা বলে তো আর কোলে যাব না॥

শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার সুমধুর কণ্ঠে এই গান শুনিয়া সমাধিস্থ হইলেন। তখন ভক্তগণের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। অগত্যা নিরঞ্জন সেই পাগলিনীকে একটি ঘরে কিছুক্ষণ বন্ধ করিয়া রাখিল। তাহার পর দরজা খুলিয়া দিতেই সে আবার উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন নিরঞ্জন কাঁচি আনিয়া লম্বা চুল খানিকটা কাটিয়া দিল। সেই অবধি পাগলিনী চলিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসে নাই। এই পাগলিনীকে দেখিয়া ও তাহার গান শুনিয়াই গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার 'বিল্বমঙ্গল'-নাটকে এক পাগলিনীর চরিত্র প্রতিফলিত করিয়াছিলেন।

॥ কাশীপুরের বাগানে শশধর তর্কচূড়ামণি ॥

শশধর তর্কচূড়ামণি শ্রীশ্রীঠাকুরকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। বলরামবাবুর বাড়ীতে আমি একদিন দেখিয়াছি, তর্কচূড়ামণি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিয়া তাঁহার পায়ে হাত দিয়া কাঁদিতেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। তর্কচূড়ামণি শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া অশ্রুধারায় বক্ষ প্লাবিত করিতে লাগিলেন।

আর একদিনের কথা। শশধর তর্কচূড়ামণি কাশীপুরের বাগানে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের গলার অসুখ তখন অত্যন্ত বাড়িয়াছে। তর্কচূড়ামণি বলিলেন: 'আপনি যদি শরীরের দিকে একটু মন দেন তাহলে আপনার গলার অসুখ নিশ্চয়ই সেরে যাবে।'

শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তরে বলিলেন: 'যে মন একবার ভগবানকে দিয়েছি, তা এই রক্ত-মাংসের শরীরের দিকে আবার ক্যামন ক'রে দিতে পারি বলুন।' তর্কচূড়ামণি বলিলেন: 'তবে মার (জগন্মাতার) সঙ্গে যখন কথা কইবেন তখন তাঁকে আপনার গলার ঘায়ের যাতে উপশম হয় সে কথা বলবেন।'

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন: 'আমি যখন জগতের মাকে দর্শন করি তখন আমার শরীর ও জগৎ সবই ভুল হ'য়ে যায়। সুতরাং তুচ্ছ হাড়-মাংসের শরীরের কথা আর মাকে ক্যামন ক'রে বলি।'

তর্কচূড়ামণি মহাশয় শুনিয়া অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। আমরাও সকলে নিস্তব্ধ, কাহারও মুখে কোন কথাটি নাই। আমার কাজ সর্বদাই বেশ গোছানো ও পরিষ্কার ছিল। তাহা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়ই আমার কার্যের প্রশংসা করিতেন। কিন্তু আমি মনে করিতাম যে, কৃপা করিয়া তাঁহার কার্য তিনিই করাইয়া লইতেছেন।

॥ মুরুব্বি গোপালদাদার পরিচয় ॥

মুরুব্বি বৃদ্ধ গোপালচন্দ্র সুর (আমাদের দাদা) বরাহনগরের নিকটে সিঁথিতে থাকিতেন। স্ত্রী-পুত্রের বিয়োগের পর পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তাঁহার সংসারে বৈরাগ্য আসে। সিঁথির মহেন্দ্র কবিরাজ তাঁহাকে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে লইয়া আসেন। তাহার পর মাঝে মাঝে তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে আসিতেন। তিনি বাঁয়া-তবলা বাজাইতে জানিতেন। নরেন্দ্রনাথ যখন তানপুরা লইয়া দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে গান করিতেন তখন তিনি তবলায় ঠেকাও দিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরও গোপালদাদাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং প্রবীণ বিচক্ষণ বলিয়া তাঁহাকে আদর করিতেন। আবার শ্রীশ্রীঠাকুর যখন অসুস্থ হইয়া কাশীপুরের বাগানে ছিলেন, তখন গোপালদাদা আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

॥ গৈরিক বস্ত্র দান ॥

পৌষ-সংক্রান্তি আগতপ্রায়। গঙ্গাসাগরের মেলা হইবে। সেইজন্য কলিকাতা জগন্নাথঘাটে বহু সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়াছে। গোপালদাদা স্বেচ্ছায় সাধুদিগকে শীতবস্ত্র দান করিবার জন্য বারোখানি কাপড় কিনিয়া আনিয়াছিলেন এবং গেরিমাটি দিয়া ঐ কাপড়গুলি রঙ করিতেছিলেন। বারটি মালাও সাধুদিগকে দান করিবার জন্য তিনি কিনিয়া আনিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই সংবাদ পাইয়া মুরুব্বি গোপালদাদাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গোপালদাদা আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'গেরুয়া কাপড় কিসের জন্য করা হচ্ছে?' গোপালদাদা বলিলেন: 'জগন্নাথের ঘাটে গঙ্গাসাগর মেলায় যাবার জন্য সাধুরা এসেছেন। আমি তাঁদের গেরুয়া-বস্ত্র দান করব মনে করেছি। তারি জন্য বারোখানি কাপড় কিনে গেরি-মাটিতে রঙ করেছি।'

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনিয়া সহাস্যে বলিলেন: 'জগন্নাথঘাটের সাধুদের গেরুয়া কাপড় দিলে যে ফল হবে, তার হাজার গুণ বেশী ফল হবে যদি তুই আমার এই ছেলেদের দিস্। এদের মতো ত্যাগী সাধু আর কোথায় পাবি! এদের এক-একজন হাজার সাধুর সমান। এরা হাজারী সাধু। বুঝলি?'

এই কথা শুনিয়া গোপালদাদার মনোভাবের পরিবর্তন হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার পর সেই বারোখানি গেরুয়া-বস্ত্র এবং রুদ্রাক্ষের মালা স্পর্শ ও মন্ত্রপূত করিয়া দিলেন এবং তাঁহার এগারজন সেবককে এক-একখানি গৈরিক বস্ত্র ও একটি রুদ্রাক্ষের মালা দান করিবার

জন্য মুরুব্বি গোপালদাদাকে আদেশ করিলেন। গোপালদাদা আমাদিগকে সেই গৈরিক বস্ত্রগুলি ও রুদ্রাক্ষের মালা পরাইয়া দিলেন। আমরা গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিতে গেলাম। তিনি আমাদিগকে সন্ন্যাসীর বেশে দেখিয়া অতিশয় আনন্দ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি আমাদিগকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। সেইদিন হইতে আমরা সাদা কাপড় ত্যাগ করিয়া গৈরিক বস্ত্রই পরিধান করিতে লাগিলাম। এগার জন সেবক যাহারা গেরুয়া পাইয়াছিল তাহাদের নাম নরেন, রাখাল, নিরঞ্জন, বাবুরাম, শশী, শরৎ, কালী, যোগীন, লাটু, তারক ও বুড়ো-গোপাল। শ্রীশ্রীঠাকুর গিরিশ ঘোষের জন্য অবশিষ্ট একখানি গৈরিক বস্ত্র রাখিয়া দিতে বলিলেন। পরে গিরিশবাবু উহা পাইয়া মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন।

॥ আমাদের ভিক্ষা করিবার আদেশ ॥

গৃহস্থ-ভক্তেরা যখন শ্রীশ্রীঠাকুরকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতা শ্যাম-পুকুরের বাসায় লইয়া আসিলেন, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বলরামবাবুকে বলিয়াছিলেন: 'তুমি আমার খাবার খরচটা দিও। আমি চাঁদার খাওয়া পছন্দ করি না।' পরমভক্ত বলরামবাবু তাহাতে সম্মত হইয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। তাহার পর যখন কাশীপুরের বাগানবাড়ী ভাড়া করা হইল, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর সুরেশচন্দ্র মিত্রকে বলিয়াছিলেন: 'এই সকল গরীব ভক্তেরা কেরাণী, এদের ক্ষমতা নাই যে, ৮০৲ টাকা এই বাগানের ভাড়ার জন্য দিতে পারে। তুমি এই ভাড়াটা দিও।' সুরেশচন্দ্র অবনত মস্তকে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য করিয়াছিলেন।

কাশীপুরের বাগানে ক্রমশই সেবকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষা ও দিবারাত্র পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য বেশী লোকের আবশ্যক হইল। তখন রামবাবু প্রভৃতি গৃহস্থ-

ভক্তগণ মাসিক খরচের বিষয় ভাবিয়া পরস্পরে আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং ছুটকো গোপালকে খরচের হিসাব খাতায় লিখিয়া রাখিতে বলিলেন। অনেক সময় বৈকুণ্ঠ সান্ন্যাল প্রভৃতি গৃহস্থ-ভক্তেরা কাশীপুরে আসিয়া আহারাদি করিত এবং রাত্রিতে বাস করিত।

পরে রামবাবু প্রভৃতি গৃহস্থ-ভক্তেরা খাইবার খরচ কমাইবার জন্য সেবকের সংখ্যা যাহাতে অল্প হয় সেই বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, দুইজন সেবক থাকিলেই যথেষ্ট হইবে, অপর সকলে নিজ নিজ বাড়ীতে থাকিবে। এই সংবাদ যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কর্ণে উপস্থিত হইল তখন তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন : 'আমার এখানে আর থাকার ইচ্ছে নেই। ইন্দ্রনারায়ণ জমিদারকে টান্‌ব নাকি ? না, বড়বাজারের মাড়োয়ারীটাকে ডেকে আন। সেই মাড়োয়ারী অনেক টাকা নিয়ে একবার এসেছিল, কিন্তু সে টাকা আমি গ্রহণ করিনি।' তাহার পর বলিলেন : 'না, কাকেও ডাকার আর প্রয়োজন নাই। জগন্মাতা যা করেন তাই হবে।' তখন নরেন্দ্র-নাথ প্রভৃতি আমরা সকলে বসিয়া আছি, তিনি আমাদিগকে বলিলেন : 'তোরা আমাকে অন্যত্র নিয়ে চল। তোরা আমার জন্যে ভিক্ষা করতে পারবি ? তোরা আমাকে যেখানে নিয়ে যাবি, সেখানেই যাব। তোরা ক্যামন ভিক্ষা করতে পারিস দ্যাখা দেখি! ভিক্ষার অন্ন-বস্ত্র শুদ্ধ। গৃহস্থের অন্ন খাবার আর আমার ইচ্ছে নেই।'

আমরা তখন সমস্বরে বলিলাম : 'আপনার জন্য নিশ্চয়ই আমরা ভিক্ষা করব।' পরদিন প্রাতে নরেন্দ্রনাথ, নিরঞ্জন, ছুটকো-গোপাল ও আমি প্রথমেই নীচে শ্রীমার নিকট ভিক্ষা করিতে যাইয়া বলিলাম :

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞান-বিজ্ঞান-সিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্বতি ॥

করুণাময়ী শ্রীমা অবাক্ হইয়া আমাদের সকলকে মুষ্টিভিক্ষা দিলেন। তখন শ্রীমার পদধূলি লইয়া আমরা ভিক্ষা করিবার জন্য পথে বাহির হইলাম। ইহার পূর্বে আমরা আর কখনও ভিক্ষা করি নাই এবং

কিরূপে বাহিরে যাইয়া ভিক্ষা করিতে হয় তাহাও জানিতাম না। নিরঞ্জন মাথায় গেরুয়া পাগড়ি বাঁধিয়া হিন্দুস্থানী সাধু সাজিয়া 'মাই, থোড়া ভিক্ষা দিজিয়ে' বলিয়া ভিক্ষা আরম্ভ করিল। আমরা বাংলাতেই 'ভিক্ষা দাও' বলিয়া ভিক্ষা আরম্ভ করিলাম। কোন কোন বাড়ীর মেয়েরা চাল, আলু, কাঁচকলা, বেগুন ইত্যাদি ভিক্ষা দিল। কেহবা নানা কথা শুনাইয়া দিল। কেহ বলিল: 'হোঁৎকা মিনসে, চাকরী করিতে পারিস্ নি, আবার ভিখারী সেজে ভিক্ষা করতে বার হয়েছিস?' কেহ বলিল, ইহারা ডাকাতের দল, সন্ধান লইতে আসিয়াছে। অপর কেহ গুণ্ডার দলের লোক বলিয়া আমাদের তাড়া করিল। আমরা নীরবে সকল রকম ভৎর্সনা অকাতরে সহ্য করিয়া এক বাড়ী হইতে অপর বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইলাম। অবশেষে যাহা ভিক্ষায় পাইলাম তাহা লইয়া আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের পদতলে সমর্পণ করিলাম। তাহা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি ঐ ভিক্ষা শ্রীমাকে রন্ধন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। শ্রীমা সেই ভিক্ষান্নের তরল মণ্ড রন্ধন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা মুখে দিয়া বলিলেন: 'ভিক্ষান্ন অতি পবিত্র। এতে কারু কোন কামনা নেই। আজ ভিক্ষান্ন খেয়ে আমি পরমানন্দ লাভ করলাম।' তাহার পর আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম।

তাহার পর যোগীন, শরৎ, শশী, রাখাল প্রভৃতি সকলেই এক-একদিন ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিল। কাশীপুরে যখন অনেক লোক শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল তখন তাহাদের সহিত কথাবার্তা কহিতে তাঁহার গলার বিশ্রাম হইত না জানিয়া চিকিৎসকগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট সেবক ভিন্ন আর কাহাকেও যাইতে নিষেধ করিলেন। আমরা এই নিয়ম যথাসাধ্য পালন করিতে লাগিলাম। নিরঞ্জন এক ডাণ্ডা ঘাড়ে করিয়া সিঁড়িতে পাহারা দিতে আরম্ভ করিল, কোন গৃহস্থ বা ভক্তকে উপরে উঠিতে দিত না। একদিন

কতগুলি ভক্ত অনেক দূর হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিল। আমরা তাহাদের ব্যাকুলতা দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানাইলে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বলিলেন : 'আহা, ওরা এতদূর থেকে আমাকে দেখ্‌তে এসেছে, ওদের আমি দেখা দেব বৈকি! ওদের আসতে দে।' তাহারা আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করিয়া চলিয়া গেল। তাহাদিগের সহিত অধিকক্ষণ কথা কহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের গলার বেদনা আবার বৃদ্ধি পাইল।

॥ কাশীপুরে শিবরাত্রি ॥

শিবরাত্রির দিন আমরা (নরেন্দ্রনাথ, শরৎ, নিরঞ্জন, ছুট্‌কো-গোপাল ও আমি) নিরম্বু উপবাস ও সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া চারি প্রহরে শিবপূজা ও ধ্যান করিয়াছিলাম। নরেন্দ্রনাথ মধুর কণ্ঠে শিবমহিমা গান করিয়াছিল। রাত্রি দুই প্রহরের সময় শরৎ, নিরঞ্জন ও গোপাল-দাদা যখন বাহিরে গিয়াছিল তখন নরেন্দ্রনাথ ও আমি বসিয়া ধ্যান করিতেছিলাম। কিন্তু অকস্মাৎ নরেন্দ্রনাথের সমস্ত শরীর কাঁপিতে আরম্ভ করিল। নরেন্দ্রনাথ আমাকে বলিল : 'আমার উরুতে হাত দিয়ে দেখ্‌তো, কিছু অনুভব করতে পারিস কিনা?' তখন আমি তাহার উরুতে হাত রাখিয়া অনুভব করিলাম যেন আমি ইলেকৃট্রিক ব্যাটারী ধরিয়াছি এবং নরেন্দ্রনাথের শরীরকে ম্যাগনেটিক কারেণ্ট প্রবল বেগে কাঁপাইতেছে। ক্রমশঃ এই প্রবাহ এমনই প্রবল হইয়া উঠিল যে, আমার হাতও কাঁপিতে লাগিল। দুঃখের বিষয় এই ঘটনাটি অতিরঞ্জিত করিয়া শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গে এবং স্বামীজীর জীবনীতে বলা হইয়াছে যে, স্বামীজী আমাকে স্পর্শ করিয়া আমার ভিতর শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন এবং আমাকে জ্ঞানমার্গে আনিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আমার জ্ঞানচক্ষু পূর্বেই খুলিয়াছিল এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমি আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। আসল কথা এই যে, নরেন্দ্রনাথের মনে হইয়াছিল

শ্রীশ্রীঠাকুর যে শক্তি সঞ্চার করেন তাহা এইরূপ এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের ন্যায় তাহারও অপরকে শক্তি সঞ্চার করিবার ক্ষমতা হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রনাথের এই অভিমান দূর করিবার জন্য পরে বলিয়াছিলেন: 'এখন শক্তি সঞ্চয় করার সময়, খরচ করার নয়'।[১]

শিবরাত্রির সময় নরেন্দ্রনাথ শিব-বিষয়ক একটি গান রচনা করিয়া গাহিতে লাগিল:

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বব বম বাজে গাল।
ডিমি ডিম ডমরু বাজে, দুলিছে কপাল-মাল॥
গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে।
ধক ধক ধক মৌলিবন্ধ, জ্বলে শশাঙ্ক-ভাল॥

১। দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণমিশন ও উদ্বোধন-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত এবং তাহাদের অনুসরণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার পার্ষদদের জীবন এবং লীলা-সম্বন্ধে যে সকল বাংলা ও ইংরাজী পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহাদের মধ্যে কাশীপুরের বাগানে শিবরাত্রির দিনে অনুষ্ঠিত ঐ ব্যাপারটিকে বিশেষভাবে বিকৃত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে ঐ ঘটনার বিকৃত বিবরণ দেখিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতা শ্রীমৎ সারদানন্দ মহারাজকে সংশোধন করার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন এবং সারদানন্দ মহারাজ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতিমূলক পত্রও স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে দিয়াছিলেন। সেই পত্র "মন ও মানুষ" গ্রন্থে ছাপিয়াও দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর স্বামী সারদানন্দজীর মহাসমাধি হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের পরবর্তী সংস্করণ ছাপাও হইল, কিন্তু বিকৃত ও অনৈতিহাসিক বিবরণের সংশোধন আর করা হইল না। ফলে দাঁড়াইয়াছে যে, প্রামাণিক গ্রন্থহিসাবে গণ্য শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গকে অনুসরণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার পার্ষদদের যত বাংলা ও ইংরাজী গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ও এখনও হইতেছে সেইগুলিতে ঐ ভুল বিবরণই থাকিয়া যাইতেছে। স্বামী অভেদানন্দজীর জীবদ্দশায় "কালী-তপস্বী" পুস্তিকা ছাপা হয়। তাহাতে তিনি নিজে ঐ বিবরণটি সংশোধন করিয়া দেন। সেই সংশোধিত বিবরণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ হইতে প্রকাশিত "জীবনকথা" এবং "মন ও মানুষ" প্রভৃতি গ্রন্থে মুদ্রিত হয়। সত্যসংকল্প মহাপুরুষ ও শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান স্বামী অভেদানন্দজীর স্বয়ংপ্রদত্ত বিবরণকে আমরা সত্য বলিয়া যদি গ্রহণ করি তাহা হইলে অন্ততঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও উদ্বোধন হইতে প্রকাশিত যে গ্রন্থে ঐ জাতীয় বিবরণের বিকৃত রূপের পরিচয় দেওয়া আছে তাহাদের সংশোধন করিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি। শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদের জীবনী-বিবরণ প্রমাদপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করায় কোন সার্থকতা দেখি না। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ঐ সকল ভুল বিবরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া

নরেন্দ্রনাথ শিবের আবেশে তন্ময় হইয়া গানটি রচনা করিয়াছিল এবং এমনই ভাবে বিভোর হইয়া গান করিয়াছিল যেন ভোলানাথ শিব নিজেই নিজের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। সে এক সুন্দর পরিবেশ! নরেন্দ্রনাথের কিন্নরকণ্ঠে ভাবগম্ভীর সেই গানের স্মৃতি আজিও আমার মনে জাগরূক আছে।

॥ শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্মাণকায় ধারণ ॥

কাশীপুরের বাগানে শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর রাত্রিতে নির্মাণকায় ধারণ করিয়া নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। শ্রীমা সারদাদেবী সেই অপূর্ব ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ঘটনাটি হইল: একদিন নিরঞ্জন মতলব আঁটিল যে, বাগানে একটি খেজুরগাছ আছে। মালী সেই গাছে হাঁড়ি লাগাইয়া প্রত্যহ খেজুর-রস সংগ্রহ করে, আমরা ঐ জীরেন রস চুরি করিয়া খাইব। সকলেই ইহাতে সম্মত হইল। গভীর রাত্রে নিরঞ্জন, হুটকো-গোপাল প্রভৃতি খেজুর গাছ খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় খেজুরগাছ আর দেখিতে পাওয়া গেল না। তখন তাহারা ভাবিল, ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরের এক অদ্ভুত খেলা! সেই সময়ে শ্রীমা জাগিয়া বাগানের দিকে জানালা দিয়া দেখেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর নিরঞ্জন প্রভৃতির সঙ্গে বাগানে বেড়াইতেছেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর তখন আপন শয্যায় শুইয়াই ছিলেন এবং দুইজন সেবক তাঁহার সেবা করিতেছিল।

॥ নরেন্দ্রনাথের নির্বিকল্প-সমাধি ॥

একদিন নরেন্দ্রনাথ ধ্যান করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। তাহার এই জ্ঞানশূন্যতা আসলে নির্বিকল্প সমাধি। নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প-

---

আমাদের নিকট বহুবার দুঃখ প্রকাশও করিয়াছিলেন। বর্তমান "আমার জীবনকথা" তাঁহার স্বহস্তলিখিত বাংলা ভাষায় জীবনী ও ইহার পাণ্ডুলিপি হইতেই বিবরণ যথাযথভাবে প্রকাশ করা হইল। তাঁহার স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি আমাদের নিকট আছে। মোটকথা তাহাতে লিখিত বিবরণের সত্যতাকে নিশ্চয়ই আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিব।

সমাধিতে মগ্ন হইয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিল। এই অবস্থায় অল্পক্ষণ থাকিয়া তাহার মন ক্রমশঃ নীচে নামিয়া আসিল। তাহার পর আবার বারবার চেষ্টা করিয়াও ঐ অবস্থা আর ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। তখন সে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট গিয়া বলিল: 'আপনি আমাকে সেই আনন্দসাগরে যাতে সর্বদা থাকতে পারি দয়া ক'রে তাই করে দিন।' শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া আনন্দের সঙ্গে বলিলেন: 'এখন না, পরে হবে।' নরেন্দ্রনাথ ব্যগ্র হইয়া জিদ করিতে লাগিল এবং বলিল, : 'আমার আর কিছুই ভাল লাগে না, সর্বদাই নির্বিকল্প সমাধির অবস্থায় থাক্‌তে ইচ্ছা হয়।' শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন: 'সে ঘরের চাবি আমার হাতে। তুই এখন আমার কাজ কর, পরে সময় হ'লে আমি চাবি খুলে দেব। নইলে তুই তোর স্বরূপ জানতে পারলে এই শরীরটা থু ক'রে ফেলে দিবি।' নরেন্দ্রনাথ নীরব থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিল।

॥ বুদ্ধচরিত ও বুদ্ধগয়ায় গমন ॥

নরেন্দ্রনাথ, তারকদাদা (স্বামী শিবানন্দ) ও আমি প্রায়ই বুদ্ধদেবের জীবনী পাঠ, তাঁহার ত্যাগ এবং কঠোর সাধনার বিষয় আলোচনা করিতাম। তখন আমরা ললিতবিস্তরের গাথাগুলি বেশ মুখস্থ করিয়াছিলাম। মধ্যে মধ্যে 'ইহাসনে শুষ্যতু যে শরীরম্' ইত্যাদি আবৃত্তি করিয়া ধ্যান করিতাম। ক্রমে আমাদের তিনজনেরই বুদ্ধদেবের তপস্যার স্থান দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। একদিন নরেন্দ্রনাথ, তারকদাদা ও আমি কলিকাতা হইতে নগ্নপদে হাটিতে হাটিতে সন্ধ্যার পূর্বে কাশীপুরের বাগানে উপস্থিত হইলাম। ইচ্ছা এত বলবতী হইল যে, আমরা আর থাকিতে পারিলাম না। নরেন্দ্রনাথ বলিল: 'চল্‌, কাকে কিছু না বলেই আমরা বুদ্ধগয়ায় চলে যাই।' শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমরা বুদ্ধগয়ায় যাওয়ার কোন কথা বলিলাম না। নরেন্দ্রনাথ আমাদের তিনজনের জন্য রেলভাড়া সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইল।

আমরা কৌপীন, বহির্বাস ও কম্বল লইয়া প্রস্তুত হইলাম। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বরাহনগর-খেয়াঘাট হইতে গঙ্গা পার হইয়া আমরা তিনজনে বালির দিকে যাত্রা করিলাম। রাস্তার ধারে একটি মুদির দোকানের রকে সেই রাত্রি কাটাইলাম। তার পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া বালি ষ্টেশনে গিয়া রেলগাড়িতে উঠিলাম। পরদিন গয়ায় পৌঁছিলাম। আমরা গয়াধাম দর্শন করিয়া বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হইলাম।

বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হইয়া আমরা মন্দিরে প্রবেশ করিলাম এবং বুদ্ধমুর্তি দর্শন করিয়া আনন্দে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। পরে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' ইত্যাদি বলিয়া তিনজনে ধ্যান করিতে বসিলাম। মন্দিরের অভ্যন্তরে গম্ভীর শান্ত পরিবেশ। মন অমনি সমাধি-সাগরে ডুবিয়া যায়! আমরা ধ্যানের সময় অপূর্ব নির্বাণসুখের আভাস ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। পরে মন্দিরের বাহিরে বোধিদ্রুমের সম্মুখে সম্রাট অশোক-নির্মিত বজ্রাসনে বসিয়া আবার তিনজনে ধ্যান করিতে লাগিলাম। নরেন্দ্রনাথ অপূর্ব এক জ্যোতি দর্শন করিল। আমার সর্বশরীরেও যেন শান্তিস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তারকদাদাও গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। দুই ঘণ্টা ধ্যানের পর আমরা তিনজনে নিরঞ্জনা-নদীতে স্নান করিয়া মাধুকরি করিলাম এবং কিছু জলযোগ করিয়া তথাকার ধর্মশালায় বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ঐ ধর্মশালায় রাত্রিযাপনও করিলাম। আমাদের সঙ্গে কোনও গরম কাপড় ছিল না, সুতরাং রাত্রিতে শীতের জন্য আর নিদ্রা হইল না। তাহাতে আবার মধ্যরাত্রে নরেন্দ্রনাথের পেটের অসুখ হইল। যাহা আহার করিয়াছিল তাহা সম্ভবতঃ হজম হয় নাই। দুই-চারিবার দাস্ত হইল এবং পেটের যন্ত্রণাতে সে কষ্ট পাইতে লাগিল। আমরা বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। তখন কাতর হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি নরেন্দ্রনাথ

একটু সুস্থ বোধ করিল। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরকে কিছু বলিয়া আসা হয় নাই, তাঁহার অসুখের সময় আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি এবং তাঁহার অনুমতি না লইয়া আসা অন্যায় হইয়াছে—এই সকল কথাই ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল। ক্রমশই আমাদের মন অস্থির হইয়া উঠিল। যেন এক আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম। নরেন্দ্রনাথের পেটের অসুখ তখনও সম্পূর্ণ সারে নাই ও অথচ কাহারও নিকট কোনরূপ সাহায্য পাইবার উপায় নাই। দেখিলাম রেলভাড়াও সঙ্গে নাই। কাজেই আমরা বিষম বিভ্রাটে পড়িলাম, কিছু স্থির করিতে পারিলাম না। সুতরাং শীঘ্র কাশীপুরে ফিরিয়া যাওয়া কর্তব্য মনে করিলাম। কিন্তু ফিরিয়া যাইবার কোন পাথেয় তো আমাদের কাছে ছিল না।

তখন নরেন্দ্রনাথ বলিল: 'চল্, আমরা বুদ্ধগয়ার মোহন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি ও কিছু অর্থ ভিক্ষা করি। আমি ও তারকদাদা তাহাতে সম্মত হইলাম। প্রাতঃকালে নিরঞ্জনা-নদীর বালির চর পার হইলাম। নদীর বালি এত ঠাণ্ডা ছিল যে, আমাদের খালি পা যেন পুড়িয়া যাইতে লাগিল। ঠাণ্ডায় যে আগুনে পোড়ার স্থায় পা জ্বালা করে তাহা পূর্বে আমরা জানিতাম না। অতিকষ্টে হাটিয়া নিরঞ্জনা-নদী পার হইয়া মোহন্তের মঠে উপস্থিত হইলাম। মঠের দশনামী সন্ন্যাসীদের সহিত আমাদের আলাপ হইল। সেখানে সাধুদের পঙ্গদে বসিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া বিশ্রাম করিলাম। মঠের মোহন্ত মহারাজ নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতের অত্যন্ত ভক্ত শুনিয়া তাহাকে গান শুনাইতে অনুরোধ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ যদিও পেটের অসুখে অত্যন্ত দুর্বল হইয়াছিল, তথাপি তাহার গলার তেজস্বিতা কমে নাই। সে কয়েকটি ভজন গান গাহিল। তাহার অপূর্ব সঙ্গীত-পরিবেশনে মোহন্ত মহারাজ অত্যন্ত প্রীত হইলেন। পরে আমরা বিদায় লইবার সময়ে আমাদের পাথেয় নাই শুনিয়া তিনি কিছু পাথেয়ও দিলেন। আমরা পুনরায় নিরঞ্জনা-নদী পার হইয়া বুদ্ধগয়ায় আসিলাম এবং

গয়াধামে বাঙ্গালী ভদ্রলোক উমেশবাবুর বাড়ীতে অতিথি হইলাম। সেখানে সন্ধ্যার পর নরেন্দ্রনাথ আবার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও ভজনগান করিল। তথায় অপূর্ব সঙ্গীত-পরিবেশনে সকলে মুগ্ধ হইলেন। উমেশবাবু আমাদের বিশেষ যত্ন করিয়া রাত্রে থাকিবার স্থান দিলেন। পরদিন প্রাতে রেলে চড়িয়া আমরা কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম ও পরদিন সন্ধ্যার সময় কাশীপুরের বাগানে উপস্থিত হইলাম। এইদিকে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন এবং ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া মহানন্দে সাগ্রহে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। আমরা বুদ্ধগয়ার সমস্ত ঘটনাই আনুপূর্বিক তাঁহাকে নিবেদন করিলান। সকল ঘটনা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রশান্তভাবে বলিলেন : 'বেশ করেছিস'।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

॥ বরাবর-পাহাড়ে হঠযোগীর নিকট গমন ॥

একদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কাশীপুরের বাগানে আসিয়াছেন। তিনি গয়ার নিকটে বরাবর-পাহাড়ে এক সিদ্ধ হঠযোগীকে দেখিয়া আসিয়াছেন এবং সেই হঠযোগীর বিশেষ সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। উহা শুনিয়া আমার মনে সেই হঠযোগীকে দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। পরদিন কাহাকেও আমার সঙ্কল্পের কথা না বলিয়া আমি চুপিচুপি গয়া পর্যন্ত যাতায়াতের ভাড়া সংগ্রহ করিলাম ও একাকীই যাত্রা করিলাম। এমন কি সেই কথা শ্রীশ্রীঠাকুরও জানিতে পারিলেন না।

সঙ্গহীন অবস্থায় বিদেশভ্রমণ আমার সেই প্রথম। একাকী পরিব্রাজকের ন্যায় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশপর্যটন করিব ইহা আমার ইচ্ছা ছিল। আমি বালী ষ্টেশন হইতে রেলগাড়ী করিয়া গয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। সেইখান হইতে পদব্রজে চারি ক্রোশ পাহাড়ের রাস্তা অতিক্রম করিয়া বরাবর-পাহাড়ের তলদেশে যে গ্রাম আছে সেইখানে উপস্থিত হইলাম। সেইখানে একটি ধর্মশালা ছিল। আমি সেই ধর্মশালায় রাত্রি যাপন করিলাম। একজন দশনামী 'পুরি'-নামা সন্ন্যাসীর সহিত সেখানে আমার আলাপ-পরিচয় হইল। তাঁহার নিকট সন্ন্যাসপদ্ধতি ও বিরজাহোমের পুঁথি ছিল। সেই পুঁথি তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া আমার নিকট একটি ছোট খাতা ছিল তাহাতে বিরজাহোমের মন্ত্রগুলি (প্রেষমন্ত্র, মঠ, মড়ি, যোগপট্ট ইত্যাদি সন্ন্যাসের মন্ত্র) লিখিয়া লইলাম। পরের দিন প্রাতে গ্রামবাসীদের নিকট হইতে হঠযোগীর গুহার রাস্তা প্রভৃতির সংবাদ সংগ্রহ করিয়া বরাবর-পাহাড়ে হঠযোগীর নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সকলেই আমাকে সেই গুহার দিকে যাইতে নিষেধ করিয়া বলিল,

সেই গুহার রাস্তায় যদি কেহ যায় তাহাকে হঠযোগী এবং তাঁহার শিষ্যেরা পাথর ছুঁড়িয়া মারে। তাহারা হঠযোগীর নিকট কাহাকেও যাইতে দেয় না। গ্রামের লোকেরা আমায় ভয় দেখাইতে লাগিল ও সেই দিকে যাইতে নিষেধ করিল।

কিন্তু আমি তাহাদের কথায় ভীত হইলাম না। দৃঢ়সঙ্কল্প করিলাম যেমন করিয়া হোক হঠযোগীর সহিত আমি সাক্ষাৎ করিব ও তাহাতে আমার জীবন যায় যাউক। পরদিন প্রাতে নির্ভীক চিত্তে পাহাড়ের অপ্রশস্ত রাস্তা (যাহা জঙ্গলের মধ্য দিয়া গুহার দিকে গিয়াছে) ধরিয়া পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিলাম। নিঃশব্দে অতি সতর্কতার সহিত যাইতেছি ও চারিদিকে দৃষ্টি রাখিতেছি কেহ পাথর ছুঁড়িতেছে কিনা। এইরূপ যাইতে যাইতে হঠাৎ আমি একেবারে গুহার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। সেইখানে ধুনির সম্মুখে এক হঠযোগী ও তাঁহার শিষ্যেরা বসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া হঠযোগীর শিষ্যেরা চমকিত হইল এবং তখনই দাঁড়াইয়া উঠিয়া মারিতে উদ্যত হইল। আমি তাহাদের দেখিয়া একটু চমকিত হইলাম, কিন্তু ভীত না হইয়া প্রত্যুৎপন্নমতির সহিত 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলিয়া প্রণাম জানাইলাম। পরে আমি যথার্থ সন্ন্যাসী কিনা জানিবার জন্য মঠ, মড়ি, প্রেষমন্ত্র ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিল। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, আমি পূর্বদিন রাত্রে এক দশনামী সন্ন্যাসীর নিকট হইতে প্রেষমন্ত্র প্রভৃতি জানিতে পারিয়াছিলাম। তখন ভাবিলাম সমস্তই করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা এবং কৃপা করিয়া আমায় রক্ষা করিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরই সেই কার্য করাইয়াছেন। ভাবিয়া তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। হঠযোগী জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাঁহাকে যখন সকল প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিলাম তখন তিনি আমাকে সাদরে ধুনির পার্শ্বে বসিতে আজ্ঞা করিলেন। তখন তাঁহার শিষ্যেরাও আমাকে যথার্থ সন্ন্যাসী জানিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। কিছুক্ষণ পরে যখন আমি তাহাদের নিকট হঠযোগ শিক্ষা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম তখন তাহারা আমাকে

গুহার মধ্যে আহ্বান করিল। আমি একাকী এবং উহারা আমাকে গুহার মধ্যে লইয়া গিয়া কি করিবে ইত্যাদি সন্দেহ জাগিলেও তাহা মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া গুহায় প্রবেশ করিলাম। সেইখানে আর একটি ধুনি জ্বলিতেছে দেখিলাম। হঠযোগীর নির্দেশে আমি তাঁহার আসনের নিকট বসিলাম। আমি তাঁহাকে হঠযোগ, প্রাণায়াম প্রভৃতি বিষয়ে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। হঠযোগী সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমাকে তাঁহার নিকট যোগ শিক্ষা করিতে এবং সেই গুহায় থাকিতে আদেশ করিলেন। আমি দেখিলাম গুহাটি বেশ বৃহৎ এবং সেইখানে আহারীয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। দেখিলাম, একধারে একটি পাঁঠা এবং মুরগী বাঁধা রহিয়াছে। তখন বুঝিলাম সাধু অঘোরপন্থী। দেখিলাম, একটি শিষ্যের হাঁপানীও হইয়াছে। বুঝিলাম, হঠযোগীর নিকট আমি যদি প্রাণায়াম ও যোগ শিক্ষা করি তাহা হইলে আমারও হয়তো ঐরূপ হাঁপানী হইতে পারে। আরও অনেক প্রশ্ন করিতে করিতে দেখিলাম, তাঁহার যোগশাস্ত্রের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ। তিনি কেবল 'পবন-স্বরোদয়' গ্রন্থটি পাঠ করিয়া কিছু প্রাণায়াম শিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু উহাতে তিনি সিদ্ধ হন নাই। সুতরাং তাঁহার নিকট কিছু শিখিতে আমার ইচ্ছা হইল না। কিন্তু তিনি আমাকে শিষ্য করিবার ও যোগ শিখাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

সেই সময়ে একটি ঘটনা ঘটিল। দেখিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি অকস্মাৎ আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। আমি চমকিত হইয়া সেই হঠযোগীর সহিত করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুরের তুলনা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, হঠযোগী অল্পজ্ঞ একজন সাধকমাত্র। দেখিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুর আমার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। তখন আমার চক্ষে জল আসিল। আমি অনুভব করিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুর সিদ্ধের সিদ্ধ ও জ্ঞানের মহাসাগর। তখন আমার আর সেই গুহাতে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। হঠযোগী আমাকে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য ডাল ও রুটি

খাইতে দিলেন ও আমাকে কিছুদিন তাঁহার নিকট থাকতে অনুরোধ করিলেন। সুতরাং আমি মহাবিপদে পড়িলাম। কি প্রকারে তাঁহার নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাইব ও পলায়ন করিতে পারিব এই চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি ক্রমাগতই আমার মনে হইতে লাগিল। আমি কাতরভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—যেন তিনি একটি উপায় করিয়া দেন। মনে মনে একটু ভয়ও হইতে লাগিল যে, যদি হঠযোগীর কথা অবহেলা করিয়া পলায়ন করি তাহা হইলে তাঁহার শিষ্যেরা আমাকে পাথর মারিয়া মাথা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। আমি হিন্দীতে 'এখন চলিলাম' ইত্যাদি বলিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু হঠযোগী নারাজ হইয়া আমাকে যাইতে নিষেধ করিলেন—'তোমরা মাফিক শিষ্য বহুত ভাগ্‌সে মিলতা হ্যায়', অর্থাৎ তোমার মতো শিষ্য অতি ভাগ্যে মিলে। তখন আমি আরও বিপদে পড়িলাম।

অবশেষে বৈকালে জল আনিবার ভাণ করিয়া গুহার বাহিরে আসিলাম ও উর্ধ্বশ্বাসে পাহাড় হইতে নীচের দিকে ছুটিতে লাগিলাম। দেখিলাম, হঠযোগীর শিষ্যেরা বড় বড় পাথর লইয়া আমার দিকে ছুঁড়িয়া মারিতেছে। আমি কোনদিকে আর না চাহিয়া পাহাড়ের নীচে গ্রামের দিকে ছুটিতে লাগিলাম এবং ছুটিতে ছুটিতে পাহাড়ের পাদদেশের গ্রামে গিয়া পৌঁছিলাম। সেইখান হইতে গয়া ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইলাম। আমার মন তখন তীব্রভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে ছুটিতে লাগিল। প্রতি মুহূর্ত যেন এক একটি যুগ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কোনক্রমে সেইদিন গয়া ষ্টেশনে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রাতে একটি গাড়ী ধরিয়া বালী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম এবং গঙ্গা পার হইয়া কাশীপুরে ফিরিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে মস্তক দিয়া প্রণাম করিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন: 'কি রে, আমাকে না বলে কোথায় গিছ্‌লি?' আমি আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলিলাম।

শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: 'হঠযোগীকে ক্যামন দেখ্‌লি?' আমি বলিলাম: 'আমার ভাল লাগলো না। আপনার তুলনায় তিনি কিছুই নন। সেজন্য আপনার শ্রীচরণতলে ছুটে এলাম।' তিনি বলিলেন: 'যত বড় সাধু বা সিদ্ধ যেখানে আছে দেখ্‌বি, আমি তাদের সব জানি। চারখুঁট ঘুরে আয়, কিন্তু এখানে (আপনার বুকে হাত দিয়া) যা দেখ্‌ছিস, এমনটি আর কোথাও পাবিনি।' এই বলিয়া তিনি আমার মস্তকে হস্ত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন। আমার সমস্ত অঙ্গ যেন তখন জুড়াইয়া গেল! প্রতি মুহূর্তে তিনি যে আমাদের কত কৃপা করিয়াছেন তাহা কোটি কোটি মুখেও আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। তাহার পর তিনি মাস্তুলের পাখীর দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলেন যে, তুলনা করিলে ছোট-বড় বা ভাল-মন্দ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। আমি বলিলাম: 'তাহলে আমি হঠযোগী দেখতে গিয়ে ভালই করেছিলাম। এখন আমি আপনার মহিমা আরো ভাল ক'রে বুঝতে পারছি।' তিনি শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন।

॥ আমার দর্শনবিচার ॥

আমি তখন বেদান্তের 'নেতি নেতি' বিচার করি এবং অষ্টাবক্র-সংহিতা পাঠ করি, সুতরাং যুক্তি-বিচারে যাহাই টিকিত তাহাই গ্রহণ করিতাম ও অপর সমস্ত উড়াইয়া দিতাম। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যত যুক্তিতর্ক শুনিতাম, সমস্তই বিচার করিয়া খণ্ডন করিতাম। তখন জন ষ্টুয়ার্ট মিলের লজিক (তর্কবিদ্যা), দর্শন ও তাঁহার 'এসেজ অন্‌ রিলিজিয়ান' (ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা) গ্রন্থাদি পাঠ করিতাম। রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া যখন তাঁহার পরিচর্যা করিতাম, তখনও ইংরাজী লজিক (তর্কবিদ্যা) পাঠ করিতাম। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে সেই সকল বই পড়িতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: 'কি রে, কি বই পড়ছিস্‌?' আমি বলিলাম: 'ইংরাজী ন্যায়শাস্ত্র। ঈশ্বর সম্বন্ধে কি ক'রে বিচার করতে হয় এই গ্রন্থ তা শিক্ষা

দেয়।' তিনি বলিলেন : 'বেশ। তুইই তো এখানে ছেলেদের মধ্যে বইপড়া ঢোকালি। কি জানিস, আপনাকে মারতে গেলে একটা নরুণ দিয়ে মারা যায়, কিন্তু অপরকে মারতে গেলে ঢাল তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের দরকার। বই পড়ায় ভগবান লাভ হয় না, তবে লোকশিক্ষার জন্য বই পড়া ও বিদ্যার প্রয়োজন আছে।' করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলির অর্থ তখন ঠিক বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে, তিনি আমায় সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে প্রচারকার্যের উপযোগী করার জন্যই বই পড়া নিষেধ করেন নাই।

॥ জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি ॥

শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে মাঝে জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটির প্রসঙ্গ তুলিয়া আলোচনা করিতেন, কিন্তু তখন আমি বা আমরা কেহই তাহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারিতাম না। আমরা বুঝিতাম, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সকলের মধ্যেই বিরাজমান। সুতরাং কেহ ছোট বা বড় এই চিন্তার কোন অর্থ নাই।

একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পদসেবা করিতেছি। নিকটে কেহই ছিল না। আমি তাঁহাকে একাকী পাইয়া সেই জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটির তত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি প্রসন্ন হইয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিলেন : 'ব্রহ্ম সকলের মধ্যে আছেন সত্য, কিন্তু সবার শক্তির প্রকাশে তারতম্য আছে। এই প্রকাশের তারতম্যেই মানুষ ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি হয়। জীবকোটি নিজে মুক্তি পান, কিন্তু অপরকে মুক্তি দিতে বা উদ্ধার করতে পারেন না। কিন্তু যিনি নিজে উদ্ধার লাভ ক'রে অপরকেও উদ্ধার করতে পারেন, তিনিই ঈশ্বরকোটি। জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটির মধ্যে এই প্রভেদ। কেউ কেউ আবার ঐ শক্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : 'জীবকোটি কি তাহলে ঐ শক্তি পায় না? জীবকোটি কি ঈশ্বরকোটির স্তরে কখনো উঠতে পারে না?'

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন: 'হ্যাঁ, পারেন। জীবকোটি যদি শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকট অপরকে উদ্ধার করার জন্য শক্তি প্রার্থনা করেন, তবে মা তাকে তা দেন।' এই উপলক্ষে তিনি একটি দৃষ্টান্তও দিলেন। তিনি বলিলেন: 'বনের মধ্যে চারদিকে উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা ছিল। কিন্তু কোন লোক হয়তো ভিতরের দিকে লক্ষ্য ক'রে আনন্দে 'হা হা' শব্দ ক'রে হেসে পড়ে যায়। এঁরা হলেন জীবকোটি। কিন্তু যা'র বিশেষ শক্তি আছে, তিনি দেওয়ালে উঠে ভিতরের জিনিস দেখে ফিরে আসেন এবং আর আর সঙ্গীদের খবর দিয়ে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান। এঁরা হলেন ঈশ্বরকোটি।' শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই অপূর্ব দৃষ্টান্ত শুনিয়া সেইদিন জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটির মধ্যে যে ভেদ তাহা বুঝিতে পারিলাম।

॥ আর একদিনের কথা ॥

একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর আমায় বলিলেন: 'দ্যাখ্, তোর দুই চোখ, ভ্রূ ও কপাল দেখলে আমার ভেতর শ্রীকৃষ্ণের মুখের উদ্দীপনা হয়। তোর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ আছে। যখন এই ভাব জাগে তখন আমার ভিতর আবার রাধার ভাবের উদ্দীপনা হয়।' আমি বলিলাম: 'সে সব কথা আপনি জানেন, আমি কি বুঝি।' এই অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে অলৌকিক প্রেমের খেলা দেখিয়াছি এবং তিনি কৃপা করিয়া আমায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রেমতত্ত্বরহস্য বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, সেই অবধি আমি শ্রীরাধার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার লীলা মানিতে লাগিলাম।

॥ নরেন্দ্রনাথের বিবাহের সম্বন্ধ ॥

এইদিকে এক ঘটনা ঘটিল। নরেন্দ্রনাথের মাতা তাঁহার সন্তানের বিবাহের সম্বন্ধ একরূপ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট সেই কথা পৌঁছাইতে বাকী রহিল না। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর

তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে একটি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া কলিকাতায় নরেন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। গাড়ী ক্রমে সিমলায় নরেন্দ্রনাথের বাড়ীর গলির সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ী হইতেই একজনকে দিয়া তিনি নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আসিয়াছেন শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ ধরপড় করিয়া দৌড়াইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর তখন গাড়ী হইতে নামিলেন এবং সস্নেহে নরেন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া বলিলেন: 'হ্যাঁরে, তোর নাকি বিয়ের সম্বন্ধ সব ঠিক হয়ে গেছে?' নরেন্দ্রনাথ মস্তক নত করিয়া বলিল: 'আজ্ঞে হ্যাঁ'। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন নরেন্দ্রনাথের হাতের গুলি (মাংসপেশী) টিপিয়া বলিলেন: 'তোর বিয়ে হবে না,—আমি বলছি।' নরেন্দ্রনাথ অবাক্ হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলিলেন: 'হ্যাঁরে, ঠিক বলছি।' এই কথা বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া সহিসকে গাড়ী চালাইতে বলিলেন। গাড়ী ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ স্তব্ধ ও বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া পরে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। আশ্চর্য যে, শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রনাথের বিবাহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইল। নরেন্দ্রনাথের বিবাহের সম্বন্ধ কোন কারণে ভাঙ্গিয়া গেল। আমরা পরে এই সংবাদ পাইয়া যেমন আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম, তেমনি আশ্বস্তও হইয়াছিলাম।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

॥ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধি ॥

যেইদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের গলায় হেমারেজ হয় সেইদিন আমি, নরেন্দ্রনাথ, নিরঞ্জন, রাখাল প্রভৃতি তাঁহার সম্মুখে বসিয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। ইহার কিছুদিন পরেই রবিবার, পূর্ণিমা ৩১শে শ্রাবণ তিনি মহাসমাধি লাভ করেন। যেইদিন এই ঘটনা ঘটিল, সেইদিন রাত্রে ১টার সময়ে আমরা সকলে তাঁহার নিকটে বসিয়াছিলাম। সাধারণত যেমন সমাধি হইত, সেইরূপই হইল। তাঁহার দৃষ্টি নাসাগ্রের উপর স্থির হইয়া রহিল। নরেন্দ্রনাথ উচ্চৈঃস্বরে 'ওঁকার' উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিল। আমরাও সমবেত স্বরে ওঁকারধ্বনি করিতে লাগিলাম। সকলের মনে আশা ছিল যে, অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইবে ও শীঘ্রই আবার তিনি চৈতন্যলাভ করিবেন। সুতরাং আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সমাধি ভাঙ্গিতে অনেক বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া আমরা মনকে আশ্বাস দিতে লাগিলাম যে, এক সময়ে তিন দিন তিন রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেলেও বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসে নাই. সুতরাং এইবারেও সেইরূপ হইতে পারে। কিন্তু সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল, শ্রীশ্রীঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান আর ফিরিয়া আসিল না। তখন সকলেই আমরা হতাশ হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। প্রাতঃকালে মাতাঠাকুরাণীকে সংবাদ দেওয়া হইল। শ্রীমা উপরে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্শ্বে বসিয়া 'মা কোথায় গেলি গো' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেই দৃশ্য হৃদয়বিদারক, কিন্তু অপরূপ বোধ হইতে লাগিল। আমরা একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আশ্চর্য পতি-পত্নীর সেই মধুর সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম এবং ভাবিলাম এইরূপ দৃশ্য ও ভাব আমরা পূর্বে কখনও দেখি নাই! প্রকৃতপক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে

শ্রীশ্রীভবতারিণীর জীবন্ত মূর্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং শ্রীমাও শ্রীশ্রীঠাকুরকে মা কালী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অপূর্ব ও মধুর সেই সম্বন্ধ শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীমার!

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধি হয় ৩১শে শ্রাবণ, ১২৯৩ সাল (ইংরাজী ১৬ই আগষ্ট, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ, রাত্রি ১টা ৬ মিনিটে)। নেপালের কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের মেরুদণ্ডে গব্যঘৃত মালিশ করিলে চৈতন্যোদয় হইবে বলিল। তখনই শশী (রামকৃষ্ণানন্দ) শ্রীশ্রীঠাকুরের মেরুদণ্ডে গব্যঘৃত আনিয়া সাগ্রহে মালিশ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও বাহ্যজ্ঞান প্রকাশের কোন চিহ্নই দেখা গেল না। সকলেই এই খবর পাইয়া একে একে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। সেই মহাবিপদের সংবাদ ক্রমে সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়িল। বেলা দশ ঘটিকার সময় ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার আসিয়া নাড়ী দেখিয়া বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন আর মালিশ করিয়া কোন ফল হইবে না, অর্ধঘণ্টা পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে। এইবার চিরসমাধি। মহেন্দ্র সরকারের কথা শুনিয়া আমরা সকল আশাই হারাইলাম! শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ধীরে বিকৃত (decomposed) হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই দিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যদেহের সৎকার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। সেই অবস্থার ফটো লইবার জন্য ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার দশ টাকা দিয়া শোকাভিভূত চিত্তে চলিয়া গেলেন। তখন সকলেই আমরা নিজেদের একেবারে অসহায় জ্ঞান করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম আমাদের সহায়-সম্বল ও সকল আশা-ভরসার অবসান হইল। এখন কি করিব ও কাহাকে আশ্রয় করিয়াই বা দিনযাপন করিব!

পয়লা ভাদ্র সোমবার ছিল আমাদের জীবনে এক স্মরণীয় দিন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিলে তাঁহার প্রাণবায়ু নির্গত হইয়াছে বুঝিবার উপায় ছিল না। শরীর কিছুটা বিকৃত (decomposed) হইলেও

সহাস্য-বদন ছিল। দিব্যজ্যোতি যেন তাঁহার সমস্ত শরীর হইতে নির্গত হইতেছিল। সেই মহাসমাধির ফটো লইবার জন্য বেঙ্গল ফটোগ্রাফার কোম্পানীকে খবর দিয়া আনানো হইল ও একটি খাটের উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর স্থাপন করা হইল। পুষ্পস্তবক সেই খাটের চারিদিকে সাজাইয়া দেওয়া হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের গলায় পুষ্পমাল্য এবং মুখে চন্দন ও ফুল দিয়া সাজানো হইল। রামবাবু নিজে খাটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইতে বলিলেন। আমরা পশ্চাতে সকলে নির্বাক হইয়া সিঁড়ির উপর দাঁড়াইলাম। বেঙ্গল ফটোগ্রাফার কোম্পানী দুইখানি গ্রুপ ফটো তুলিয়া লইলেন।

এদিকে ভিড় ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। তখন সৎকারের সকল দ্রব্য সংগ্রহ করা শেষ হইয়াছে। বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় কাশীপুর হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যদেহ সংকীর্তন করিতে করিতে বিপুল জনস্রোতের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হইতে লাগিল। খোল, করতাল ও কীর্তনের শব্দ চতুর্দিক মাতাইয়া তুলিল। ত্রিশূল, ওঁকার, খোন্তা, ক্রুশ, ক্রেসেণ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের প্রতীক (symbols) লইয়া শোভাযাত্রাসহ শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্যদেহ কাশীপুর শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল। শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ ও ভক্তগণ অশ্রুভারাক্রান্ত নেত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য-শরীরের সৎকার করিবার জন্য ঘৃত, চন্দন, কাষ্ঠ, মাল্য প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়াছিল। ক্রমে যথাবিহিতভাবে গঙ্গায় শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ধৌত ও মাল্যে সজ্জিত করিয়া চিতায় স্থাপন করা হইল। চিতার অগ্নি শত শত লিহা বিস্তার করিয়া ঊর্ধ্বে উত্থিত হইল। সেবক ও ভক্তগণ অগ্নিকুণ্ডে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। খোল, করতাল ও কীর্তনের মধুর ধ্বনিতে শ্মশানঘাট প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাহা এক অবর্ণনীয় অপরূপ দৃশ্য! শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্তান ও ভক্তগণ শেষবারের মতো শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যশরীর নিরীক্ষণ করিয়া শ্রদ্ধাচিত্তে প্রণাম করিল, কেহবা স্তব পাঠ করিতে লাগিল।

ক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্থিব শরীর ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। আমরা দুই তিনজন সেই ভস্মস্তূপের মধ্য হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র অস্থি সংগ্রহ করিয়া একটি তাম্রকলসে স্থাপন করিলাম এবং দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে কাশীপুরের বাগানে ফিরিয়া আসিলাম। সেই রাত্রে আমরা সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে অস্থি রাখিয়া তাঁহার পবিত্র জীবনী আলোচনা করিতে লাগিলাম এবং ধ্যান-জপে মনোনিবেশ করিয়া তাঁহার অদর্শনজনিত দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিলাম। নরেন্দ্রনাথ পুরোভাগে বসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অহৈতুকী বিচিত্র কৃপার কথা বলিয়া আমাদের কখনও কখনও সান্ত্বনা দিতে লাগিল। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা সকলেই তখন নিজেদের অসহায় বলিয়া ভাবিতে লাগিলাম এবং তাহার পর কি করিব কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না।

॥ মহাসমাধির পরে ॥

তখন সকলেই আমরা মনে করিতে লাগিলাম যে, কাশীপুর বাগানে থাকিতে পারিলেই আমাদের ভাল হয়। কিন্তু চিন্তা হইতে লাগিল, কাশীপুর বাগানের মালিকরা ভাড়া না পাইলে থাকিতেইবা দিবেন কেন! তারপর নিয়মিতভাবে ভাড়ার বন্দোবস্ত করিবেইবা কে! রামবাবু প্রভৃতি গৃহস্থ-ভক্তেরা বাগানের ভাড়া দিতেন। কিন্তু রামবাবু স্থির করিয়াছেন, সেই মাসের শেষ পর্যন্ত মাত্র ভাড়া দিবেন। অগত্যা আমরা রামবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—পরে আমরা যাইব কোথায়। রামবাবু আমাদের সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তোমরা যে যাহার ঘরে ফিরিয়া যাইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, অস্থি তাহা হইলে কোথায় রাখা হইবে। রামবাবু বলিলেন, কাঁকুড়-গাছিতে তাঁহার যোগোদ্যান, সেইখানেই শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থি সমাধি দেওয়া হইবে।

ইহা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ আমরা সকলে অত্যন্ত দুঃখিত

হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি-মন্দির পবিত্র গঙ্গার তীরে না হইয়া কাঁকুড়গাছিতে যোগোদ্যানে কিভাবে হইবে তাহা আমরা চিন্তা করিতে লাগিলাম। অবশেষে আমাদের চিন্তার কথা রামবাবুকেও জানাইলাম। রামবাবু কিন্তু কোন কথাই শুনিলেন না। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র অস্থি তাঁহার যোগোদ্যানেই সমাহিত করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি তাঁহার স্থিরসিদ্ধান্ত আমাদিগকে জানাইয়া সেই রাত্রেই বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

রাত্রি অধিক হইল। নরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ আমরা সকলেই নির্বাক হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থি-কলসের চতুর্দিকে বসিয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছি। এমন সময় নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) বলিল: 'আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের পূত অস্থি কিছুতেই রামবাবুকে দিব না।' আমরাও নিরঞ্জনের সহিত একমত হইলাম। নরেন্দ্রনাথ আমাদের নানা কথায় সান্ত্বনা দিয়া বলিল: 'তোমাদের যা অভিমত, আমারও তাই।' তখন আমরা সকলে স্থির কবিলাম শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র অস্থির বেশী অংশ কলস হইতে বাহির করিয়া একটি কৌটাতে রাখিয়া ঐ কৌটা বাগবাজারে ভক্ত বলরামবাবুর বাড়ীতে লুকাইয়া রাখা হউক এবং রামবাবু যেন ঘুনাক্ষরে সেই কথা কোন রকমে জানিতে না পারেন। পরে রামবাবু আসিলে বাকী অস্থি কলসী-সহ তাঁহাকে দেওয়া হইবে। আমাদের সিদ্ধান্তমত তাহাই করা হইল। সেই রাত্রে কলস হইতে প্রায় সমস্ত অস্থিই বাহির করিয়া একটি কৌটায় রাখা হইল এবং যৎসামান্য অস্থির গুঁড়া, ভস্ম ও গঙ্গামৃত্তিকা সেই তামার কলসীতে রাখিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর নরেন্দ্রনাথ বলিল: 'ছাখো, আমাদের শরীরই শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন্ত সমাধিস্থান। এসো, আমরা সকলে তাঁর পবিত্র দেহের ভস্ম একটু ক'রে খাই ও পবিত্র হই।' নরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম কলসী হইতে সামান্য অস্থির গুঁড়া ও ভস্ম গ্রহণ করিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া ভক্ষণ করিল। তাহার পর আমরা সকলেই তাহাকে অনুসরণ করিয়া নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিলাম।

৮ই ভাদ্র ১২৯৩, সাল (ইংরাজী ২৪শে আগষ্ট, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ)। সেইদিন রামবাবু কাশীপুরের বাগানে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থি-কলস কাঁকুড়গাছিতে যোগোদ্যানে লইয়া যাইবার জন্য মনস্থ করিলেন। তখন নরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ আমরা সকলেই তাহাতে সম্মত হইলাম। সেইদিন জন্মাষ্টমী। নরেন্দ্রনাথকে পুরোভাগে রাখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র অস্থি-কলস মস্তকে করিয়া আমরা সকলেই সংকীর্তন করিতে করিতে কাঁকুড়গাছি অভিমুখে যাত্রা করিলাম। রামবাবু আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাইতে লাগিলেন। শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) অস্থি-কলসটি সযত্নে মস্তকে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে আমাদের সহিত অগ্রসর হইল। অবশেষে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র অস্থি সমাধি দেওয়া হইল। সেইদিন রাত্রে আমরা সকলেই যোগোদ্যানে থাকিয়া গেলাম।

॥ শ্রীমার শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন ॥

শ্রীশ্রীঠাকুর যেইদিন মহাসমাধিতে মগ্ন হন (৩১শে শ্রাবণ, ১২৯৩), সেইদিন একটি আশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনে শ্রীমা প্রায় সংজ্ঞাহারা। তিনি আপনার ঘরে শোকাতুরা হইয়া সধবার চিহ্নস্বরূপ দুই হস্তের সোনার বালা ইত্যাদি খুলিয়া ফেলিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু ঘটনা ঘটিল অন্য রকম। শ্রীমা যখন হস্তের বালা ইত্যাদি খুলিতে উদ্যত হইলেন তখন তিনি চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর স্থূলশরীরে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে হস্তের বালা খুলিতে নিষেধ করিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমার দুইটি হস্ত ধরিয়া বলিলেন: 'আমি কি কোথাও গেছি গা? এই যেমন এ'ঘর থেকে ও'ঘর।' শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া এবং তাঁহার শ্রীমুখের অভয়বাণী শুনিয়াও হাতের বালা ও কপালের সিন্দুর সেই সঙ্গে মুছিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহা পারিলেন না। শ্রীমা ভালভাবেই বুঝিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্থিব শরীরই শুধু

নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু দিব্যশরীরে তিনি সর্বদাই বিদ্যমান আছেন। তখন হইতে তিনি যেমন লালপেড়ে কাপড় পরিতেন, তাহাই পরিতে লাগিলেন। তবে লাল নরুণ পেড়ে কাপড়ই তিনি পরিতে লাগিলেন।

অবশ্য শ্রীমা যে মাঝে মাঝে স্থূলশরীরে শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শন জন্য শোকাতুরা না হইতেন তাহা নহে। শ্রীমা যখন বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে বাস করিতেন তখন একদিন পুনরায় তিনি হাতের বালা খুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীমা আমাদের বলিয়াছিলেন যে, ঠিক সেইবারও করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর তখনও স্থূলশরীরে তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন: 'তুমি হাতের বালা খুলো না। শ্রীকৃষ্ণ যার পতি তার বিধবা হওয়া ভাগ্যে নাই। সে চিরসধবা।' শ্রীমা সেইবারও শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্বাসবাণী পাইয়া হাতের বালা খোলা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ঠিক এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল তৃতীয়বার। বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া শ্রীমা যখন আবার কামারপুকুরের বাড়ীতে কিছুদিন বাস করিবার জন্য গিয়াছিলেন শুনিয়াছি তখন বলিয়াছিলেন যে, লোকনিন্দার ভয়ে পুনরায় হাতের বালা খুলিয়া তিনি বিধবা সাজিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঠিক সেই সময়েও শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে স্থূলশরীরে দর্শন দান করিয়া হাতের বালা খুলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, তাহার পর হইতে শ্রীমা আর কোনদিনই কখনও হাতের বালা খুলিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি নিশ্চিতভাবে জানিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর ছায়ার মতো তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন।

[illegible] লাটু, তা[illegible] [illegible] শ্রীবৃন্দাবনের বনপরিক্রম [illegible]ন করিলাম ও শ্রীমার নিকট

[illegible] শ্রীশ্রীঠাকুরের নিক[illegible] হই[illegible] যে গৈরিক বস্ত্র পাইয়া- [illegible]াম তাহা সর্বদা পরিধান করিতা[illegible]। [illegible]ই টুকরা কৌপীন ও [illegible]ইখানি গেরুয়া-বহির্বাস এবং একটি [illegible] ছিল আমার পথের সঙ্গে কম্বল বা বিছানা কিছুই [illegible] না। টাকা-পয়সা

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ শ্রীমা-র বৃন্দাবনে যাত্রা ॥

১৫ই ভাদ্র ১২৯৩ সালে কলিকাতা হইতে শ্রীমা সন্ধ্যার ট্রেনে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। শ্রীমা ইচ্ছা করিয়াছিলেন বৃন্দাবনে গিয়া কিছুদিন বাস করিবেন। শ্রীমার সঙ্গে যোগেন, লাটু ও আমি রহিলাম। গোলাপ-মা, লক্ষ্মীমণি দিদি, শ্রীম-র স্ত্রী নিকুঞ্জদেবীও চলিলেন। প্রথমে সকলে দেওঘরে নামিয়া বৈদ্যনাথশিব দর্শনাদি করিয়া পরবর্তী গাড়ীতে কাশী যাত্রা করিলাম। কাশীধামে তিন দিবস বাস করিয়া শ্রীমা বিশ্বনাথদেবের আরতি ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমা বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্বনাথের মন্দির হইতে তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার ভাবাবস্থা হইয়াছিল।

কাশীধাম হইতে শ্রীমা-র সহিত আমরা সকলে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সেইখানে একদিন মাত্র বাস করিয়া পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। যোগীন-মা শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহরক্ষার কিছুদিন পরে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া বাস করিতেছিলেন। পথে রেলগাড়ীতে যাইবার সময়ে শ্রীমাকে শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন: 'ওগো, হাতে সোনার (শ্রীশ্রীঠাকুরের) ইষ্টকবচ অমন ক'রে রেখেছ কেন? ও [illegible] অনায়াসে খুলতে পারে।' তখন শ্রীমা-র তন্দ্রা ভঙ্গ করিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকু[illegible] কবচটি খুলিয়া টিনের বাক্সের মধ্যে বালা খুলিতে নিষেধ করিতেছেন। ([illegible]স্বামী শিবানন্দ বয়সে সকলের ধরিয়া বলিলেন: 'আমি কি কোথাও গেছি গা [illegible] বলিয়াই ডাকিত) থেকে ও'ঘর।' শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রত্যক্ষ দর্শন কা[illegible] তাঁহার শ্রীমুখের অভয়বাণী শুনিয়াও হাতের বালা ও কপালের সিন্দুর সেই সঙ্গে মুছিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহা পারিলেন না। শ্রীমা ভালভাবেই বুঝিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্থিব শরীরই শুধু

উঠিলাম। সেইখানে অবস্থান করিবার সময় একদিন শ্রীমা শ্রীরাধার বিরহভাবে আবিষ্ট হইলেন। শ্রীরাধা যেমন তাঁহার প্রাণবঁধুর বিরহে ব্যাকুল হইতেন, তেমনি শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরহে ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলাস্থল নিধুবনের সন্নিকটে রাধা-রমণের মন্দির, যমুনাপুলিন প্রভৃতি দর্শন করিতে করিতে প্রেমাশ্রু-ধারা বর্ষণ করিতেন এবং ঘন ঘন ভাবসমাধিতে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। সেই সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে আদেশ দিয়াছিলেন: 'যোগীনকে (যোগানন্দ) তুমি ইষ্টমন্ত্র দান করবে।' ক্রমাগত তিনদিন এইরূপ আদেশ লাভ করিয়া একদিন শ্রীমা পূজা করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া যোগীনকে মন্ত্র দান করিয়াছিলেন।

শ্রীমা সেই সময় বৃন্দাবনে এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি যোগীন-মা ও লক্ষ্মীদিদিকে সঙ্গে লইয়া একবার হরিদ্বার গিয়াছিলেন এবং সেইখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের নখ ও কেশের কিয়দংশ যাহা তাঁহার সঙ্গে ছিল তাহা ব্রহ্মকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া-ছিলেন। তাহার পর তাঁহারা জয়পুর এবং পুষ্করতীর্থও দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। পরে শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে অবশিষ্ট নখ ও কেশাদি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

॥ আমার বৃন্দাবন-পরিক্রমা ॥

আমি বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে উপস্থিত হইয়া [illegible]গেন, লাটু, তারক প্রভৃতিকে শ্রীমার নিকটে রাখিয়া একাকী শ্রীবৃন্দাবনের বনপরিক্রম করিবার জন্য বৈষ্ণবদিগের নিক[illegible]ন করিলাম ও শ্রীমার নিকট বিদায় লইলাম।

তখন [illegible] শ্রীশ্রীঠাকুরের নিক[illegible] হইতে যে গৈরিক বস্ত্র পাইয়া-[illegible]ম তাহা সর্বদা পরিধান করিতাম। দুই টুকরা কৌপীন ও [illegible]ইখানি গেরুয়া-বহির্বাস এবং একটি [illegible] ছিল আমার পথের [illegible]। সঙ্গে কম্বল বা বিছানা কিছুই [illegible] না। টাকা-পয়সা [illegible]

তখন স্পর্শ করিতাম না। দিবসে একবার চার-পাঁচ বাড়ীতে ব্রজবাসীদিগের নিকট হইতে 'নারায়ণ হরি' বলিয়া মাধুকরী করিয়া মড়ুয়ার রুটির টুকরা প্রভৃতি যাহা পাইতাম তাহাই অপরাহ্ণে উদরসাৎ করিয়া বৈরাগীদিগের সঙ্গে পদব্রজে পরিভ্রমণ করিতাম। রাত্রে গাছতলায় ব্রজের রজে অঞ্চল বিছাইয়া শয়ন করিতাম। নিদ্রাবসানে ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থান করিয়া বৈরাগী-বাবাজীদিগের সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিতাম। দ্বিপ্রহর পর্যন্ত চলিয়া কোন গ্রামে উপস্থিত হইলে স্নান করিয়া আবার মাধুকরী করিতে যাইতাম। আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার পরিভ্রমণ করিতাম। এইরূপে কয়েক দিবস কাটিতে লাগিল। কিন্তু বৈরাগী-বাবাজীরা আমার সহিত আলাপ করিতেন না, কারণ আমি গৈরিকবস্ত্র পরিধান করি। গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসীদিগের প্রতি তাঁহাদের অত্যন্ত বিদ্বেষভাব ছিল। তাঁহাদের ধারণা ছিল, সন্ন্যাসীরা সোঽহংবাদী জ্ঞানী এবং শ্রীকৃষ্ণকে মানে না, সুতরাং নাস্তিক। আমি বাবাজীদিগের মনের ভাবগতি বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতাম না এবং আপনভাবে মৌনীর মতো থাকিতাম। পথিমধ্যে তাঁহাদের নিকট জানিয়া লইতাম ইহা শ্রীকৃষ্ণের লীলার মধ্যে কোন্ স্থান ইত্যাদি। তাঁহারা যথাসাধ্য আমার সঙ্গ ত্যাগ করিতেন, কিন্তু আমি তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলিতাম এবং মাধুকরী করিবার সময় তাঁহাদেরই অনুসরণ করিতাম। তাঁহা[illegible] যে যে বাড়ীতে মাধুকরী করিত, আমি সেই সেই বাড়ী ছাড়া অন্য বাড়ী [illegible]ইতেও মাধুকরী করিয়া লইতাম।

একদিনের কথা। আমি [illegible] ভা[illegible] [illegible]ভোর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণানুকীর্তন করিতেছি ও শ্রী[illegible]ভা[illegible]বতের [illegible]
সুর করিয়া আবৃত্তি করি[illegible] [illegible]লিতেছি :
ভবান্। অখিলদেহিনাং [illegible]ন্তরাত্মদৃক্' ইত্যাদি—যাহ[illegible]
ছিল। দেখি বাবাজীর[illegible] আমার রাধাকৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দে[illegible]
আমাকে সম্বোধন ক[illegible]য়া বলিল : 'দেখিতেছি আপনি পরম-কৃষ্ণভক্ত

আমরা ইহা এতদিন জানিতে পারি নাই, সুতরাং আমরা অপরাধী, আমাদিগকে আপনি ক্ষমা করুন। আমরা আজ হইতে আপনার সেবা করিব। আপনাকে আর মাধুকরী করিতে যাইতে হইবে না। আমরা মাধুকরী লইয়া আসিব এবং আপনার সেবা হইলে আমরা ভোজন করিব।' সেইদিন হইতে সত্যই আমাকে আর মাধুকরী করিতে বাহিরে যাইতে হইত না। তাঁহারা আমার জন্য রুটি ভিক্ষা করিয়া আনিতেন। আমি ভিক্ষা করিতে উদ্যত হইলে বাবাজীরা বাধা দিতেন এবং বলিতেন: 'আপনার ন্যায় পরমভক্ত সাধু আমরা কোথায় পাইব! আমরা আপনার সেবা করিব এবং আপনি কৃপা করিয়া আমাদের সেবা গ্রহণ করুন এই প্রার্থনা।'

সেইদিন হইতে আমি প্রত্যহ বাবাজীদের সহিত মহানন্দে শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলগুলি দর্শন করিতে লাগিলাম এবং শ্রীকৃষ্ণের মহিমা উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। ক্রমে শ্রীবৃন্দাবন-পরিক্রমা আমার শেষ হইল। চৌরাশী ক্রোশ পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সকল লীলাস্থল আমার দর্শন করা সমাপ্ত হইল। অতঃপর আমি বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে ফিরিয়া আসিলাম ও শ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সকল কথা বিবৃত করিলাম। আমি যোগেন ও লাটুভাইদের সঙ্গে আনন্দে শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া গেলাম। কিন্তু তারকদাদাকে (স্বামী শিবানন্দকে) দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি কোথায়। যোগেন বলিল, 'বরাহনগরে সুরেশবাবু যে মঠ করিয়াছেন তিনি সেখানে গিয়াছেন।' বরাহনগরে মঠ-স্থাপনের কথা শুনিয়া আমার আনন্দের আর সীমা রহিল না।

॥ আমার কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন ॥

বরাহনগরে নূতন মঠ স্থাপিত হইয়াছে শুনিয়া সত্যই মনে অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল। আমি শ্রীমা, যোগেন ও লাটুভাইকে আমার বরাহনগর-মঠে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। শ্রীমা সানন্দে অনুমতি

দিলেন। আমি শ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া এবং গুরুভ্রাতা যোগেন ও লাটুভাইয়ের কাছ হইতে বিদায় লইয়া রেল-ষ্টেশনে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে যোগেনভাই বলিল : 'শ্রীমার আদেশ—তোমাকে মাষ্টার মহাশয়ের (শ্রীম-র) স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। মাষ্টার মহাশয় নাকি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন।' আমি যোগেনভাইয়ের কথা শুনিয়া তো মহাবিপদে পড়িলাম। কেননা, মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রীর মাথার একটু গোলমাল ছিল, আমি একা, সুতরাং সেই অবস্থায় কলিকাতা পর্যন্ত তাঁহাকে লইয়া যাওয়া মুস্কিলের কথা। যোগেনভাই বলিল ঃ 'মায়ের আদেশ।' মায়ের আদেশ অমান্য করা আমার সাধ্য কি! 'পথে নারী বিবর্জিতা' হইলেও আমি মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রীকে কলিকাতা পর্যন্ত সঙ্গে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলাম এবং পাগলিনীকে লইয়া আমি কলিকাতা যাত্রা করিলাম। ভাবিলাম—অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, তবে শ্রীমার আশীর্বাদে কিছুই ঘটিবে না।

আমি মথুরা-ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মথুরা-ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার ছিলেন বাঙ্গালী। শুনিয়াছিলাম তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্রলোক ও সহৃদয়। আমি তাঁহার নিকট গিয়া অনুরোধ করিলাম তিনি যাহাতে আমাকে কোনরকম সাহায্য করেন। তৃতীয় শ্রেণীতে বহু লোকের ভিড় হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং তিনি যদি একটি খালি কামরায় আমাদের দুইজনকে উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে ভাল হয়। ষ্টেশনমাষ্টারকে আমাদের সমস্ত অসুবিধার কথা বুঝাইয়া বলায় তিনি বুঝিলেন। তিনি গাড়ীর একটি চাবি আমার হাতে দিয়া বলিলেন : 'কোন বড় ষ্টেশনে ট্রেন পৌঁছুলেই আপনি আগে থেকে দরজা বন্ধ ক'রে তাতে চাবি দিয়ে দেবেন, তাহলেই আর কেউ উঠে বিশেষ ভিড় করতে পারবে না।' আমি ষ্টেশনমাষ্টারের সহৃদয়তার জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া নমস্কার করিলাম এবং মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া একটি প্রায় খালি কামরায় গিয়া

বসিলাম। ষ্টেশনমাষ্টার যেইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি সেই-ভাবেই ক্রমাগত দুইদিন গাড়ীতে অতিবাহিত করিয়া নিরাপদে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। রাস্তায় চিন্তা হইয়াছিল পাগলিনী কোন-কিছু না করিয়া বসে। কিন্তু শ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় পাগলিনী নিরুপদ্রবেই হাওড়া পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। আমিও আশ্বস্ত হইলাম এবং বুঝিলাম যে, সমস্তই শ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা। তাঁহাদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে তাঁহারা সমস্ত ভয় ও বিপদ হইতে সন্তানকে রক্ষা করেন।

আমি হাওড়া-ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া একটি ঘোড়ার গাড়ীতে মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রীকে বসাইয়া নিরাপদে তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিলাম।

॥ শ্রীমার কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন ॥

শ্রীবৃন্দাবনে এক বৎসর বাস করিয়া শ্রীমা যোগীন মহারাজ, লাটু, গোলাপ-মা ও যোগীন-মার সঙ্গে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং বাগবাজারের বলরামবাবুর বাটীতে কয়েকদিন থাকিয়া যোগীন মহারাজ গোলাপ-মার সঙ্গে কামারপুকুরে যাত্রা করিলেন। অর্থাভাবে শ্রীমাকে অনেক পথ পদব্রজে যাইতে হইয়াছিল এবং তিনি বেশ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। লাটু বরাহনগরের মঠে আসিয়া রহিল। শ্রীমাকে কামারপুকুরে রাখিয়া যোগীন মহারাজ কলিকাতায় ফিরিয়া বরাহনগর-মঠে আসিল এবং লাটু মহারাজের সহিত বিরজাহোম করিয়া শাস্ত্রবিধি-অনুসারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিল। আমি তাঁহাদিগকে বিরজাহোমের প্রেষমন্ত্রাদি শুনাইয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান এবং গঙ্গায় দণ্ড ভাসাইয়া সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধি সুসম্পন্ন করাইলাম। তাহাদের নাম হইল স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী অদ্ভুতানন্দ (স্বামী বিবেকানন্দ লাটুর নাম দিল অদ্ভুতানন্দ)। তাহার পর যোগীন মহারাজ সাধন-ভজন করিবার জন্য প্রয়াগে যাত্রা করিলেন।

॥ শ্রীমার পুনরায় তীর্থস্থানে গমন ॥

এইদিকে শ্রীমা প্রায় সাত-আট মাস কামারপুকুরে থাকিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং বেলুড়ে গঙ্গার ধারে রাজু গোমস্তার ভাড়াটিয়া বাড়ীতে কিছুদিন বাস করেন। পরে কলিকাতায় শ্রীম-র বাটীতে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ অনুযায়ী তিনি (১২৯৪ সালে মধুমাসে) বুড়ো গোপালের সঙ্গে তাঁহার গর্ভধারিণীর উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের জন্য গয়াধামে যাত্রা করেন। বিষ্ণুগয়া দর্শন করিয়া শ্রীমা বুড়ো-গোপালের (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) সঙ্গে বুদ্ধগয়া দেখিতে যান। বুদ্ধগয়ার মঠের অতুল ঐশ্বর্য দেখিয়া শ্রীমা তাঁহার সন্ন্যাসী সন্তানদের দুঃখ-কষ্ট দূরের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট এই বলিয়া ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যেন তাহাদের থাকিবার জন্য একটি সুন্দর মঠ গঠিত হয়। ভবিষ্যতে শ্রীমার প্রার্থনা সত্যই পূর্ণ হইয়াছিল এবং তাঁহারই প্রার্থনার ফলস্বরূপ বেলুড় মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীমাকেও বলিতে শুনিয়াছি —'শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায়ই বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল!'

গয়াধামে তাঁহার গর্ভধারিণী জননীর পিণ্ডদানকার্য শেষ করিয়া শ্রীমা আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন (১২৯৫ সালে কার্তিক মাসে) এবং বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়ীতে গোলাপ-মা ও যোগীন-মার সঙ্গে ছয় মাস বাস করিয়াছিলেন। তখন যোগীন তথা যোগানন্দ স্বামী শ্রীমার সেবা-শুশ্রূষা করিত। ঠিক সেই সময়ে আমি বরাহনগর-মঠে থাকিয়া তপস্যা করিতেছিলাম এবং আমার গুরুভ্রাতারা তখন আমার নাম দিয়াছিল 'কালী-তপস্বী'। আমি তখন অবসর সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার স্তোত্র রচনা করি। শ্রীমার স্তোত্র রচনা করিয়া আমি ঐ সময়েই শ্রীমাকে শুনাইয়াছিলাম এবং শ্রীমা শুনিয়া আনন্দে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন: 'তোমার মুখে সরস্বতী বসুক।' সেই সময়ে আমি শ্রীমার হস্ত হইতে জপের মালাও (রুদ্রাক্ষের) পাইয়াছিলাম।

শ্রীমা পুনরায় রাখাল মহারাজ (ব্রহ্মানন্দ), শরৎ (সারদানন্দ) ও যোগীনের (যোগানন্দ) সঙ্গে পুরীধামে গমন করেন এবং তথায় বলরামবাবুদের ক্ষেত্রবাসীর মঠে (১২৯৫ সালের অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত) বাস করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কোনদিন শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ-দর্শনে যান নাই বলিয়া শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি (ছবি) লইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথজীউকে দেখাইয়া ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া কিছুদিন বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ীতে ছিলেন ও পরে হুগলী-জেলায় আঁটপুরগ্রামে বাবুরাম মহারাজের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলাম আমি, যোগীন, নিরঞ্জন, তুলসী (নির্মলানন্দ) প্রভৃতি। আঁটপুরে এক সপ্তাহ থাকিয়া শ্রীমা আমাদের সকলকে লইয়া গরুর গাড়ীতে করিয়া তারকেশ্বর ও সেখান হইতে কামারপুকুরে যান। কামারপুকুরে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া জয়রামবাটী যাত্রা করেন। জয়রাম-বাটীতে ও পরে কামারপুকুরে প্রায় এক বৎসর বাস করিয়া ১২৯৬ সালের শেষভাগে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি কলিকাতায় শ্রীম-র (মাষ্টার মহাশয়) বাড়ীতে কয়েকদিন থাকিয়া বাগবাজারে বলরামবাবুর বাটীতে আসেন। তখন বলরামবাবু মৃত্যুশয্যায় শায়িত। ১২৯৭ সালে ১লা বৈশাখ বলরামবাবু দেহরক্ষা করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যধামে গমন করেন। সেই সময়ে আমি কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, বদরীনাথ প্রভৃতি পুণ্যতীর্থ দর্শন করিয়া কাশীধামে ফিরিয়া আসি। ইহার বিবরণ আমি পরে দিব। কিন্তু সেই সুদীর্ঘ পথভ্রমণের ফলে অসুস্থ হইয়া পড়ি। নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) ও বাবুরাম (প্রেমানন্দ) তখন কাশীধামে ছিল। নরেন্দ্রনাথ আমার অসুস্থ অবস্থা দেখিয়া বাবু-রামকে আমার সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল এবং কলিকাতায় তাহার সন্ন্যাসী-শিষ্য সদানন্দকে (গুপ্ত মহারাজ) আমার যথাযথ সেবা-শুশ্রূষা করিবার জন্য কাশীধামে পাঠাইয়া

দিল। আমি কিছুটা সুস্থ হইলে বাবুরাম মহারাজ কলিকাতায় চলিয়া গেল।

শ্রীমা (১২৯৭ সাল, জ্যৈষ্ঠ মাস) ঘুসুড়ির ভাড়াটিয়া বাটীতে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে নরেন্দ্রনাথ তাহার স্বভাব-সুন্দর কণ্ঠে শ্রীমাকে প্রায়ই গান শুনাইত। পরে সে শ্রীমার আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পশ্চিমদেশের তীর্থস্থানগুলি দর্শন ও তপস্যা করিবার জন্য বহির্গত হইল। ঘুসুড়ির বাড়ীতেই গিরিশবাবু সর্বপ্রথম শ্রীমার দর্শনলাভ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। ঐ বাড়ীতেই সাধু দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ও শ্রীমার পুণ্যদর্শন লাভ করেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

॥ বরাহনগর-মঠের সূচনা ॥

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে বরাহনগর-মঠের গোড়াপত্তন ও প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পর যখন আমরা কাশীপুরের বাগানে দিনকতকের জন্য ছিলাম তখন গৃহস্থ-ভক্তগণ নানা স্থান হইতে কাশীপুরের বাগানে প্রায়ই আসিতেন। সুরেশবাবুর (সুরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, যাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন 'সুরেন্দর' অর্থাৎ সুরেন্দ্র) চিন্তা হইল যে, কাশীপুরের বাগান ছাড়িয়া দিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিসপত্র থাকিবে কোথায় এবং তাঁহার সন্তানেরাই বা থাকিবে কিভাবে। রামবাবুর (রামচন্দ্র দত্ত) ইচ্ছা ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবক-সন্তানেরা যে যাহার বাড়ীতে গিয়া বাস করিবে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ আমরা কেহই তাহাতে সম্মত ছিলাম না। উদ্দেশ্য ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম লইয়া ও তাঁহার সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করিয়া ত্যাগের জীবনই অতিবাহিত করিব। সুরেশবাবুর তাই ইচ্ছা ছিল যে, সেবক-সন্তানেরা একসঙ্গে কোন মঠে থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবে ও আদর্শে জীবনযাপন করিবে। তাহার জন্য তিনি একটি বাড়ীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বরাহনগরনিবাসী ভবনাথ (শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহস্থ-ভক্ত এবং সে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ প্রিয় ছিল) সুরেশবাবুর অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া বরাহনগর বাজারের নিকট প্রামাণিক ঘাট-রোডে অবস্থিত ভুবন দত্তের একটি জীর্ণ বাড়ী মাসিক ১০৲ টাকায় ভাড়া করিল। ভুবন দত্তের বাড়ীটি ছিল আসলে টাকীর জমিদার মুন্সীবাবুদের। ঐ বাড়ীটি জীর্ণ ও পরিত্যক্ত ছিল। এইজন্য বাড়ীটিকে সকলে 'পোড়োবাড়ী' বলিত। ঐ জীর্ণ পোড়োবাড়ীতে ছয়খানি মাত্র ঘর ছিল। সুরেশবাবু তাহাই ভাড়া করিলেন এবং তিনি মাসে মাসে ঐ ১০৲ টাকা[১] দিতে সম্মত হইলেন।

১। অনেকের মতে মাসিক ১১৲ টাকা ভাড়ায় ছয়খানি ঘর ভাড়া লওয়া হইয়াছিল।

গোপালদাদা, লাটু প্রভৃতির নিজেদের গৃহ না থাকায় প্রথমে বরাহনগর-মঠের নূতন ভাড়া-বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিল। তারক-দাদাও সেই মঠে থাকিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ, শরৎ, শশী প্রভৃতি তখন নিজেদের বাড়ীতে থাকিত এবং মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাদের সহিত বরাহনগর-মঠে বাস করিত এবং পরমহংসদেবের পূত চরিত্র ও উপদেশ লইয়া রাত্রে সমবেতভাবে আলোচনা করিত।

॥ বরাহনগর-মঠে সকলের আগমন ॥

একদিন নরেন্দ্রনাথ আসিয়া হুট্‌কো-গোপাল ও আমাকে সঙ্গে লইয়া শরতের (সারদানন্দ) বাড়ী যাইতে চাহিল। আমরা তাহাই করিলাম। শরতের বাড়ীতে যাইয়া তাহাকে বরাহনগর-মঠে স্থায়ীভাবে যাইয়া থাকিতে বলিলাম। শরৎ আমাদের সহিত যাইতে সম্মত হইল। শশীও (রামকৃষ্ণানন্দ) সেই বাড়ীতে থাকিত। তাহার সহিত দেখা করিয়া তাহাকেও আমাদের সহিত যাইয়া বরাহনগর-মঠে অন্তত সেই-দিন থাকিতে বলিলাম। শশী সম্মত হইল। সুতরাং শরৎ ও শশীকে লইয়া নরেন্দ্রনাথ, হুট্‌কো-গোপাল ও আমি বরাহনগর-মঠে উপস্থিত হইলাম। শরৎ ও শশী সেইদিন মঠে থাকিয়া গেল। নরেন্দ্রনাথও সেইদিন রাত্রে বরাহনগর-মঠে থাকিয়া গেল। শশী কিন্তু আর বাড়ীতে ফিরিতে চাহিল না, সে আমাদের সহিতই মঠে থাকিয়া গেল। শরৎ সেইদিন বাড়ীতে ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু সামান্য কয়দিন পরেই বাড়ী ছাড়িয়া আমাদের সহিত বরাহনগর-মঠে একেবারে থাকিয়া গেল। ক্রমে নরেন্দ্রনাথ, যোগীন, নিরঞ্জন, রাখাল প্রভৃতিও বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়া আমাদের সহিত একেবারে বরাহনগর-মঠে বাস করিতে লাগিল। তখন আমাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না! পরে বুঝিয়াছিলাম যে, আমাদের ভবিষ্যৎ সংঘ-জীবনের সংগঠন বরাহনগর-মঠ হইতেই সুরু হইয়াছিল। আমাদের সকলেরই মনে ছিল যে, মহাসমাধির পূর্বে একদিন রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কাছে

ডাকিয়া বলিয়াছিলেন : 'তুই ছেলেদের একত্রে রাখিস্ ও দ্যাখাশোনা করিস্।' আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই নির্দেশ স্মরণ করিয়া নরেন্দ্রনাথকেই সকলের প্রধান করিয়া তাঁহার নির্দেশ অনুসারে চলিতাম এবং মঠে নিয়মিতভাবে ধ্যান-ধারণা, পূজা-পাঠ, কীর্তনাদি করিয়া দিন অতিবাহিত করিতাম। প্রকৃতপক্ষে নরেন্দ্রনাথই ছিল আমাদের সকল সময়ের আশা-ভরসা ও সুখ-সান্ত্বনার স্থল। তখন সকলের জীবন অতিশয় দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইলেও একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরকে জীবনে সহায়-সম্বল করিয়া মনের আনন্দেই দিন যাপন করিতাম। অবশ্য খাওয়া-পরার তখন অত্যন্ত কষ্ট ছিল। তারকদাদা, আমি, লাটু, গোপালদাদা প্রভৃতি সকলে ভিক্ষায় বাহির হইয়া সামান্যভাবে যে চাউল প্রভৃতি পাইতাম তাহাই পালা করিয়া রান্না করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতাম। কোন কোনদিন কোনরূপ শাকসব্‌জী না পাইয়া তেলাকুচার পাতা আনিয়া সিদ্ধ করিতাম ও তাহা দিয়া ভাত খাইতাম। অবশ্য আমাদের আহার একবেলাই জুটিত। সকলের পরনে কাপড় ছিল না। একখানি কাপড় ছিঁড়িয়া তাহাতেই কৌপীন করিয়া আমরা পরিতাম এবং আর একখানি মাত্র কাপড় রাখিয়া দিতাম, কেহ কোথাও গেলে সেইখানি পরিয়াই বাহির হইত। সেইসব দিনের কথা মনে হইলে আজও আনন্দে মন ভরিয়া ওঠে!

এইখানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, একটি নির্দিষ্ট ঠাকুরঘরের কথা তখন আমরা প্রায়ই চিন্তা করিতাম। সুরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও সেইকথা আমাদের বলিতেন। অবশ্য বরাহনগর-মঠ ভাড়া করা হইলে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যবহৃত বিছানা, পাদুকা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি কাশীপুরের বাগান হইতে আনিয়া নূতন বরাহনগর-মঠেই রাখিয়াছিলাম। ছোট-গোপাল ও গোপালদাদাই একটি গাড়ী করিয়া ঐ সকল খাট-বিছানা ও অন্যান্য দ্রব্য লইয়া আসিল এবং সুন্দরভাবে একটি ঘরে সাজাইয়া রাখিল। ঐ ঘরটিকেই আমরা ঠাকুরঘর

মনে করিতাম এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বিছানার সম্মুখে বসিয়া ধ্যান-ধারণা ও কীর্তনাদি করিতাম। সুরেশচন্দ্র মিত্র, বলরাম বসু ও অন্যান্য গৃহস্থ-ভক্তগণ মধ্যে মধ্যে বরাহনগর-মঠে আসিয়া আমাদের সহিত কিছুক্ষণ থাকিতেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের অমিয়-কথা আলোচনা ও কীর্তন করিতেন।

ক্রমে শশী (রামকৃষ্ণানন্দ) আসিয়া যে ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের খাট, বিছানা, পাদুকা ও অন্যান্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ছিল সেইখানে সেইগুলি আরও ভালভাবে সাজাইয়া-গুছাইয়া রাখিল এবং খাটের উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো স্থাপন করিয়া নিয়মিতভাবে নিত্যপূজা, আরাত্রিক ও স্তবপাঠাদি করিতে আরম্ভ করিল। স্তবপাঠ ও কীর্তনের সময়ে আমরা ও অন্যান্য সকলে যোগদান করিতাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবদ্দশায় আমরা যেইরূপ তাঁহাকে সেবা-শুশ্রূষাদি করিতাম, শশী (রামকৃষ্ণানন্দ) ঐ নির্দিষ্ট ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোর সামনে সেইরূপই করিতে লাগিল। আমরা ভিক্ষা ও রন্ধন করিয়া অগ্রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভোগ দিতাম ও পরে আনন্দে সকলে একত্রে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতাম। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের সময়ে আমরা সকলে 'জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব' এই নাম করিতাম এবং আরাত্রিকের পর 'গুরুগীতা' হইতে শ্লোক পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতাম।

এই সময়ে আমি বাহিরের একটি ঘরে শুইতাম এবং রাত্রে অধিকাংশ সময়েই ধ্যানে কাটাইতাম। লাটুও তাহা করিত। আমি যখন ধ্যান করিতাম না তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন স্তোত্র রচনা করিতাম এবং উপনিষৎ, গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতাম। রাত্রে শবাসন করিয়া শুইয়া ধ্যান করিতাম। সমস্ত রাত্রি কোথা দিয়া কাটিয়া যাইত তাহা বুঝিতে পারিতাম না। আমার সংস্কৃতে স্তোত্র-রচনার প্রথম স্তোত্রটি ছিল অনুষ্টুপছন্দে "লোকনাথশ্চিদাকার" ইত্যাদি। বরাহনগর-মঠে আরাত্রিকের পর আমরা সকলে মিলিয়া ঐ স্তোত্রের কতিপয় শ্লোক পাঠ করিতাম।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ আমাদের শাস্ত্রমতে সন্ন্যাস গ্রহণ ॥

একদিন নরেন্দ্রনাথ আমাদের সকলকে বলিল : 'আমরা শাস্ত্রবিধান-অনুসারে যদি এবার সন্ন্যাস নিই, তাতে তোমাদের অভিমত কি ?' আমি বলিলাম : 'হ্যাঁ, শাস্ত্রমতে সন্ন্যাস নিতে গেলে আমাদের সকলকে বিরজাহোম করতে হবে। বিরজাহোমের মন্ত্র আমার কাছে আছে।' নরেন্দ্রনাথ শুনিয়া একান্ত আগ্রহের সহিত বলিল : 'তুমি বিরজাহোমের মন্ত্র কিভাবে পেলে ?' আমি তখন বরাবরপাহাড়ে যাইবার সময়ে যেইভাকে একজন দশনামী সন্ন্যাসীর নিকট হইতে মঠ, মড়ি, প্রেষমন্ত্রাদি বিরজাহোমের মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া একটি খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলাম তাহা আনুপূর্বিক বলিলাম। নরেন্দ্রনাথ শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিল : 'সমস্তই শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ও কৃপা ! তাহলে এসো একদিন পূজা হোমাদি ক'রে বিরজাহোমের অনুষ্ঠান করি ও শাস্ত্রীয় মতে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হই।'

আমরা সকলে সানন্দে সম্মত হইলাম। দিনও স্থির হইল : যতদূর মনে আছে, ১৯২৩ সালের মাঘ মাসের গোড়ার দিকে একদিন প্রাতঃকালে সকলে গঙ্গায় স্নান করিয়া বরাহনগর-মঠে ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র পাদুকার সম্মুখে উপবেশন করিলাম। শশী (রামকৃষ্ণানন্দ) বিধিমত শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা সমাপ্ত করিল। হোমের জন্য কিছু বিল্বকাষ্ঠ, বারোটি বিল্বদণ্ড ও গব্যঘৃত সংগ্রহ করা হইয়াছিল। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইল। নরেন্দ্রনাথের আদেশে আমি তন্ত্রধারক-রূপে আমার খাতা হইতে সন্ন্যাসের প্রেষমন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলাম। প্রথমে নরেন্দ্রনাথ ও পরে রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, সারদা, লাটু প্রভৃতি সকলে আমার পাঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রেষমন্ত্র পড়িতে পড়িতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দান করিল। পরে আমি নিজেই

প্রেষমন্ত্র পড়িয়া অগ্নিতে আহুতি দিলাম। অবশ্য সন্ন্যাসদীক্ষা আমরা পূর্বেই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটে পাইয়াছিলাম। পূর্বে গোপালদাদা-কর্তৃক গঙ্গাসাগর মেলায় আগত সাধুদের উদ্দেশ্যে দান করার জন্য বারোখানি গৈরিক বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। তবে শাস্ত্রবিধি-অনুসারে সন্ন্যাসানুষ্ঠান আমাদের বরাহনগরের মঠেই হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথ নিজের নাম লইল 'বিবিদিষানন্দ' এবং রাখাল, বাবুরাম, শশী, শরৎ প্রভৃতির নিজেদের স্বভাবানুযায়ী নাম রাখিল ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি। পূর্বেই বলিয়াছি, আমি বরাহনগর-মঠের একটি ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া দিবারাত্র ধ্যান করিতাম, বেদান্তদর্শন পড়িয়া বিচার করিতাম ও অদ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়া সকলের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতাম বলিয়া সকলে আমার নাম রাখিয়াছিল 'কালী-বেদান্তী'। তীব্র তপস্যার জন্য অনেকে 'কালী-তপস্বী' নামেও আমাকে অভিহিত করিত। সুতরাং অভেদজ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ ও চরমজ্ঞান বলিয়া মানিতাম বলিয়া নরেন্দ্রনাথ আমার নাম রাখিল 'অভেদানন্দ'। শশী অহোরাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের পূজা ও সেবাদি লইয়া থাকিত বলিয়া নরেন্দ্রনাথ তাহার নাম রাখিল 'রামকৃষ্ণানন্দ'। লাটু ও যোগীন পরে সন্ন্যাস লইয়াছিল। লাটু দিবারাত্র ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিত। তাহার নাম হইয়াছিল 'অদ্ভুতানন্দ'। তারকদাদা (শিবানন্দ) তখন একটি লেঙটি পরিয়া শবাসনে শুইয়া প্রায়ই ধ্যান করিত। আমাদের বিরজাহোমের সময়ে প্রথমে সে যোগদান করে নাই। আমরা তাহাকে হোমে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহার মত ফিরিল না। অবশ্য পরে সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিল।

পরে গঙ্গায় গিয়া আমরা দণ্ড ভাসাইলাম। সেই অবধি আমাদের পূজা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে আর অধিকার রহিল না। আমরা তখন

শাস্ত্রানুযায়ী 'পরমহংস' হইলাম। কিন্তু শশী (রামকৃষ্ণানন্দ) পরমহংস হইয়াও ভক্তিমার্গ অনুসরণ করিয়া নিত্য গুরুপূজা, ভোগ, আরাত্রিক করিয়া যাইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রমতে সন্ন্যাসগ্রহণের পর গোড়ার দিকে ঠিক এই ধরনের নিত্যপূজা সমর্থন করিত না, তাহাতে শশীর সঙ্গে তাহার মাঝে মাঝে বাদানুবাদও হইত। ঘটনা ঘটিল যে, একদিন যখন নরেন্দ্রনাথ শশীর নিত্যপূজার বিরুদ্ধে খুব জোর করিয়া বলিতে লাগিল তখন শশী বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মাথার চুল মুঠো করিয়া ধরিয়া তাহাকে ঠাকুরঘর হইতে বাহির করিয়া দিল। আমরা দেখিয়া অবাক্ হইলাম। যাহাহউক বিরজাহোম করিয়া সন্ন্যাস লইলেও শ্রীশ্রীঠাকুরই শশীর ধ্যান-জ্ঞান ছিল। সে ভাবাবেগেই ঐরূপ করিয়া ফেলিয়াছিল। শশীও তাহা পরে বুঝিয়াছিল এবং নিজের কাজের জন্য অনুতপ্ত ও দুঃখিত হইয়া নরেন্দ্রনাথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ সর্বদাই হাস্যবদন। সে তো শশীকে ক্ষমা করিলই, কিন্তু শশীর সেই আচরণে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া শ্রীগুরুর প্রতি শশীর পরমনিষ্ঠার জন্য সহাস্যে অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিল।

॥ আমার বাদ্যশিক্ষা ॥

প্রসঙ্গক্রমে এইখানে উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, সেই সময়ে (বরাহনগর-মঠে থাকাকালীন) নরেন্দ্রনাথ যখন ধ্রুপদ গান করিত তখন তাহার সহিত পাখোয়াজ বাজাইবার কোন লোক পাওয়া যাইত না। গোপালদাদা বাঁয়া-তবল বাজাইতে পারিত, সুতরাং নরেন্দ্রনাথ যখন খেয়াল, ঠুংরী ও ভজনাদি গান করিত তখন গোপালদাদা তাহার গানের সহিত ঠেকা দিত। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের ধ্রুপদগানের সহিত পাখোয়াজ সঙ্গতের অভাব অনুভব করিয়া আমার পাখোয়াজ শিক্ষা করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। আমি তখনকার কলকাতায় প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী গোপাল মল্লিকের নিকট গিয়া

তাঁহাকে আমার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তিনি সানন্দে পাখোয়াজ শিক্ষা দিতে সম্মত হইলেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে পাখোয়াজের বোল ও পরণ খাতায় লিখিয়া আনিয়া প্রত্যহ কিছুক্ষণ অভ্যাস করিতাম। আমার তালজ্ঞান বেশ পাকা ছিল। নরেন্দ্রনাথও সেইজন্য আমার সুখ্যাতি করিত। আমি কয়েকদিনের মধ্যে পাখোয়াজশিক্ষায় বেশ অধিকার লাভ করিলাম। অবশ্য কিছুদিন গোপাল মল্লিকের এক শিষ্যের নিকট হইতেও পাখোয়াজ শিক্ষা করিয়াছিলাম। আমার শিক্ষার পর নরেন্দ্রনাথ যখনই ধ্রুপদ গান গাহিত, তখন আমি তাহার গানের সহিত বাজাইতাম।

একবার রামবাবুর বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথের ধ্রুপদগানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। রামবাবু প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী গোপাল মল্লিককে নরেন্দ্রনাথের গানের সহিত বাজাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেইদিন আমিও নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রামবাবুর বাড়ীতে গিয়াছিলাম। নরেন্দ্রনাথ গান আরম্ভ করিল এবং গোপাল মল্লিক মহাশয় অপূর্ব ছন্দে পাখোয়াজ বাজাইতে লাগিলেন। গোপাল মল্লিকের উস্তাদি বাজনার সঙ্গে পাছে গানের তাল কাটিয়া যায় বলিয়া নরেন্দ্রনাথ আমাকে হাতে চৌতাল ও ধামারের তাল রাখিতে বলিল। সেইদিন নরেন্দ্রনাথের গান কী যে অনবদ্য হইয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

মাঝে মাঝে কলিকাতায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও বলরাম বসুর বাড়ীতেও নরেন্দ্রাথের ধ্রুপদগানের ব্যবস্থা হইত। আমি নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহাদিগের আতিথ্য স্বীকার করিতাম। কখনও কখনও রাত্রিতেও আমরা থাকিয়া যাইতাম। এইখানে বলা বাহুল্য যে, আমি গোপালদাদার নিকট হইতে তবলের বোল এবং পরণও কিছু শিক্ষা করিয়াছিলাম ও দিনকতক নিয়মিতভাবে তবল শিক্ষা অভ্যাস করিতাম। কীর্তনের সঙ্গে বাজাইবার জন্য কিছু কিছু খোলবাদ্যও শিক্ষা করিয়াছিলাম।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ পুরীধাম-অভিমুখে ॥

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। এই বৎসরেও শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথ প্রায় তিন ঘণ্টা ধরিয়া ধ্রুপদ-ভজনাদি গান করিয়াছিল। তবে বাড়ীর ভাগ-বাঁটোয়ারা (partition) লইয়া মাম্‌লা চলিতেছিল বলিয়া বিশেষ ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন ছিল।

এই বৎসরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের পর আমি শরৎ (সারদানন্দ) ও বাবুরামের (প্রেমানন্দ) সহিত পুরীধামে যাত্রা করিলাম। তখন জাহাজ চাঁদবালি (?) পর্যন্ত যাইত এবং সেইখান হইতে গরুর গাড়ী করিয়া কটকে যাইতে হইত; আমরা তাহাই করিলাম। বলরামবাবুর ভাই হরিবল্লভবাবু ও নিমাইবাবুর সহিত কটকে আমাদের সাক্ষাৎ হইল। আমরা পুরীতে যাইতেছি শুনিয়া হরিবল্লভবাবু পুরীর আচারী-এমার-মঠের মোহান্তকে এক পত্র দেন। তাহার জন্য আমরা পুরীতে থাকিবার স্থান পাই। আমরা পুরীতে এমার মঠে ছয় মাস ছিলাম। ঐ বৎসর (১৮৮৭ খ্রীঃ) পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ নির্মাণ করা দেখিলাম, রথ টানিলাম, আবার রথ-ভাঙাও দেখিলাম।

পুরীতে আমরা তিনজনে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ পাইতাম এবং ধ্যান-জপ করিয়া সমস্ত দিন অতিবাহিত করিতাম। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের প্রসাদ পাইয়া কোন-কোনদিন সমুদ্রের তীরে বালির উপর যে ছোট ছোট (মন্দিরের ন্যায়) গোফা বা বৈষ্ণবসাধুদের তপস্যার আসন ছিল তাহাদের কোন-কোনটিতে আমি একাকী বসিয়া সমস্ত বৈকাল ধ্যানে অতিবাহিত করিতাম। সমুদ্রে স্নান করিতাম ও স্নানের সময় জেলেরা কীভাবে নানা প্রকার মৎস্য ধরিত তাহা দেখিয়া আনন্দ

অনুভব করিতাম। একদিন শরতের ও আমার সমুদ্রের মৎস্যের কিরূপ স্বাদ তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল এবং সেই ইচ্ছা কিরূপে কার্যে পরিণত করা যায় তাহা লইয়া দুইজনের মধ্যে মন্ত্রণাও চলিতে লাগিল।

বাবুরাম নিরামিষাশী ছিল, সুতরাং ভাবিয়াছিলাম তাহাকে কিছু বলিব না, কিন্তু আমাদের অভিসন্ধি সে পরে জানিয়া ফেলিল। তবে আমাদের ইচ্ছায় সে কোন বাধা দিল না। আমরা একটি নির্জন স্থানের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম এবং অবশেষে তাহা পাওয়া গেল। আমি, শরৎ ও বাবুরাম একদিন সমুদ্রের ধার দিয়া কোণার্কের দিকে যাইতে যাইতে একটি প্রাচীন পোড়োবাড়ীর দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিলাম। ভাঙা-দেওয়ালের আড়ালে বেশ একটি নির্জন স্থান ছিল। আমরা সেইখানে একটি মাটির হাঁড়িতে মৎস্য ভাজিয়া খাওয়ার ইচ্ছা মিটাইব স্থির করিলাম। পুরীর সমুদ্র-তীরে জেলেদের নিকট হইতে পূর্বেই আমি ও শরৎ কিছু মৎস্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম এবং হাঁড়িতে করিয়া তাহা লইয়া আসিয়াছিলাম। দেয়াশালাই আমাদের সঙ্গেই ছিল। এদিক ওদিক হইতে কিছু শুক্‌না-পাতা ও গাছপালা সংগ্রহ করিয়া সেই হাঁড়িতে মৎস্য ভাজিলাম। বাবুরাম গ্রহণ করিল না। আমি ও শরৎ কিছুটা মৎস্য একবার মুখে দিলাম। দেখিলাম—সুস্বাদু ও তৈলবিশিষ্ট, কিন্তু ইলিশ-মৎস্যের ন্যায় তীব্র আসৃটেগন্ধযুক্ত। আমাদের সমুদ্রের মৎস্য খাওয়ার ইচ্ছা সেইখানেই শেষ হইল।

ইহার পর একদিন তিনজনে একটি গরুর গাড়ী করিয়া চিল্কাহ্রদে বেড়াইতে গেলাম। চিল্কার দুই তীরে বালুর স্তূপ হইয়া মরুভূমির ন্যায় দেখাইতেছিল। সেইখানে দূরে যেন মরীচিকার মতো এক দৃশ্যও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। আমরা দেখিয়াছিলাম, দূরে যেন জলাশয় ও গাছের ছায়া রহিয়াছে, কিন্তু নিকটে গিয়া দেখি তাহা কেবলই বালুকারাশি।

পুরীধামে আমাদের ছয় মাস অতিবাহিত হইল। ইতিমধ্যে বাবুরাম

(প্রেমানন্দ) টাইফয়েড্ অসুখে আক্রান্ত হইল। শরৎ ও আমি বিশেষ চিন্তিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। দিবা-রাত্র সেবা করিবার পর বাবুরাম সুস্থ হইল। পরে একদিন আবার শরতের (সারদানন্দের) রক্তামাশয় দেখা দিল। সেও সুস্থ হইলে আমরা পুরীধাম ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলাম।

॥ খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি-অভিমুখে ॥

পুরী হইতে আমরা ভুবনেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ভুবনেশ্বরে এক পাণ্ডার বাড়ীতে কয়েকদিন থাকিবার পর আমাদের খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির বৌদ্ধগুহাগুলি দেখার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। সুতরাং ভুবনেশ্বর হইতে পদব্রজে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির 'দিকে রওয়না হইলাম। মাঝে বেশ জঙ্গল ছিল। আমরা একজন উড়িষ্যাবাসী গাইড (প্রদর্শক) লইয়া চলিতে লাগিলাম। উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির পাদদেশে উপস্থিত হইয়া প্রথমে খণ্ডগিরি ও পরে তাহার পার্শ্বে উদয়গিরির পাহাড়ের পথে উঠিয়া গুহাগুলি দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলাম। বৌদ্ধযুগের গৌরবময় কীর্তি ভগ্নপ্রায় হইলেও তখনও তাহা অতীত দিনের ইতিহাসের সাক্ষ্য দিতেছিল। হস্তিগুহা, সর্পগুহা প্রভৃতি গুহাগুলিতে বৌদ্ধশ্রমণেরা নির্বিঘ্নে অবস্থান করিয়া ধ্যান-ধারণা ও শাস্ত্র পঠন-পাঠন করিতেন। পর্বতের গাত্রে পালিভাষায় উৎকীর্ণ সম্রাট অশোকের লিপিমালা দেখিলাম। কিছু কিছু লিপি আমরা পড়িতেও পারিলাম। আমাদের সহিত যে গাইড ছিল, সে বলিল, কোন কোন গুহায় এখনও কোন কোন বৌদ্ধসাধু থাকেন, কিন্তু আমরা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোন সাধু বা বৌদ্ধশ্রমণের সন্ধান পাইলাম না।

তখন গাইড বলিল, পাহাড়ের উপর গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি গুহায় একজন সাধু থাকেন। ইহা শুনিয়া ঐ গুহার নিকট যাইবার জন্য আমাদের কৌতূহল হইল। বাবুরাম যাইতে চাহিল না, সে সেইখানেই

অপেক্ষা করিতে লাগিল। আমি ও শরৎ গাইডকে লইয়া রওয়না হইলাম এবং পাহাড়ের চারিদিকে জঙ্গলের মধ্যে খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ একটি বৃহৎ গুহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গুহার মধ্যে প্রবেশ করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। কিন্তু যখনই আমরা গুহার দ্বারদেশে গিয়া উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম—বালুর উপর মনুষ্যের পরিবর্তে ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম এবং কিছুটা পিছু হটিয়া আসিলাম। এমন সময়ে দেখি, দূরে একটি পাহাড়ী বালক একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর হইতে তুলিয়া একটি গাছের পাতায় কোন-কিছু সংগ্রহ করিতেছিল। আমরা ধীরে ধীরে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখি, সে পাথরের উপর হইতে জমাটবাঁধা দুগ্ধ খুঁটিয়া খুঁটিয়া একটি পাতায় সঞ্চয় করিতেছে। জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল তাহা বাঘিনীর দুগ্ধ। বাঘিনীর দুগ্ধে ঔষধ হয় বলিয়া সে তাহা সংগ্রহ করিতেছিল। আমরা যে গুহাটির মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছিলাম, বালকটি বলিল, ঐ গুহার মধ্যে একটি বাঘ ও একটি বাঘিনী থাকে। বাঘিনী সন্তান প্রসব করিয়াছে। এই পাথরের উপর শুইয়া বাঘিনী তাহার সন্তানদিগকে স্তন্য পান করায় এবং তাহার স্তন হইতেই এইস্থানে দুগ্ধ পড়িয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। সে দূর হইতে বাঘিনীকে তাহার সন্তানদের দুগ্ধ পান করাইতে বহুদিন দেখিয়াছে। সেইজন্য জমাট-দুগ্ধ দেখিয়া সে তাহা সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিল।

আমরা কৌতূহলী হইয়া বাঘিনীর দুগ্ধের আস্বাদ লইবার জন্য তাহাকে উহার সামান্য-কিছু দিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। সে সামান্য একটু জমাট-দুগ্ধ হাতে দিলে আমি ও শরৎ তাহা মুখে দিয়া দেখিলাম তাহাতে বাঘিনীর শরীরের তীব্র গন্ধ রহিয়াছে। আমরা বাবুরামকে দেখাইবার জন্য একটু জমাট-দুগ্ধ একটি পাতায় করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে সেই স্থান ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলাম। কিছুটা নীচে নামিয়া দেখিলাম, বাবুরাম উৎকণ্ঠিত চিত্তে আমাদের

জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমাদের আসিতে দেখিয়া সে আশ্বস্ত হইল এবং সেই দুগ্ধের গুঁড়া দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইল। তাহারপর আমরা গাইডের সহিত তিনজনে পদব্রজে নির্বিঘ্নে ভুবনেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

পরদিন ভুবনেশ্বর হইতে গরুর গাড়ী করিয়া কটকের পথে রওয়না হইলাম। পথে আমি রান্না করিতাম। কোঠারে বলরামবাবুর ভাই নিমাইবাবু থাকিতেন। আমরা কোঠারে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাহার পর কটক হইয়া কলিকাতা-অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ইংরাজী ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনাও এইখানে উল্লেখ করা দরকার। এই সময়ে যোগেন (যোগানন্দ) এলাহাবাদে গিয়া দিনকতকের জন্য ডাক্তার গোবিন্দচন্দ্র বসুর বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিল। সেইখানে কিছুদিন থাকিবার পর সে বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়। গোবিন্দবাবু বরাহনগর-মঠে সেই সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ অনতিবিলম্বে মহাপুরুষ (শিবানন্দ), নিরঞ্জন ও আমাকে সঙ্গে লইয়া এলাহাবাদে ডাক্তার গোবিন্দবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। যোগেন তখনও অসুস্থ। সে আমাদের দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ ও আমরা তিনজন তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে সুস্থ করিলাম এবং আরও একটু সুস্থ হইলে তাহাকে লইয়া বরাহনগর-মঠ অভিমুখে রওয়না হইলাম।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ কামারপুকুর যাত্রা ॥

১৮৮৮—১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। ১২ই জানুয়ারী (১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ, ২৯শে পৌষ) শ্রীমা পুরীধাম হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া 'নগা' নামক একজন ভক্তের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। এই সময়ে তিনি কালীঘাটে যাইয়া কালীদেবীকে দর্শন করেন। ইহার পর শ্রীমা কামারপুকুর হইয়া জয়রামবাটী যাইতে মনস্থ করেন। শ্রীমা জয়রামবাটীর পথে বাবুরামের (প্রেমানন্দ) জন্মস্থান (আঁটপুর হুগলী) যাইতেও সঙ্কল্প করিলেন। তদনুসারে ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৮৮৯ খ্রীঃ) শ্রীমা কলিকাতা হইতে প্রথমে আঁটপুরের দিকে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে চলিল গোলাপ-মা, নরেন্দ্রনাথ, নিরঞ্জন, শরৎ, যোগেন, বাবুরাম, আমি, তুলসী (নির্মলানন্দ), মাষ্টার-মহাশয় (শ্রীম), সান্ন্যাল (বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল) এবং আরও অনেকে। শ্রীমা আঁটপুরে প্রায় এক সপ্তাহকাল অবস্থান করেন। বাবুরামের (প্রেমানন্দ) ভ্রাতা ও আত্মীয়স্বজন শ্রীমার ও আমাদের বিশেষ সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

আঁটপুরে এক সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া শ্রীমা ও আমরা সকলে কামারপুকুর-অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সেই সময়ে কামারপুকুর যাইতে হইলে তারকেশ্বর হইয়া যাওয়াই সুবিধা ছিল। সুতরাং প্রথমে শ্রীমাকে লইয়া আমরা তারকেশ্বর-অভিমুখে যাত্রা করিলাম। তারকেশ্বরে উপস্থিত হইলে ষ্টেশনের নিকট শ্রীমার জন্য একটি গরুর গাড়ী পাওয়া গেল। শ্রীমা ও গোলাপ-মা সেই গাড়ীতে এবং অবশিষ্ট আমরা সকলে পদব্রজে কামাপুকুরের দিকে যাত্রা করিলাম। মধ্যে আরামবাগে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার যাত্রা শুরু করিলাম। পথে বিস্তৃত ভীকদাসের মাঠ পড়িল। তখন ভীকদাসের মাঠে

দস্যু-তস্কর ও বিশেষ করিয়া ঠ্যাঙ্গাড়ের অত্যন্ত ভয় এবং উপদ্রব ছিল। প্রায়ই পথচারীদের সেই মাঠে দস্যুরা ঠেঙ্গাইয়া মারিত। অবশ্য আমরা নিরাপদে সেই মাঠ অতিক্রম করিয়া ক্রমে কামারপুকুর গ্রামে উপস্থিত হইলাম। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। সকলেই আমরা পথশ্রান্ত ও ক্লান্ত। খালি পায়ে কাঁকুরে রাস্তায় চলিতে চলিতে অনেকেরই পা ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া আমার পায়ের তলা পথের কাঁকরের সহিত ঘর্ষণ লাগিয়া পাতলা ঘুড়ির কাগজের ন্যায় হইয়াছিল এবং রক্ত পড়িতে লাগিল। কামারপুকুরে দুই তিনদিন থাকিয়া শ্রীমার সহিত আমরা পদব্রজে আবার জয়রামবাটী উপস্থিত হইলাম। জয়রামবাটীতে উপস্থিত হইয়া আমার চলচ্ছক্তি প্রায় রহিত হইয়া গেল এবং শ্রীমার কর্ণে সেই কথা উপস্থিত হইতেও বাকী রহিল না। শ্রীমা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও দুঃখিত হইয়া আমাকে জয়রামবাটীতে অন্তত এক সপ্তাহকাল বিশ্রাম লইবার জন্য আদেশ করিলেন। আমি একরকম শয্যাগতই হইয়াছিলাম। সুতরাং আমি শ্রীমার আদেশ পালন করিলাম। আমার পা ক্রমশঃ সুস্থ হইল।

॥ উত্তরাখণ্ড-অভিমুখে ॥

শ্রীমা জয়রামবাটীতে কিছুদিন অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলেন। গোলাপ-মাও শ্রীমার সহিত দিনকতক থাকিবে স্থির হইল। অগত্যা নরেন্দ্রনাথ, বাবুরাম, শরৎ, নিরঞ্জন, মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত হইল। আমি বরাহনগরে না ফিরিয়া কাশীধাম হইয়া হরিদ্বার অভিমুখে যাইতে মনস্থ করিলাম এবং সেই সঙ্কল্প শ্রীমাকে নিবেদন করিলাম। শ্রীমা প্রসন্ন হইয়া আমাকে আদেশ দান করিলেন ও আশীর্বাদ করিলেন। আমার কাশীধাম হইয়া হরিদ্বার যাওয়ার কথা শুনিয়া তুলসীও (নির্মলানন্দ) আমার সহিত যাইতে প্রস্তুত হইল। সুতরাং আমি ও তুলসী শ্রীমার পদধূলি এবং

নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের নিকট বিদায় লইয়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া কাশী-অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আমি ও তুলসী প্রতিজ্ঞা করিলাম—কাশী ও হরিদ্বার হইয়া সমগ্র উত্তরাখণ্ড পদব্রজে ও নিঃসম্বলেই ঘুরিব। পথে টাকা-পয়সা স্পর্শ করিব না, সন্ন্যাসীর পক্ষে অগ্নিস্পর্শ নিষেধ বলিয়া স্থির করিলাম—নিজেদের হাতে রাঁধিয়া খাইব না, রাত্রে কাহারও বাড়ীতে থাকিব না, জুতা, মোজা, গেঞ্জী বা জামা পরিব না এবং মধ্যাহ্নে তিন বাড়ী অথবা পাঁচ বাড়ীমাত্র মাধুকরী (ভিক্ষা) করিয়া যাহা জুটিবে তাহাই একবেলা খাইব। এই দৃঢ়সঙ্কল্প মনে লইয়া আমরা এক-একজনে দুইটি মাত্র কৌপীন, দুইটি বহির্বাস, একটি কম্বল, একটি কমণ্ডলু ও একটি লাঠি লইয়া রাস্তায় বাহির হইলাম। আমরা প্রত্যহ সকালে বারো হইতে পনেরো মাইল এবং বৈকালে বারো হইতে চৌদ্দ মাইল করিয়া বর্ধমানের ভিতর দিয়া রাণীগঞ্জ হইয়া সাঁওতাল-পরগণার জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। সাঁওতাল-পরগণার রাস্তার ধারে ধারে সাঁওতালদের অনেক ছোট ছোট গ্রাম ছিল। আমরা মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়া তাহাদের সহিত মেলামেশা করিতাম এবং তাহাদের সহিত কথাবার্তা কহিয়া তাহাদের আচার-ব্যবহার শিক্ষা করিতে লাগিলাম। শালবন ও আবলুস-কাষ্ঠের জঙ্গলের মধ্য দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম, সুতরাং ভিক্ষার বা মাধুকরীর কোন উপায় ছিল না। রাস্তায় কোনদিন চালভাজা, ছোলাভাজা, মহুয়ার ফুল অথবা মহুয়ার ফল খাইয়া কাটাইতে হইত। রাস্তার ধারে গাছতলায় কম্বল বিছাইয়া ইষ্টক বা প্রস্তর মাথায় দিয়া রাত্রে শয়ন করিতাম। সন্ধ্যার পর যখন অন্ধকারে আর রাস্তা দেখা যাইত না তখন পথচলা বন্ধ করিয়া শয়নের ব্যবস্থা করিতাম এবং ব্রাহ্মমুহূর্তেই আবার চলা আরম্ভ করিতাম। এইরূপে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় বেলা প্রায় দশ ঘটিকা পর্যন্ত দশ-পনেরো মাইল অগ্রসর হইতাম। পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া নিকটে কোন পুষ্করিণী বা নদীতে স্নান করিতাম এবং গ্রামের দিকে যাইয়া দুইজনে

মাধুকরী করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতাম। পরে কিছুক্ষণ গাছতলায় বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত আবার চলিতে আরম্ভ করিতাম।

সাঁওতাল-পরগণার মধ্য দিয়া একদিন জঙ্গলের পথ ধরিয়া চলিতেছি, দেখিতে পাইলাম, একজন সাঁওতাল তীরধনু লইয়া শিকার করিতে যাইতেছে। আমি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম: 'কাঁহা যাতে হো?' সাঁওতালটি বলিল: 'শিকার করনেকো ওয়াস্তে যাতা হ্যায়।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: 'হিয়া ক্যা শিকার মিল্‌তা হ্যায়?' সে বলিল: 'ময়ূর মিল্‌তা হ্যায়।' লোকটি বেশ সুস্থ, সবল ও হাসিখুসী ছিল। মনের আনন্দে সে আমাদের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে ক্রমে পাশের জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল তখন জামতাড়া। কিন্তু পথ ভুলিয়া চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আমরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এমন সময়ে একটি সাঁওতাল স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইয়া জামতাড়ার পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। স্ত্রীলোকটি বলিল: 'তোহরা কোথাকে যাবি?' আমি বলিলাম: 'জামতাড়া।' স্ত্রীলোকটি বলিল: 'জামতাড়াকে যাবি? হায় হায় রাস্তা ছেড়িয়ে দিলি।' এই বলিয়া সে আমাদের জামতাড়ার সঠিক রাস্তা দেখাইয়া দিল। ক্রমে সেই পথে চলিতে চলিতে আমরা সন্ধ্যার কিছু পরে জামতাড়ায় উপস্থিত হইলাম এবং সেইখানেই একটি বৃক্ষের তলায় রাত্রিযাপন করিলাম।

প্রভাত হইলে আমি ও তুলসী (নির্মলানন্দ) আবার পথ চলিতে লাগিলাম। পথের নিকটে কোন গ্রাম পাইলে দুইজনে সেই গ্রামে গিয়া দুই-চারি বাড়ী মাধুকরী করিয়া যাহা পাইতাম তাহা খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতাম। আবার চলিতে চলিতে যেইখানে সন্ধ্যা হইত সেইখানে রাত্রিযাপন করিতাম। এইভাবে ভিক্ষা করিয়া যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট হইয়া পদব্রজে প্রত্যহ কুড়ি-পঁচিশ মাইল চলিয়া গাজীপুরে উপস্থিত হইলাম।

॥ গাজীপুরে ॥

গাজীপুরে পৌঁছিয়া শিশিরচন্দ্র বসুর (এস. সি. বসু) বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। শিশিরবাবু তখন গাজীপুর-কোর্টের মুন্সেফ ছিলেন। বিভিন্ন দর্শনে ও সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি সেই সময়ে পাণিনীয় ব্যাকরণ ও ঈশোপনিষদের শাঙ্করভাষ্য ইংরাজীতে অনুবাদ করিতেছিলেন। তিনি যখন পাণিনীর মহাভাষ্যের ও ঈশোপনিষদের ভাষ্যের কোন কোন অংশ বুঝিতে না পারিতেন তখন আমায় জিজ্ঞাসা করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আমি পাণিনী-ব্যাকরণ 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' এবং 'মহাভাষ্য' ইতিপূর্বেই বিশেষভাবে পড়িয়াছিলাম। পতঞ্জলি পাণিনী-ব্যাকরণের ব্যাখ্যাস্বরূপ 'মহাভাষ্য' রচনা করেন। মহাভাষ্যকে দার্শনিক আলোচনাগ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শব্দশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শিশিরবাবুর সংস্পর্শে আসিয়া আমি পুনরায় 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' ও 'মহাভাষ্য' ভাল করিয়া পড়িয়া লইলাম। ব্যাকরণশাস্ত্রে আমার অশেষ নিষ্ঠা ও অধিকার দর্শন করিয়া শিশিরবাবু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং তাহারই জন্য ইংরাজীতে সিদ্ধান্তকৌমুদীর অনুবাদ করিবার সময়ে মাঝে মাঝে আমার সহিত আলোচনা করিতেন। শিশিরবাবুকে অনুবাদকার্যে সাহায্য করা ব্যতীত আমি নিজেও কৌমুদীর কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলাম। শিশিরবাবুর অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দেখিয়া আমার ইচ্ছা হইল যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তিগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ করি। অনুবাদের কাজ আরম্ভও করিলাম। কোন কোন উক্তি শিশিরবাবু ও ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের একজন ভক্ত ছিলেন। আমি ও তুলসী (নির্মলানন্দ) যখন শিশিরবাবুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছি, সেই সময় ঈশানবাবুও বায়ু-পরিবর্তনের জন্য গাজীপুরে গিয়াছিলেন। তিনি শিশিরবাবুর বিশেষ পরিচিত ছিলেন। সেইজন্য যখনই তিনি

গাজীপুরে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য মাঝে মাঝে যাইতেন তখনই শিশিরবাবুর বাড়ীতে আসিতেন। পূর্ব হইতে ঈশানবাবুর সহিত আমার পরিচয় ছিল। সেইজন্য সেইবারে শিশিরবাবুর বাড়ীতে আসিলে তিনি তুলসী ও আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাহা ছাড়া আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী ইংরাজীতে অনুবাদ করিতেছি শুনিয়া তিনি আরও আনন্দিত হইয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের কতকগুলি উক্তি তিনিও অনুবাদ করিয়া দেন।

তখন গ্রীষ্মকাল। ভীষণ গরম পড়িয়াছিল। মধ্যাহ্নে গরম লু ('hot wind as if from the furnace') চলিত। সেইজন্য প্রাতে ছয়টা হইতে দশটা পর্যন্ত আদালত, বিদ্যালয় ও সমস্ত দোকান প্রভৃতি খোলা থাকিত। বেলা বারোটার পর আর কাহারও পক্ষে ঘরের বাহির হইবার সাধ্য ছিল না। নীচের তলার ঘরে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া থারমাণ্টিডিট[১] ও খস্‌খসের পর্দা জলে ভিজাইয়া টাঙ্গানো হইত। আমরা সকলে এইরূপ অন্ধকারে ঠাণ্ডায় বসিয়া বিশ্রাম করিতাম। বেলা চারিটার সময় রৌদ্রের তাপ কমিয়া চারিদিক কিছুটা ঠাণ্ডা হইলে তবে বাহিরে বাহির হইতাম।

সেই সময়ে হরিপ্রসন্ন (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) গাজীপুরে পি. ডব্লুউ. ডি-র ইঞ্জিনীয়র ছিল। সে ট্যাণ্ডামগাড়ীতে চড়িয়া যখন রাস্তা পরিদর্শন করিবার জন্য বাহির হইত তখন তুলসী ও আমাকে সেই ট্যাণ্ডামে চড়াইয়া সহর দেখাইতে লইয়া যাইত। হরিপ্রসন্ন গাজীপুরে প্রায় সকল লোকের সহিতই বিশেষ পরিচিত ছিল। সেই সময় এক ঘটনার কথা বলি।

হরিপ্রসন্ন একদিন গাজীপুরের সেই সময়কার একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে আমাদের (আমি ও তুলসীর) সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। সেই পণ্ডিত ছিলেন দ্বৈতবাদী, সুতরাং অদ্বৈতবাদের

১। Thermantinote is an apparatus for cooling the air used in India (অর্থাৎ ঘরের গরম বাতাস ঠাণ্ডা করার একটি যন্ত্রবিশেষ)।

বিশেষ বিরোধী ছিলেন। হরিপ্রসন্নের মনে মতলব ছিল যে, সেই দ্বৈতবাদী পণ্ডিতকে আমার সহিত বিচারে ভিড়াইয়া দেয়, কেননা হরিপ্রসন্ন জানিত, আমি ছিলাম একান্তপক্ষে অদ্বৈতবাদী, আমার ক্ষুরধার বুদ্ধি ও বিচারের কাছে সেই পণ্ডিত অবশ্যই পরাজিত হইবে। হইলও তাহাই। গাজীপুরের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হরিপ্রসন্নের মুখে অদ্বৈতবাদের প্রতি আমার অচলা নিষ্ঠার কথা শুনিয়া অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিবার জন্য শাস্ত্রার্থবিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। হরিপ্রসন্ন ও তুলসী পার্শ্বে বসিয়া আমাদের বিচার মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিল। পণ্ডিতজী দ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানা যুক্তি ও তর্কজাল উপস্থাপন এবং বিশেষ করিয়া আচার্য শঙ্করের মতবাদ খণ্ডন করিতে লাগিলেন। মনে আছে, তিনি ব্যাসদেব-কৃত বেদান্তসূত্রকে শঙ্করাচার্য বিকৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া আপত্তি করিতে লাগিলেন। আমি আচার্য শঙ্করের অখণ্ডনীয় উপনিষদ্‌ভাষ্য ও বেদান্ত-সূত্রভাষ্যের প্রামাণিকতা ও যুক্তিযুক্ততা প্রমাণ করিয়া অনর্গল তাঁহার সহিত সংস্কৃতে বিচার করিতে লাগিলাম এবং পণ্ডিতজীর সকল আপত্তিই নিরঙ্কুশভাবে খণ্ডন করিলাম। প্রায় একঘণ্টা বিচারের পর পণ্ডিতজী পরাভব স্বীকার করিয়া বলিলেন: 'আপনি ঠিকই বলিতেছেন। কিন্তু তাহা হইলেও আমি দ্বৈতবাদকেই সকলের পক্ষে শ্রেয়ঃ মনে করি।' তাহাতে আমি পণ্ডিতজীকে বলিলাম, অধিকারীভেদে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই তিন মতেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। অদ্বৈতানুভূতি একেবারে শেষের কথা। পণ্ডিতজী ঘাড় নাড়িয়া তাহা স্বীকার করিলেন। ধুর্ধর্ষ পণ্ডিতজীকে পরাজিত করার জন্য হরিপ্রসন্ন ও তুলসীর আনন্দ আর ধরে না। মনে পড়ে, এই ঘটনার বহুদিন পরে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন আমেরিকা হইতে ফিরিয়া বেলুড়-মঠে বাস করি তখন একদিন হরিপ্রসন্ন (তখন স্বামিজীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাহার নাম হইয়াছে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) আমাকে গাজীপুরের এই ঘটনার কথা স্মরণ করাইয়া

দিয়া বলিয়াছিল : 'মহারাজ, আপনার অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও তর্ক-পটুতার কথা আমার জানা ছিল। তাই সেদিন গাজীপুরে দ্বৈতবাদী পণ্ডিতজীর বিরুদ্ধে বিচারে আমি আপনাকে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আপনি পণ্ডিতজীকে পরাস্ত করবেনই।' অবশ্য হরিপ্রসন্ন শুধু সেইদিনই নয়, অনেক সময়ে অনেকের কাছেই সেই কথা বলিয়া যেন গর্ব অনুভব করিত।

॥ পওহারী বাবা ॥

গাজীপুরের বিখ্যাত সন্ন্যাসী ও পরমহংস পওহারী বাবার কথা আমি পূর্বেই স্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দের) নিকট শুনিয়াছিলাম এবং তাঁহার অলৌকিক যোগশক্তি ও কৃচ্ছ্রসাধনের কথা আমার জানা ছিল। সুতরাং গাজীপুরে আসিয়া সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিবার বাসনা বিশেষভাবে বলবতী হইল। তিনি কোনরূপ খাদ্যদ্রব্যাদি গ্রহণ না করিয়া কেবল প্রাণায়ামযোগে পবন (বায়ু) আশ্রয় বা ভক্ষণ করিয়া তপস্যা করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে পওহারী বা পবনহারী বাবা বলিত। আমি তুলসীকে (নির্মলানন্দ) সঙ্গে লইয়া একদিন পওহারী বাবার আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম—তিনি তাঁহার আশ্রমে মাটির ভিতরে একটি গহ্বরে বসিয়া যোগ সাধন করেন এবং রুদ্ধদ্বারের অন্তরালে বসিয়াই বাহিরের লোকের সহিত কিছু কিছু আলাপ-আলোচনা করেন।

পওহারী বাবার একটি মন্দির ছিল এবং তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। মন্দিরের মধ্যে একটি সুন্দর নারায়ণের বিগ্রহ ছিল। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মন্দিরে নারায়ণ বিগ্রহের সেবার পর পওহারী বাবারও সেবা করিতেন। পওহারী বাবা কখনো কখনো এক মাস ধরিয়া অনাহারে থাকিয়া গহ্বরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সমাধিমগ্ন থাকিতেন। সেই সময়ে কোন লোকই তাঁহার নিকটে যাইত না। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু আহার্য-সামগ্রী গহ্বরের

দ্বারে রাখিয়া আসিতেন এবং পরদিবস তাহা ঠিক সেইভাবেই আছে দেখিয়া আবার ফিরাইয়া লইয়া আসিতেন। অদ্ভুত ও অপূর্ব ছিল পওহারী বাবার সেই তপস্যা !

পওহারী বাবা-সম্বন্ধে আরও অনেক ঘটনা শুনিলাম। তিনি কখনও কখনও মাটির গহ্বরে থাকিতেন, কখনও বা গহ্বরের বাহিরে উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা একটি বাগানের মধ্যে থাকিয়া বিষ্ণু-বিগ্রহের পূজাদি ও ধ্যান-ধারণাদি করিয়া সময় কাটাইতেন। সেই সময়ে লোকজন আসিলে বদ্ধ-দরজার আড়ালের ভিতর দিকে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন, কিন্তু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। শোনা যায়, বহু বৎসর পূর্বে একদিন তিনি বাহিরে আসিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তখন চতুর্দিক হইতে এত জন-সমাগম হইয়াছিল যে, তাহাতে বিরক্ত হইয়া সেই অবধি তিনি ঐ বাগানের মধ্যে লুকায়িত থাকিতেন। কিন্তু তথাপি বহুদূর পর্যন্ত গ্রামবাসীরা তাঁহার প্রভাবে এমনই আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাহারা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত। শোনা যায়, পওহারী বাবার আশ্রমের দশ ক্রোশের মধ্যে কোনদিন চুরি-ডাকাতি বা কোন-রূপ অন্যায় কর্ম কেহ করে নাই এবং তাহারই জন্য সেইখানে কোনরূপ পুলিশ ফাঁড়িরও ব্যবস্থা ছিল না।

পওহারী বাবা-সম্বন্ধে একটি গল্পও শুনিয়াছিলাম। লোকে বলিয়াছিল যে, উহা গল্প নয়, সত্যকার ঘটনা। ঘটনাটি এই যে, এক রাত্রে একটি চোর চুরি করিবার জন্য পওহারী বাবার আশ্রমের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করে। পওহারী বাবা তখন শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। চোর ক্রমে নারায়ণের মন্দিরে প্রবেশ করিল এবং পূজার বাসনাদি ও রান্না করিবার পিত্তলের হাঁড়ি-জলপাত্রাদি একত্রিত করিয়া একটি কাপড়ে বন্ধন করিল। পওহারী বাবা তখন নিদ্রার ভান করিয়া চুপ করিয়া ছিলেন। কিন্তু চোর যখন কাপড়ে বাঁধা জিনিসপত্রের পুঁটুলি লইয়া পলাইবার

আয়োজন করিতেছিল তখন তিনি সাড়া দিয়া উঠিলেন। চোর মানুষের গলার শব্দ পাইয়া পুঁটুলি ফেলিয়া সোজা দৌড় দিল। পওহারী বাবা দেখিলেন চোরের ইচ্ছা পূর্ণ হইল না! তিনি বিশ্রাম ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ সেই পরিত্যক্ত পুঁটুলিটি নিজেই মাথায় লইয়া চোরের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে লাগিলেন। চোর দেখিল মুস্কিল ব্যাপার, সে প্রাণভয়ে আরও জোরে দৌড়াইতে লাগিল। পওহারী বাবাও ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তিনি আরও দ্রুতগতিতে দৌড়াইয়া চোরের কাছাকাছি গিয়া বলিলেন: 'ভাই, তুমি ভয় করো না। তুমি এই পুঁটুলিটি ফেলে এসেছ, পুঁটুলি তোমারই। এই নাও, তুমি নিয়ে যাও।' চোর পূর্বে সেইরূপ ব্যবহার কোনদিন কাহারও নিকট হইতে পায় নাই। তাহা ছাড়া মহাত্মা পওহারী বাবার মহিমার কথা সে জানিত। সুতরাং পওহারী বাবার সেই সাধুব্যবহার দেখিয়া সে লজ্জিত লইল এবং তাঁহার পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। শুধু তাহাই নয়, সে প্রতিজ্ঞা করিল, সে আর কখনও চুরি করিবে না। সাধু-মহাত্মা যাঁহারা, তাঁহাদিগের পুণ্যস্পর্শে দুষ্কৃতকারীও সাধু-চরিত্র ব্যক্তিতে পরিণত হয়। ঠিক অনুরূপ একটি ঘটনার কথা আমরা একজন খ্রীষ্টান পাদরীর জীবনেও পাইয়াছি। যাহা হউক আসল কথাটিই এক্ষণে বলি। আমরা মহাত্মা পওহারী বাবাকে যে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, তাহা সফল হইয়াছিল। তিনি মাটির গহ্বরেই তখন ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া ছিলেন। আমাদের আগমন-সংবাদ পাইয়া নিকটে ডাকিয়া বসাইলেন। আমি দুই চারিটি ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ লইয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করিলাম। তিনি ধীরে ধীরে ইঙ্গিতে ও কথায় উত্তর দিলেন। দেখিলাম, সত্যই তিনি ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষ। সর্বদাই আত্মনিষ্ঠ হইয়া আছেন।

॥ কাশী-অভিমুখে যাত্রা ॥

দুই একদিনের মধ্যেই গাজীপুর ত্যাগ করিয়া আমি ও তুলসী কাশী-

অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ক্রমে কাশীতে উপস্থিত হইয়া বাঙ্গালী-টোলায় বংশী দত্তের বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। কাশীধামে ভিক্ষার কোন অসুবিধা ছিল না, কারণ সেইখানে বহু ধনী লোকের সত্র-সদাব্রতের ব্যবস্থা ছিল। সেই সকল স্থানে ত্যাগী সাধুরা মাধুকরী করিয়া রুটি, ডাল প্রভৃতি দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে পাইত। আমরা দুই-জনেও সেই মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কাশীধামে কিছুদিন অতিবাহিত করিলাম। বাঙ্গালীটোলায় বংশী দত্তের বাড়ীতে অল্পদিন থাকিবার পর হঠাৎ যোগেন, গোপালদাদা ও দীননাথের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা ইতিপূর্বেই কাশী আসিয়াছিল। তাহাদের সাক্ষাৎ পাইয়া আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না। তখন আমরা সকলে অসিনদীর ধারে একটি নির্জন বাগানে বাস করিতে লাগিলাম। দুর্গাবাড়ীর নিকটবর্তী সত্র হইতে সকলে মাধুকরী করিয়া একবেলা আহার করিতাম এবং বেদান্ত-বিচার ও ধ্যান-ধারণাদি করিয়া সমস্ত দিন কাটাইতাম। একদিন আমাদের কাশী পরিক্রমা করিবার ইচ্ছা হইল। তুলসী, দীননাথ, যোগেন ও আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। গোপালদাদা বাগানেই রহিলেন। পরিক্রমার পথে বিভিন্ন শিবমন্দির দেখিলাম। আমরা প্রতিটি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শিবপূজা করিলাম এবং তাহার পর চলিতে চলিতে পরিক্রমা শেষ করিয়া নির্দিষ্ট বাগানে ফিরিয়া আসিলাম।

একদিন বেলা এগারটার সময়ে আমরা সকলে মাধুকরী শেষ করিয়া ফিরিতেছি, এমন সময়ে দেখি যে, ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল উড়িয়া আসিতেছে। আকাশ ক্রমশঃ পঙ্গপালে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন কাশীর সর্বত্র সকলে কাঁসর, টিনের কানেস্তারা ও শঙ্খ বাজাইয়া পঙ্গ-পালদের তাড়াইতে লাগিল। আমার জীবনে সেই প্রথম পঙ্গপালের দল দেখিলাম। শুনিয়াছিলাম, পঙ্গপাল যেইখানে বসে সেইখানে শস্যাদি ও গাছের পাতা সমস্তই খাইয়া ফেলে। সত্যই দেখিলাম যে,

পঙ্গপালের দল পার্শ্ববর্তী স্থানের গাছপালায় বসিয়া মুহূর্তের মধ্যে তাহাদের পাতা নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।

॥ ভাস্করানন্দ স্বামী ও ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দর্শন ॥

একদিন আমরা ভাস্করানন্দ স্বামীকে দর্শন করিতে গেলাম। তিনি উলঙ্গ অবস্থায় একটি বাগানে থাকিতেন। আমরা প্রণাম জানাইয়া তাঁহার একপার্শ্বে বসিলে তিনি আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা বলিলাম—পরিব্রাজক অবস্থায় ভ্রমণ করিতে করিতে বর্তমানে কাশীধামে উপস্থিত হইয়া একটি বাগানবাড়ীতে আছি এবং পরে হরিদ্বার ও হৃষীকেশের দিকে যাত্রা করিব। তিনি শুনিয়া আনন্দে ঈষৎ হাস্য করিলেন। আমরা তাঁহার সহিত বেদান্তের কয়েকটি জটিল প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করিলাম। দেখিলাম, তিনি একজন জ্ঞানপন্থী সাধক। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান যথেষ্ট এবং বেশ বিচারশীল সন্ন্যাসী। তবে বুঝিলাম যে, তাঁহার সিদ্ধাবস্থা তখনও হয় নাই। সিদ্ধের সিদ্ধ শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়া ও তাঁহার সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করিয়া কোন যোগীর সিদ্ধাবস্থা বুঝিবার জ্ঞানচক্ষু আমাদের খুলিয়াছিল।

আর একদিনের কথা। আমরা ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দর্শন করিতে গেলাম। দেখিলাম, তিনি দশাশ্বমেধঘাটে পাথরের সিঁড়ির উপর উলঙ্গ অবস্থায় শুইয়া আছেন। প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে সিঁড়ির পাথর এত উত্তপ্ত যে, তাহার উপর পা রাখা যায় না। কিন্তু আমরা যাইয়া দেখি যে, ত্রৈলঙ্গ স্বামী উলঙ্গ হইয়া উত্তপ্ত সিঁড়ির উপর শুইয়া আছেন। তিনি নিদ্রিত ও তাঁহার নাক ডাকিতেছিল। আমরা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম। তিনি নিদ্রিত ছিলেন বলিয়া আমরা সেইদিন ফিরিয়া আসিলাম।

তাহার পরদিন সকালে আবার আমরা দশাশ্বমেধ ঘাটে উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম তিনি বেণীমাধবের মন্দিরের নিকট তাঁহার আপন

আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং আমরা তথায় গমন করিয়া দেখিলাম তিনি বসিয়া আছেন। অন্তর্মুখী ভাব। তাঁহার নিকট একটি শ্লেট ও পেন্সিল ছিল। শুনিলাম, শ্লেটে লিখিয়া প্রশ্ন করিলে তিনি সংস্কৃত ভাষায় তাহার উত্তর লিখিয়া দেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিলাম তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ। কাশীপুরের বাগানে থাকিবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখেও ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সিদ্ধাবস্থার কথা শুনিয়াছিলাম। আমরা শ্লেটে লিখিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটি প্রশ্ন করিলাম। তিনি সহাস্যে আমাদের দিকে তাকাইয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর লিখিয়া দিলেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাই আমাদের বারবার স্মরণ হইতে লাগিল। জীবনে আত্মোপলব্ধি ব্যতীত ঈশ্বরীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে সঠিক ও সংশয়হীন উত্তর সাধারণ মানুষের নিকট হইতে মেলে না। সিদ্ধ মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে নিবিড় শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম করিয়া আমরা বিদায় লইলাম।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

॥ হরিদ্বারের পথে ॥

কাশীধামে আরও দুই একদিন অবস্থান করিয়া আমি ও তুলসী হরিদ্বার অভিমুখে যাওয়াই স্থির করিলাম। সুতরাং কাশীর বিশ্বনাথজীউকে প্রণাম জানাইয়া আমরা অযোধ্যার পথে পদব্রজে চলিতে লাগিলাম। একদিন প্রাতে চলিতে চলিতে বেলা নয়টার সময় একটি বর্ধিষ্ণু সহরের মতো গ্রামে উপস্থিত হইলাম। সেইখানে বহু সমৃদ্ধবান লোকের বাস দেখিলাম। তুলসী বলিল, ঐ গ্রামে গেলে ভিক্ষার সুবিধা হইতে পারে, সুতরাং আর অধিক দূর অগ্রসর হইয়া লাভ নাই। আমিও তাহাতে সম্মত হইলাম। নিকটে একটি পুষ্করিণীতে স্নান সারিয়া লওয়া সঙ্গত মনে করিলাম। দুইজনে স্নানকর্ম শেষ করিয়া ভাবিলাম মধ্যাহ্ন-ভিক্ষার অনেক বিলম্ব আছে। সুতরাং বর্ধিষ্ণু গ্রামে প্রচুর মাধুকরী পাইবার আশা পরিত্যাগ করিয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হওয়াই সমীচীন মনে করিলাম। আমি তুলসীকে বলিলাম: 'দেখ, প্রচুর মাধুকরী পাইবার আশায় এই গ্রামে বসিয়া থাকা সন্ন্যাসীর কর্তব্য নহে। আজ আমরা অধিক পথও পদব্রজে অতিক্রম করি নাই। সুতরাং অগ্রসর হইয়া চলো, পরের গ্রামে ভিক্ষা করা যাইবে।' তুলসী তাহাতে বিশেষ সম্মত হইল না। সে বলিল: 'আরও আট ক্রোশ পথ অতিক্রম করলে তবে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম পাওয়া যাবে। মনে হয়, সেখানে মাধুকরী পাওয়া কঠিন হবে এবং রৌদ্রে কষ্টও হবে অত্যন্ত।' তাহাতে আমি তাহাকে বলিলাম: 'তুলসী, ভক্তের বোঝা ভগবান বহন করেন। আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নিয়ে যখন বেরিয়েছি, তখন চিন্তা কি, চলো, আমাদের মাধুকরী শ্রীশ্রীঠাকুর সেখানে ঠিক ক'রে রেখেছেন। পুত্র জন্মাবার আগেই মাতৃস্তনে দুগ্ধ প্রস্তুত থাকে, সুতরাং আমাদের মাধুকরী ঐ গ্রামেই মিলবে।'

আমি পথ চলিতে লাগিলাম। অগত্যা তুলসীও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। কিন্তু রৌদ্রের তাপ ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। খোলা মাঠের রাস্তা। একটিও বৃক্ষের চিহ্ন নাই, সুতরাং ছায়া নাই। তারপর পথে ধূলি অত্যন্ত। রৌদ্রের তাপে ধূলি উত্তপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমাদের খালি পা। সুতরাং পথ চলিতে বেশ কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তুলসীর মুখ ও চোখ সমস্ত লাল হইয়া গিয়াছে। উভয়েই ঘর্মাক্ত কলেবর। প্রায় চারি ঘণ্টা চলিয়া এবং ধূলি ও প্রখর রৌদ্র ভোগ করিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত শরীরে পরবর্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হইলাম। ক্ষুধায় তখন পেট জ্বলিতেছে। তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে। উভয়েই একরকম চলচ্ছক্তিরহিত। এইরূপ অবস্থায় সেই গ্রামের একটি শিব-মন্দিরের দালানে আশ্রয় লইলাম। তখন বেলা প্রায় দুইটা বাজিয়াছে। গ্রামে এক মাড়োয়ারীর একখানি মাত্র দোকান দেখিলাম। তুলসী রুদ্ধস্বরে বলিল: 'আমি তো বলেছিলাম ভাই, পরবর্তী গ্রাম বহুদূর এবং সেখানে মাধুকরী মেলা কঠিন। এখন দেখছ তো, ক্ষুধায় দেহ অবসন্ন এবং ভিক্ষা মেলাও কঠিন।' আমি পূর্বের মতোই তুলসীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম: 'ভাই, হতাশ হচ্ছ কেন? আমি যা বলেছি, তাই হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের জন্য মাধুকরী ঠিক ক'রেই রেখেছেন।'

তাহাই হইল। ক্লান্ত শরীরে আমরা কম্বল বিছাইয়া বসিলাম এবং ঠিক করিলাম যে, প্রথমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তাহার পর গ্রামে ভিক্ষায় যাইব। তুলসী বলিল: 'ভাই, যাহা হয় তাই কর। আমি কিন্তু শুয়ে পড়লাম।' তুলসী শয়ন করিল। আমি বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি। এমন সময় দেখি—একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আসিয়া 'নমো নারায়ণ' বলিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন: 'মহাত্মাজী, কুছ ভোজন পায়া?' আমি বলিলাম: 'নেহি বাবা।'

তাহা শুনিয়া মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি চলিয়া গেলেন। তুলসী

শুইয়া ছিল, এইবার উঠিয়া বসিল। বলিল: 'মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বোধহয় আমাদের জন্য কিছু খাবার জিনিস নিয়ে আসবে।' আমি বলিলাম: 'তুলসী, গীতায় ভগবান বলেছেন জান তো—'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'। ভক্তের বোঝা ভগবান বয়ে থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নিয়ে আমরা বেরিয়েছি, তিনিই আমাদের জীবনের সম্বল, সুতরাং হতাশ হও কেন? আমাদের খাবার তিনি জোটাবেনই।'

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে দেখি যে, মাড়োয়ারী ভদ্রলোক একটি ঝুড়িতে করিয়া পুরী, তরকারী, মেঠাই, লাড্ডু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আনিয়া আমাদের কম্বলের মধ্যস্থলে রাখিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা সত্যই আশ্চর্যান্বিত হইলাম। আমি তুলসীকে পুনরায় বলিলাম: 'দেখলে তো, আমাদের মাধুকরী এখানেই আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে আছে। করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন এ কথা বিশ্বাস করো তুলসী?' আমি তখন শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের সেই শ্লোকটি[1] উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে লাগিলাম। তুলসী আনন্দে বলিল: 'তোমার কথাই ভাই শেষে সত্য হল। সত্যই শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন।' যাহা হউক আনীত খাবার আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে উৎসর্গ করিয়া খাইতে বসিলাম। কিন্তু মাড়োয়ারী ভদ্রলোক খাবার দ্রব্য এতই প্রচুর পরিমাণে আনিয়াছিলেন যে, সমস্ত খাওয়া দুষ্কর। আমরা অবশিষ্ট খাবার দ্রব্য গ্রামের বালকদের ডাকিয়া বিলাইয়া দিলাম ।১৮৮ বালকেরা তাহা গ্রহণ করিয়া আনন্দ করিতেছে দেখিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আমরা গ্রামের শিবমন্দিরেই সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। পরদিন প্রাতে আবার চলিতে

১। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
—গীতা ৯।২২

লাগিলাম। ক্রমে অযোধ্যা সহর আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান অযোধ্যা। তাহা ত্রেতাযুগের কথা। এখন অবশ্য সেই রামও নাই আর সে অযোধ্যাও নাই। কিন্তু তথাপি শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতি মানুষের অন্তরে এখনও শ্রদ্ধার পরিবেশ সৃষ্টি করে। আমরা অযোধ্যার একটি মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সেইখানে দুই তিন বাড়ী ঘুরিয়া মাধুকরী মিলিল। আমরা শ্রীরামচন্দ্রের লীলাস্থলসমূহ ও রামাইৎ বৈষ্ণবদিগের আখড়াগুলি দর্শন করিবার জন্য অযোধ্যায় তিন রাত্রি কাটাইব স্থির করিলাম। যমুনায় স্নান করিবার সময় সেই অতীত দিনের স্মৃতি আমাদের মনে হইতে লাগিল। যাহা হউক তিন রাত্রি অযোধ্যায় অতিবাহিত করিয়া লক্ষ্ণৌ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে প্রখর রৌদ্রের তাপ ও ধূলি। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরই আমাদের সহায় ও সম্বল। তাই নিত্য নূতনভাবে বিবিধ কষ্ট ও অসুবিধার সম্মুখীন হইলেও আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করিয়া পথ চলিতে লাগিলাম।

ক্রমে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইলাম। লক্ষ্ণৌ একটি ঐতিহাসিক সহর। মুসলমান রাজাদের বহু কীর্তি এখানে এখনও রক্ষিত আছে। আমরা লক্ষ্ণৌয়ে উপস্থিত হইলে একজন হিন্দুস্থানী ভক্ত আমরা কোথায় যাইব জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম—হরিদ্বারে যাইব। ভক্তটি জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কিরূপে যাইবেন। আমি বলিলাম—পদব্রজে। হিন্দুস্থানী ভক্তটি বেশ আগ্রহের সহিত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল : 'মহাত্মাজী, হরিদ্বার তো এখান থেকে অনেক দূর, এতটা রাস্তা পায়ে হেঁটে যেতে পারবেন কি ?' আমি বলিলাম : 'বাবা, আমরা পদব্রজে আসছি কলকাতা থেকে। হরিদ্বারের অর্ধেক রাস্তা তো শেষই হয়েছে, আর অর্ধেক বাকী। এ আর পারব না ?' ভক্তটি বলিল : 'মহাত্মাজী, আমি যদি রেলভাড়া দিই, আপনারা নেবেন কি ?' আমি বলিলাম : 'আমরা টাকা স্পর্শ করব না প্রতিজ্ঞা করেছি। সুতরাং টাকা-পয়সা আমরা নিব না।' ভক্তটি বলিল :

'মহাত্মাজী, আমি যদি টিকিট কিনে দিই, নেবেন কি?' আমি বলিলাম: 'নেব।' তখন ভক্তটি হরিদ্বারের দুইখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া দিল। পথে খাবার দ্রব্য কিনিয়া খাইবার জন্য কিছু পয়সাও দিতে চাহিল। আমরা বলিলাম, টাকা পয়সা আমরা গ্রহণ করিব না। তখন শালপাতার ঠোঙ্গায় করিয়া কিছু লাড্ডু ও মিঠাই কিনিয়া ভক্তটি আমাদের সঙ্গে দিল এবং প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। তুলসী হিন্দুস্থানী ভক্তটির সদয় ব্যবহার দেখিয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। আমি বলিলাম: 'ভাই, এমন করেই অপরকে দিয়ে ভগবান ভক্তের সাহায্য করেন। দেখলে তো, হিন্দুস্থানীটি আমাদের পরিচিত বা আপনজনও নয়, অথচ কত ভক্তি ও ভালবাসা নিয়ে আমাদের সেবা করলো। সবই শ্রীশ্রীঠাকুরের খেলা জানবে।' দেখিলাম—তুলসী মনে মনে বেশ খুশী হইয়াছে।

আমরা পরদিন প্রাতে নিরাপদে হরিদ্বার ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ইংরাজী ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ। পরে হরিদ্বার ষ্টেশন হইতে সহরে গিয়া একটি ধর্মশালায় আশ্রয় লইলাম। হরিদ্বারে তখন এত দোকানপাট হয় নাই। সর্বত্রই সাধু-সন্ন্যাসীদের কুঠিয়া। মাঝে মাঝে সাধুদের জন্য সত্র। কালী-কমলীওয়ালার সত্রটিই বড়। সাধু-সন্ন্যাসীরা বেশীর ভাগ ঐ সত্রটিতে দুপুরে মাধুকরী করেন। রুটি ও বেশীর ভাগ বড় বড় কলাইয়ের ডাল। মাঝে মাঝে সামান্য শাক-সবজীর তরকারী ও লাড্ডু-মেঠাই পাওয়া যায়। আমরা দুইজনে প্রথমে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া একটি সত্রে মাধুকরী করিলাম। পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বিভিন্ন সাধুদের আখড়াগুলি পরিদর্শন করিলাম। হরিদ্বারের চারিদিকে সবুজ বৃক্ষশ্রেণীতে সমাচ্ছন্ন পাহাড়। বিশাল হিমালয় পর্বতেরই সেইগুলি অংশবিশেষ। হরিদ্বারের গঙ্গার জল স্বচ্ছ, সবুজ ও মনোরম। কলকল শব্দে গঙ্গার জলধারা ক্রমাগতই বহিয়া যাইতেছে। মন যেন আপনা হইতেই ধ্যানে মগ্ন হইয়া যায়।

॥ হৃষিকেশে ॥

আমরা কনখলে দক্ষঘাট প্রভৃতি পবিত্র স্থান দর্শন করিয়া আসিলাম। কনখলে 'রামকৃষ্ণ-আশ্রম' তখন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কনখলের পরিবেশ তখন অত্যন্ত নীরব ছিল। মাঝে মাঝে কেবল দুই চারিটি সাধু-সন্ন্যাসীদের কুঠিয়া। তাছাড়া চারিদিকে প্রায় জঙ্গল। আমরা দুইদিন হরিদ্বারের ধর্মশালায় থাকিয়া সেইখানকার প্রায় সমস্ত তীর্থ-স্থানগুলিই দর্শন করিলাম। আমাদের মন কিন্তু হৃষিকেশ ও লছমন-ঝোলা হইয়া কেদার ও বদরী (কেদারনাথ ও বদরীনাথ) এবং গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী যাইবার জন্য সর্বদা ব্যগ্র ছিল। সেইজন্য হরিদ্বারে দুই-দিন কাটাইয়া পদব্রজে হৃষিকেশের দিকে যাত্রা করিলাম। পথের দুই ধারে শালগাছের জঙ্গল বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। জঙ্গলের মধ্যে মাঝে মাঝে পাখির ডাক শোনা যাইতেছিল। প্রাতঃকালে রওনা হইয়া বেলা প্রায় সাড়ে নয়টা দশটার সময় হৃষিকেশে পেঁৗছিলাম। নৈসর্গিক শোভায় মনের আনন্দে হরিদ্বার হইতে হৃষিকেশ এই চৌদ্দ-পনেরো মাইল পথ অতিক্রম করিতে কোন ক্লান্তি অনুভব করিলাম না। হৃষিকেশে উপস্থিত হইয়া প্রথমে ছোট একটি বাড়ীতে এক সাধুর কুঠিয়ায় আমরা আশ্রয় লইলাম। 'নমো নারায়ণ' বলিয়া দাঁড়াইতেই সাধুটি আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার কুঠিয়ায় স্থান দিলেন। পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। গঙ্গার বুকে ও চারিদিকে ছোটবড় অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড সমাকীর্ণ। তাহাদের উপর দিয়া গঙ্গার স্বচ্ছ জলধারা কখনও ধীরে এবং কখনও বা বেগে প্রবাহিত হওয়ায় জলের ঐরূপ শব্দ হইতেছে। শব্দ কখনও কখনও তীব্র হইলেও মধুর মনে হইতেছিল।

দেখিলাম—মাড়োয়ারী ভদ্রলোকেরা সাধু-সন্তদের সেবার জন্য হৃষিকেশে কতকগুলি অন্নসত্র খুলিয়াছেন। সাধুরা নিজেদের নিজেদের কুটিরে জপ-ধ্যান ও বেদান্তাদি শাস্ত্র পঠনপাঠন সমাপ্ত করিয়া মধ্যাহ্নে

ঐ সকল সত্রে ডাল, রুটি প্রভৃতি খাদ্য মাধুকরী করিয়া আনিতেন ও গঙ্গার ধারে বসিয়া আহার সমাপন করিতেন। আহারের পর আবার যে যাহার কুঠিয়াতে আসিয়া বিশ্রামের পর ধ্যান, জপ, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও তপস্যা করিতেন। দেখিলাম, যথার্থ নিষ্ঠাবান বিরক্ত ত্যাগ-বৈরাগ্যবান সাধু যাঁহারা তাঁহারা নিজেরা একটি ছাতার মতো কুঠিয়া তৈয়ারী করিয়া তাহাতে বাস করেন। তাঁহারা প্রথমে গাছের ডালপালা দিয়া তাঁবুর ন্যায় একটি কাঠামো (ফ্রেম) প্রস্তুত করিতেন ও ফুসঘাস (টাইগার গ্রাস) কাটিয়া তাহার দ্বারা কাঠামোটিতে ছাউনি করিয়া বাস করিতেন। ফুসঘাস খড়ের মতো লম্বা এবং তাহাতে ঘরের চালের ছাউনি করায় অসুবিধা নাই। কুঠিয়ার মধ্যে তাঁহারা ঐ ঘাসের বিছানা করিয়া তাহাতে শয়ন করিতেন ও বসিয়া ধ্যান-জপ ও শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। তাহাদের ঐ ফুসঘাসে তৈয়ারী কুঠিয়াকে 'ঝুপড়ী' বলিত। ঘাসের ঐ ঝুপড়ী দেখিয়া আমার ইচ্ছা হইল যে, গাছের ডালপালা ও ঘাস দিয়া নিজে ঐরূপ একটি ঝুপড়ী তৈয়ারী করিয়া তাহাতে বাস করিব। মাধুকরীর যখন অভাব নাই, তখন স্থির করিলাম—কয়েকদিন হৃষিকেশে ধ্যান-ভজনাদিতে কাটাইয়া তাহার পর লছমনঝোলা হইয়া দুইজনে বদরীনারায়ণের পথে যাত্রা করিব। তুলসীও তাহাতে সম্মত হইল।

সুতরাং আমি হৃষিকেশে গঙ্গার প্রায় ধারে জঙ্গলের মধ্যে একটি স্থান নির্বাচন করিয়া গাছের ডালপালা ও ফুসঘাস দিয়া একটি ঝুপড়ী তৈয়ারী করিলাম। নিকটস্থ একজন উদাসী পাঞ্জাবী সাধু কিরূপে ঝুপড়ী নির্মাণ করিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিলেন। তুলসীও আমাকে সাহায্য করিল। স্থির হইল যে, তুলসী ঐ পূর্বোক্ত সাধুর কুঠিয়াতেই বাস করিবে এবং আমি একাকী কিছুদিন ঝুপড়ীতে বাস করিয়া ধ্যান-ধারণা তপস্যাদি করিব। আমিও জমিতে ফুসঘাস পুরু করিয়া বিছাইয়া তাহার উপর কম্বল পাতিয়া বসিতাম ও শুইতাম। মধ্যাহ্নে আমি ও তুলসী দুইজনেই একসঙ্গে অপরাপর মহাত্মাদের (সাধুদের)

সঙ্গে সত্রে গিয়া মাধুকরী করিতাম এবং আহার করিবার পর সামান্য বিশ্রাম করিয়া অন্যান্য বিদ্বান ও ত্যাগী সাধুদিগের সহিত আনন্দে শাস্ত্রালাপ ও অধিকাংশ সময় ধ্যান-ধারণাদি করিতাম। আমাদের দিন বেশ সুখে ও শান্তিতে কাটিতে লাগিল। আজিও সেইসব দিনের কথা ভুলি নাই, স্মরণ করিয়া আনন্দ পাই।

হৃষিকেশে ঝুপড়ীতে থাকাকালে আমি ও তুলসী কৌপীনপঞ্চক, মোহমুদ্গর প্রভৃতি আচার্য শঙ্করের বেদান্তস্তোত্রগুলি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতাম এবং ভগবদ্‌গীতা, উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র এবং তাহাদের উপর শাঙ্করভাষ্যসমূহ পাঠ করিতাম। এইরূপে কিছুদিন বাস করিয়া শুনিলাম যে, কেদারবদরীগামী যাত্রীগণ এরই মধ্যে তাহাদের যাত্রা শুরু করিয়াছে। পার্শ্ববর্তী মহাত্মা-সাধুদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম —সেই সময়ে রওনা হওয়াই ভাল। আমরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম, প্রথমে বদরিকাশ্রম দর্শন করিয়া সেইখান হইতে কেদারনাথ যাইব। কেদারনাথ হইতে ফিরিবার পথে ত্রিযুগীনারায়ণ হইয়া ভাটমারী এবং ভাটমারী হইতে গঙ্গোত্রী যাইব।

হৃষিকেশে সাধু-মহাত্মাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া একদিন প্রাতে আমি ও তুলসী লছমনঝুলা বা লছমনঝোলা (ঝোলা অর্থে পুল বা সাঁকো) অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এপার ওপার করিবার জন্য তখন গঙ্গার উপর দড়ি ও বাঁশের তৈয়ারী একটি ঝোলানো পুল (হ্যাঙ্গিঙ ব্রিজ) ছিল এবং তাহাকেই বলা হইত লছমনঝুলা বা লছমনঝোলা। পুলের পার্শ্বে লক্ষ্মণজীর মন্দির এবং লক্ষ্মণজীর নামানুসারেই তাহার নাম হয় লক্ষ্মণঝুলা বা লছমনঝোলা (লক্ষ্মণকে হিন্দীভাষায় লছমন বলে)। ঐ পোলের উপর দিয়া পার হইতে গেলে তখন সমগ্র পোলটিই এইদিকে ঐদিকে দুলিত এবং তাহাতে অনেক যাত্রীরই মাথা ঘুরিত। আজকাল যাত্রীরা সেই বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

॥ বদরিকাশ্রমের পথে ॥

আমরা হৃষিকেশ হইতে প্রায় চারি মাইল অতিক্রম করিয়া পুলের কাছাকাছি লছমনজীর মন্দিরে উপস্থিত হইলাম এবং মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করিয়া অতি সন্তর্পণে লছমনঝুলা পার হইলাম। আমাদের পশ্চাতে ও অগ্রে কিছু কিছু যাত্রী দেখিলাম। লছমনঝুলা পার হইলেই বামদিকে বদরিকাশ্রম যাইবার পথ। সম্মুখে তখন চারিদিকে জঙ্গল ছিল। আমরা দুইজনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করিয়া বদরিকাশ্রমের পথ ধরিয়া নিঃসম্বল অবস্থায় চলিতে লাগিলাম। সামান্য কিছু দূরেই পথের পার্শ্ব দিয়া বরাবর গঙ্গা চলিয়া গিয়াছে দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত। দুই-দিকে পার্বত্য বৃক্ষের জঙ্গল ও পাথর। গঙ্গা কোথায়ওবা একটু দূরে নিম্ন দিয়া কলকল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। জঙ্গল হইতে দুই চারিটি পাখির ডাক শোনা যাইতেছিল। ঐ পথে দশ-পনেরো মাইল অন্তর এক একটি চটি ছিল। ঐ চটির অপর নাম বিশ্রামস্থল। যাত্রীরা মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় ঐ সকল চটিতে উপস্থিত হইয়া আহারাদি ও বিশ্রাম করিত। রাত্রে ঐ সকল চটিতে রাত্রিযাপন করিত। ঐ সকল চটিতে রন্ধনের জন্য হাড়ি, থালা, গ্লাস, চাউল, ডাইল, ঘৃত, লঙ্কা প্রভৃতি ছাড়া কাষ্ঠাদি পাওয়া যাইত। যাত্রীরা রান্না ও আহারাদি সারিয়া ঐ সকল খাইবার পাত্রাদি ফিরাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যাদির মূল্য দিয়া দিত এবং তাহার পর আবার চলিতে আরম্ভ করিত। আমাদের নিকট টাকা পয়সার কোন বালাই ছিল না সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সুতরাং আমাদের পক্ষে ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া উপায় ছিল না। আমরা দুইজনে যাত্রীদিগের নিকট মাধুকরী করিয়া ডাল, রুটি বা চাপাটি যাহা-কিছু পাইতাম তাহাই একবেলা আহার করিয়া রাস্তার ধারে কম্বল বিছাইয়া বিশ্রাম ও রাত্রিযাপন করিতাম। যাত্রীরা চটির ভিতরে থাকিত। এইরূপ পাহাড়ের উপরে তৈয়ারী পথে চড়াই ও উৎরাই (উঠা-নামা) করিয়া প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল যাইলে ব্যাসঘাটে

পৌঁছানো যায়। ইহার অর্ধেক পথে গরুড়চটি। গরুড়চটিতে গরুড়-দেবতার একটি মন্দির আছে। আমরা গরুড়চটির নিকট মধ্যাহ্নে যাত্রীদের নিকট মাধুকরী করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম ও পরে চলিতে চলিতে প্রায় সন্ধ্যার সময় ব্যাসঘাটে উপস্থিত হইলাম। ব্যাসঘাটে চটির পাশে গাছতলায় আমি ও তুলসী কম্বল বিছাইয়া রাত্রিবাস করিবার ব্যবস্থা করিলাম। আমরা একবেলা ভিক্ষা করিয়া আহার করি, সুতরাং রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার কোন হাঙ্গামাই ছিল না।

প্রবাদ আছে যে, ব্যাসঘাটে ব্যাসদেব তপস্যা করিয়াছিলেন। ব্যাসদেবের নামানুসারে 'ব্যাসঘাট' নাম প্রদত্ত। ব্যাসঘাটে রাত্রিযাপন ও তৎপরদিন নয় মাইল অতিক্রম করিয়া দেবপ্রয়াগে পৌঁছিলাম। দেবপ্রয়াগে গঙ্গা ও অলকানন্দা নদী দুইটি মিলিত হইয়াছে। ঐ দুই নদীর সঙ্গমস্থলে যাত্রীরা স্নান করিয়া পবিত্র হয়। গঙ্গা বরাবর গঙ্গোত্রীর দিকে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। গঙ্গোত্রীরও পূর্বে গোমুখী হইতে গঙ্গার জন্ম এবং সেইখান হইতে প্রবাহিত হইয়া দেবপ্রয়াগে আসিয়া গঙ্গা অলকানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছে। গঙ্গার ধার দিয়া গঙ্গোত্রী যাইবার একটি পথ আছে। আমরা পূর্বেই স্থির করিয়াছিলাম যে, প্রথমে বদরিকাশ্রম ও কেদার-নাথ দর্শন করিয়া পরে ত্রিযুগীনারায়ণ হইয়া গঙ্গোত্রী যাইব। সুতরাং দুইজনে গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থলে নামিয়া স্নান করিলাম ও যাত্রীদের নিকট মাধুকরী করিয়া মধ্যাহ্নের আহার শেষ করিলাম। কথিত আছে যে, দেবতারা ঐস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। এই স্থানে হিমালয়ের দৃশ্য অতি সুন্দর।

দেবপ্রয়াগ হইতে ১৮ মাইল উপরে শ্রীনগর। শ্রীনগরের নিকট বিল্বকেদার (শিব) আছেন। বিল্বকেদারের একটি মন্দিরও আছে। মন্দিরটি বেশ প্রাচীন। আমরা সেইখানে উপস্থিত হইয়া শিব দর্শন করিলাম। চতুর্দিকে পাহাড়ের উপর সবুজ গাছপালার মনোরম দৃশ্য। বিল্বকেদার হইতে শ্রীনগর ৪ মাইল এবং তথা

হইতে ১৮ মাইল উপরে রুদ্রপ্রয়াগ। রুদ্রপ্রয়াগে মন্দাকিনী ও অলকানন্দা নদী দুইটি মিলিত হইয়াছে। আমরা রুদ্রপ্রয়াগে উপস্থিত হইয়া মন্দাকিনী ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থলে স্নান করিলাম। ঐস্থানে রুদ্রেশ্বর শিবের একটি প্রাচীন মন্দির আছে। আমরা স্নান সমাপন করিয়া শিব দর্শন করিলাম এবং সমাগত যাত্রীদের নিকট মাধুকরী করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। রুদ্রপ্রয়াগ হইতে দুইটি পথ বিভক্ত হইয়া একটি অলকানন্দার ধার দিয়া কর্ণপ্রয়াগ হইয়া বদরিকাশ্রমে গিয়াছে এবং অন্যটি মন্দাকিনীর ধার দিয়া গুপ্তকাশী হইয়া কেদারনাথে গিয়াছে।

অগস্ত্যমুনিতীর্থ রুদ্রপ্রয়াগ হইতে ৭ মাইল উপরে কেদারনাথের পথে অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে, অগস্ত্যমুনিতীর্থে ঋষি অগস্ত্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। অগস্ত্যমুনি হইতে গুপ্তকাশী ১৩ মাইল। গুপ্তকাশীতে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার মন্দির আছে। অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। তাহা ছাড়া একটি মণিকর্ণিকা আছে। মণিকর্ণিকা অতি মনোরম স্থান। সেইখানে গোমুখীধারা ও মণিকর্ণিকা কুণ্ড আছে। আমরা দুইজনে (আমি ও তুলসী) কুণ্ডে স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দর্শন করিলাম। নির্জন পাহাড়ের বুকে এই মন্দিরের পরিবেশ শান্তিময়। গুপ্তকাশীর কুণ্ড হইতে ৩ মাইল চড়াই অতিক্রম করিলে একটি গরম জলের ও একটি ঠাণ্ডা জলের দুইটি প্রস্রবণ পাওয়া যায়। ঐখানে যাত্রীরা অনেক সময় পিণ্ডদানাদি কার্য করিয়া থাকেন। ঐস্থান হইতে ২ মাইল অতিক্রম করিলে একটি পথ পাওয়া যায় এবং ঐ পথ উখীমঠ হইয়া চামৌলী বা লালসাঙ্গা গিয়াছে। চামৌলী হইতে ঐ পথ বদরিকাশ্রমের পথের সহিত মিলিত হইয়াছে। উখীমঠের নিকট কয়েকটি অশ্বত্থগাছ দেখিলাম। উখীমঠে ডাকঘর, থানা, মধ্যশ্রেণীর লোকদিগের জন্য একটি বিদ্যালয়, হাসপাতাল, ধর্মশালা, বাজার ও সদাব্রত আছে। দেখিয়া মনে হইল, বদরীনাথের পথে উখীমঠ বেশ সমৃদ্ধ ও সাজানো-গোছানো স্থান। বাণরাজার

কন্যা উষা হইতে নাকি উখীমঠের নামকরণ হইয়াছে। হিন্দী ভাষায় 'ষ'-কে 'খ' উচ্চাচরণ করা হয়। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, পৌরাণিক যুগে এইস্থানে বাণরাজার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। উষা ও অনিরুদ্ধের গুপ্তপ্রণয়ের কাহিনী পুরাণে বর্ণিত আছে।

শুনিলাম যে, কেদারনাথের 'রাওল' বা মোহান্ত বেশীর ভাগ সময় উখীমঠে অবস্থান করেন। বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন কেদারনাথের মন্দিরের দরজা খোলা হয় এবং কার্তিক মাসে দীপান্বিতার সময় দ্বার বন্ধ করা হয়। অক্ষয় তৃতীয়ায় কেদারনাথের মন্দিরের দ্বার খোলার সময় উখীমঠ হইতে রাওলমহাশয় কেদারনাথে যান এবং ঐস্থানে কিছুদিন অবস্থান করেন।

আমরা দুইজনে উখীমঠে উপস্থিত হইলাম। শোনা যায়, মহাভারতের যুগে দানবীর কর্ণ কর্ণপ্রয়াগে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নামানুসারেই নাকি 'কর্ণপ্রয়াগ' নামকরণ হইয়াছে। উখীমঠের ফটক দিয়া আমরা মঠের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, মধ্যে একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণ এবং প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে কতকগুলি মন্দির রহিয়াছে। ঐ সকল মন্দিরে উষা, অনিরুদ্ধ, পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী, কুন্তী, পঞ্চমুখ কেদারেশ্বর, ওঁকারেশ্বর প্রভৃতি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং নিয়মিতভাবে ঐ সকল মূর্তির প্রতিদিন পূজা হয়।

উখীমঠ হইতে বদরীনাথের পথে ৮ মাইল চড়াই-উৎরাই করিয়া পোথিবাসচটিতে উপনীত হওয়া যায়। রাস্তা গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া গিয়াছে। কিন্তু পার্বত্য দৃশ্য অতি সুন্দর ও মনোরম। এইস্থানে তিনটি ঝরণা দেখিলাম এবং তাহারা পার্বত্য পথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া খরস্রোতে বহিয়া যাইতেছে। সেইখান হইতে ৪ মাইল দূরে চোপতাচটি। চোপতাচটির পথেও গভীর জঙ্গল। সেই চটি তুষারমণ্ডিত 'তুঙ্গনাথ' পর্বতের পাদদেশে একটি উপত্যকায় অবস্থিত। তুঙ্গনাথ পর্বতের গাত্রে স্তরে স্তরে চীড়গাছ (পাইনগাছ) বিস্তীর্ণ হইয়া এক অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। চোপতাচটি হইতে ১০

মাইল দূরে কুলটীচটি। আমরা তুঙ্গনাথ পর্বতে আরোহণ করিয়া শিব দর্শন করিলাম। চতুর্দিক বরফে আচ্ছন্ন। মন্দিরও তখন বরফে আবৃত ছিল। পাণ্ডারা বরফ কাটিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিবার রাস্তা তৈয়ারী করিয়াছে।

আমরা তুঙ্গনাথ হইতে পুনরায় চোপতাচটিতে অবতরণ করিয়া চলিতে লাগিলাম এবং কুলটীচটিতে উপস্থিত হইলাম। কুলটীচটি হইতে ৬ মাইল দূরে চমৌলী বা লালসাঙ্গাচটি। চমৌলীতে কেদার-নাথ, বদরীনাথ ও কর্ণপ্রয়াগের তিনটি পথ একসঙ্গে মিলিত হইয়াছে। চমৌলীতে বা লালসাঙ্গায় বড় একটি ধর্মশালা আছে। আমি ও তুলসী উভয়ে ঐ সকল চটি অতিক্রম করিয়া প্রথমে বদরীনাথের দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম, কেননা আমাদের সিদ্ধান্তই ছিল যে, প্রথমে বদরীনাথ গিয়া বদরীনারায়ণ দর্শন করিব এবং তাহার পর ত্রিযুগীনারায়ণ হইয়া কেদারনাথ যাইব। আমরা সেইমত চমৌলী বা লালসাঙ্গাচটি অতিক্রম করিয়া তাহার ১০ মাইল দূরে পিপ্পল-কুটী চটিতে উপস্থিত হইলাম। পথে প্রত্যেক চটিতে মাধুকরী করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতাম ও পরে আবার যাত্রীদের সহিত পথ চলিতে থাকিতাম। চমৌলী হইতে ২ মাইল দূরে মঠচটি। ক্রমে আমরা মঠচটিতে উপস্থিত হইলাম। মঠচটিটী অতি উর্বর স্থানে অবস্থিত। দেখিলাম—সেইখানে একটি বাগান আছে ও বাগানে আমগাছ, কলাগাছ, পেয়ারাগাছ ও ডালিমগাছ রহিয়াছে। নানান রকম ফুলের গাছও চারিদিকে বিস্তৃত। শাকসবজী ও বিশেষভাবে মূলার চাষ দেখিলাম। পথে দেখিলাম—ছোট ছোট নূতন চটিও কয়েকটি তৈয়ারী হইয়াছে।

পিপ্পলকুটিচটি চমৌলীচটি অপেক্ষা আয়তনে বড় বলিয়া মনে হইল। সেইখানে অনেক দোকান ও কেনাকাটার ভীড় দেখিলাম। বাঁধাকপি ও অন্যান্য তরিতরকারী ছাড়াও পান পর্যন্ত এই সকল দোকানে বিক্রয় হয়। আমরা ক্রমশঃ পিপ্পলকুটি অতিক্রম করিয়া

৮ মাইল দূরে পাতালগঙ্গাচটিতে উপস্থিত হইলাম। পথে মাঝে মাঝে কিছু কিছু সাধু ও তীর্থযাত্রীদের সহিত আলাপ করিয়া পথশ্রম লাঘব করিতাম। পাতালগঙ্গাচটির পথে গরুড়গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম-স্থলে গরুড়-ভগবানের একটি মন্দির আছে। সেইখানে দুইটি পনাচাক্কীও দেখিলাম। পাতালগঙ্গা হইতে যোশীমঠ ১১ মাইল। পথে কুমারচটিতে ডাকঘর, ধর্মশালা ও সদাব্রত আছে। ঐ চটির অল্প দূরে কর্মনাশা নদী অলকানন্দায় গিয়া পড়িয়াছে। সেইখানে কল্পেশ্বর মহাদেবের (পঞ্চকেদারের মধ্যে একটি) মন্দির দেখিলাম।

ক্রমে আমরা যোশীমঠে উপস্থিত হইলাম। যোশীমঠে গোলাপের বাগানে বড় বড় গোলাপফুল ফুটিয়া আছে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ হইল। শীতের সময় বরফের জন্য যখন বদরীনাথের মন্দির বন্ধ থাকে তখন যোশীমঠে বদরীনারায়ণের পূজা হয়। বদরীনাথের রাওল বা মোহান্ত সেইখানেও অনেক সময় বাস করেন। যোশীমঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শঙ্কর। যোশীমঠের আর এক নাম জ্যোতির্মঠ। সেইখান হইতে মানাপাশ (সমুদ্র হইতে ১৭,৫৬৮ ফুট উচ্চ) হইয়া মানস-সরোবরে ও তিব্বতে যাইবার একটি পথ আছে। তবে পথটি অত্যন্ত দুর্গম। যোশীমঠের তিন মাইল দূরে ভবিষ্যদেবীর মন্দির। যোশীমঠ বা জ্যোতির্মঠ হইতে বদরীনাথগ্রাম প্রায় উনিশ মাইল। আমরা যোশীমঠে মাধুকরী করিয়া এক রাত্রি বাস করিলাম এবং শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত ঐ মঠে আচার্য শঙ্করের বাল্যাবস্থার মূর্তি দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। যোশীমঠের দুই মাইল নীচে বিষ্ণুপ্রয়াগ। বিষ্ণুপ্রয়াগ হইতে তুষারাবৃত কৈলাস পর্বতের কিছুটা অংশ দেখিতে পাইয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইলাম। বিষ্ণুপ্রয়াগ হইতে চার মাইল উপরে ঘাটচটি এবং সেইখান হইতে আরও তিন মাইল নীচে পাণ্ডুকেশ্বর। আমরা পাণ্ডুকেশ্বর হইতে তিন মাইল চড়াই করিয়া লামবগড়চটিতে উপস্থিত হইলাম। পথের চতুর্দিকে বরফ। আমাদের পায়ে কোনরূপ জুতা ছিল না। সেই-জন্য নগ্নপদে বরফের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে প্রথমে অত্যন্ত কষ্ট

অনুভব করিলাম। সেইখান হইতে চার মাইল চড়াই অতিক্রম করিয়া হনুমানচটিতে উপস্থিত হইলাম। তাহার পর হনুমানচটি হইতে পাঁচ মাইল অতিক্রম করিয়া বদরীধামে উপস্থিত হইলাম। আমাদের বহুদিনের আশা পূর্ণ হইল। আমরা আনন্দে অধীর হইয়া 'জয় বদরীবিশালকী জয়' বলিয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিলাম।

বদরীকাশ্রমের পরিবেশ অতি পবিত্র ও সুন্দর। দুইদিকে দুইটি গগনচুম্বী পর্বত। একটির নাম 'নর' ও অপরটির নাম 'নারায়ণ'। প্রবাদ যে, নর ও নারায়ণ ঐ দুইটি পর্বতের প্রাচীনকালে তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরই স্মৃতির উদ্দেশ্যে পর্বত-দুইটির নামকরণ হইয়াছে নর ও নারায়ণ। ঐখানে একটি তপ্তকুণ্ড আছে এবং ঐ কুণ্ডে বারমাসই জল গরম থাকে। সমাগত যাত্রীরা ঐ তপ্তকুণ্ডে স্নান করিয়া আরাম অনুভব করে। আমি ও তুলসী বদরীকাশ্রমে তিনদিন তিন রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলাম। প্রতিদিন বদরিনারায়ণকে দর্শন ও তাঁহার প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতাম ও পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমরা একবেলা মাত্র মাধুকরী করিয়া আহার করিতাম।

বদরীকাশ্রম হইতে কিছুদূর চড়াই করিয়া যাইলে ব্যাসগুহায় উপনীত হওয়া যায়। শোনা যায়, পৌরাণিক যুগে বেদবিভাগকর্তা ব্যাসদেব ঐস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু শীতকালে ঐ ব্যাস-গুহাটি বরফে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং তখন আর কোন যাত্রী ঐস্থানে যাইতে পারে না। ঐস্থানের প্রায় উপরে 'বসুধারা' (সহস্রধারা) নামে একটি প্রকাণ্ড জলপ্রপাত আছে। দেখিলাম, বিশাল একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর প্রবল বেগে জলস্রোত পতিত হইয়া সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। জলধারার ভীষণ শব্দ ঐ পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি যেন ভঙ্গ করিতেছিল। সাধুসন্ত এবং যাত্রীদের অনেকে ঐ বরফগলা জলে স্নান করিয়া থাকেন। আমি ও তুলসী স্নান করিলাম না, সামান্য জল তুলিয়া লইয়া মাথায় ছিটাইয়া দিলাম। সহস্রধারার পার্শ্ব দিয়া মানস-সরোবরে

যাইবার একটি আঁকাবাঁকা রাস্তা আছে। গঙ্গাধর (গঙ্গাধর মহারাজ বা স্বামী অখণ্ডানন্দ) যখন তিব্বতে যায় তখন ঐ রাস্তা দিয়াই সে গিয়াছিল। তিব্বতী ব্যাপারীরা তাহাকে গরম বস্ত্র ও ভিক্ষা দিত। গঙ্গাধর মানসসরোবর দেখিয়া লাসার দিকে যাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু বেশীদূর যাইতে পারে নাই, তিব্বতের পথ-রক্ষকেরা (তিব্বতী শান্ত্রী পাহারাদার) তাহাকে লাসার রাস্তা হইতে ফিরিয়া গিয়া লাডাকের দিকে যাইতে বাধ্য করে। পরে লাডাকে লে-সহর হইতে সে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের দিকে নামিয়া যায়। গঙ্গাধরের সাহসও যেমন ছিল তেমনি ছিল রোক ও মনের জোর।

বদরীকাশ্রম হইতে তিব্বতে যাইবার একটি রাস্তা আছে। সেই রাস্তা ভুটিয়া-ব্যাপারীরা ছাগল ও ভেড়ার পৃষ্ঠে ছোট ছোট থলের মধ্যে চাউল, আটা, গুড় প্রভৃতি সামগ্রী তিব্বতে লইয়া যায় এবং তিব্বত হইতে পশম, রক্সল্ট প্রভৃতি ভারতে লইয়া আসে। তাহা ছাড়া তাহারা ভারত হইতে আটা, মাখন, ময়দা প্রভৃতিও তিব্বতে চালান করে। আমরা বদরীকাশ্রমে থাকিতে থাকিতেই ভুটিয়া-ব্যাপারীদের একটি দলকে তিব্বতের দিকে যাইতে দেখিলাম। তাহাদের সহিত অনেকগুলি কালো কালো শিকারী কুকুর বা 'ওয়াচ্-ডগ্' দেখিলাম। তাহাদের দেখিয়া আমারও তিব্বতে যাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল এবং তুলসীকে সেই কথা বলিলাম। তুলসী বলিল : 'তা ক্যামন ক'রে হয়। তোমার সঙ্গে যথেষ্ট গরম জামা-কাপড় নাই। তিব্বতে ভীষণ শীত ও বরফ, সুতরাং তুমি কষ্ট পাবে।' আমি তুলসীর কথায় প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। তবে যদিও সেইবারে তিব্বতে যাওয়া হইল না বটে, কিন্তু আমার অন্তরে প্রবল বাসনা রহিয়া গেল যে, হিমালয়ের পরপারে কিরূপ দেশ আছে তাহা যে কোন্‌প্রকারে

১। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতযাত্রার ঘটনা আর স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের লেখা হয় নাই, পরিব্রাজক-জীবন পর্যন্তই তিনি নিজ হস্তে আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। বাকী বিস্তৃত জীবনকাহিনী বিচিত্র কর্মের চাপে লিখিয়া যাইতে পারেন নাই।

দেখিতেই হইবে। অবশ্য সেই ইচ্ছা আমার পূর্ণ হইয়াছিল ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে।

॥ কেদারনাথের পথে ॥

বদরীকাশ্রম দর্শন করিয়া যাত্রীদিগের সহিত আমি ও তুলসী কেদারনাথে যাইবার জন্য যে পথে গিয়াছিলাম সেই পথ দিয়া আবার ফিরিতে লাগিলাম। পূর্ব হইতেই আমাদের সংকল্প ছিল প্রথমে বদরীনাথ দর্শন করিয়া পরে কেদারনাথ এবং কেদারনাথ হইতে ফিরিবার পথে ত্রিযুগীনারায়ণ হইয়া উত্তরকাশী যাইব। উত্তরকাশী হইতে ভাটমারী হইয়া গঙ্গোত্রী যাইতে হয়। কেদারনাথ যাইবার পথ দিয়াই নাকি পঞ্চপাণ্ডব পৌরাণিক যুগে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। সেই দুর্গম পথে যাইতে যাইতে দ্রৌপদী প্রথমে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া নকুল ও সহদেব এবং পরে ভীম ও অর্জুন প্রাণত্যাগ করেন। যুধিষ্ঠির কেদারনাথের পশ্চাতে যে বরফের পর্বত আছে তাহার উপর আরোহণ করিবার সময়ে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। কেদারনাথের পাণ্ডারা পূর্বকালের ঐ সকল ঘটনার কথা বলিয়া স্থান দেখাইয়া যাত্রীদিগকে স্নান, পূজা, তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করান।

আমরা মন্দাকিনীর পার্শ্ব দিয়া নগ্নপদে চলিতে চলিতে কেদারনাথের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ঠাণ্ডায় হাঁটু পর্যন্ত জমিয়া যেন অসাড় হইয়া গেল। ক্রমেই ঠাণ্ডা বাড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম।

কেদারনাথ যাইবার পথে গৌরীকুণ্ড পড়ে। সেইখানে উষ্ণকুণ্ডে আমরা স্নান করিলাম। কুণ্ডের জল অত্যন্ত গরম ছিল। গৌরীকুণ্ড হইতে এক মাইল উপরে ভীমের একটি প্রকাণ্ড মূর্তি আছে। প্রবাদ যে, সেইস্থানে পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থানকালে ভীম পড়িয়া গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। গৌরীকুণ্ড হইতে নীচের দিকে চারি-

মাইল দূরে রামবাড়াচটি। সেই পর্যন্ত পথের দুইধারে দেবদারু ও অন্যান্য বৃক্ষলতা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রামবাড়াচটি পার হইলে আর কোন বৃক্ষলতা নাই, কেবলই তুষারাবৃত নগ্ন পর্বতমালা। সেই চটির নিকট কেদারনাথের যাত্রীদের বিনামূল্যে গরম চা বিতরণ করা হয়। সেই স্থান হইতে দেখা যায় যে, তুষারাবৃত পর্বতমালা হইতে অসংখ্য ঝরণার সৃষ্টি হইয়াছে।

আমরা ক্রমশই উপরে উঠিতে লাগিলাম। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কিছু কষ্ট হইতে লাগিল। আমরা বরফের উপর দিয়া চলিতে চলিতে কেদারনাথে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, পাণ্ডারা কুঠার দিয়া বরফের স্তূপ কাটিয়া কাটিয়া কেদারনাথের মন্দিরদ্বার পরিষ্কার করিতেছে। মন্দিরের চারিদিক তখনও বরফে আবৃত। আমরা অতিকষ্টে অন্যান্য যাত্রীদিগের সহিত দরজা দিয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেদারনাথ শিব-দর্শন করিলাম। কেদারনাথ স্বয়ম্ভু শিব। তখনও বরফে কেদারনাথ শিবের সর্বদেহ আবৃত। আমরা শিবদেহ স্পর্শ করিয়া ধন্য হইলাম। মন্দিরের ভিতর বরফগলা জল। বাহিরে আসিয়াও দেখি যে, চতুর্দিক কেবল বরফে ঢাকা। আমরা একরাত্রি অতিকষ্টে বসিয়া বসিয়া কাটাইলাম। চক্ষে নিদ্রা আসিল না।

কেদারনাথের মন্দির প্রস্তরে নির্মিত। শিবদেহও কৃষ্ণপ্রস্তরের। দেখিলে মনে হয়, একটি পাহাড়ের চূড়াকে পৃথকভাবে কাটিয়া যেন শিবলিঙ্গ তৈয়ারী করা হইয়াছে। দীর্ঘতায় ও আয়তনে বৃহৎ। মন্দির-চত্বরে পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী, কুন্তী ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি আছে। কেদারনাথে একটি সাময়িক ডাকঘর আছে। প্রায় এক মাইল দূর হইতে কেদারনাথের মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। পথে মন্দাকিনীর উপর দিয়া একটি কাঠের পুল পার হইলে কেদারনাথে পৌঁছানো যায়। কেদারনাথের মন্দির হইতে মন্দাকিনীতে যাইবার জন্য একটি সুন্দর ঘাটও বাঁধানো হইয়াছে দেখিলাম।

কেদারনাথের উৎপত্তি-সম্বন্ধে মহাভারতের সৌপ্তিকপর্বে ব'

আছে যে, অশ্বত্থামা যখন ঘোর নিশায় পাণ্ডব-শিবিরের দিকে যাইতে-ছিলেন তখন মহাদেব শিবিরের দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন। অশ্বত্থামা শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে গেলে মহাদেব বাধা দেন। তখন উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম হয়। অশ্বত্থামা মহাদেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পরিশেষে স্তবস্তুতি করিয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেন। তখন মহাদেব শিবিরের দ্বার ছাড়িয়া দেন। ভীম মহাদেবের এই ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া ক্রুদ্ধ হন ও মহাদেবকে বধ করিতে উদ্যত হন। তখন মহাদেব মহিষমূর্তি ধারণ করিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করেন ও একটি পর্বতগুহায় আশ্রয় লন। ভীমও পশ্চাদনুসরণ করিয়া মহিষ-মূর্তিকে খড়্গ দ্বারা হত্যা করেন। তখন মহিষের মুণ্ডহীন শরীর কেদার-নাথ-শিব, মুণ্ডটি পশুপতিনাথ-শিব (নেপালে) এবং লাঙ্গুলটি তুঙ্গনাথ-শিবে রূপান্তরিত হয়। প্রবাদ যে, এই তিন শিব দর্শন না করিলে সম্পূর্ণ কেদারনাথ-শিবকে দর্শন করা সার্থক হয় না। গল্পটি পৌরাণিক এবং তিন শিবকেই পাণ্ডবদের সহিত সম্পর্কিত করা হইয়াছে।

॥ গঙ্গোত্রীর পথে ॥

পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট ছিল যে, আমরা প্রথমে রুদ্রপ্রয়াগ হইয়া কর্ণপ্রয়াগের পথে চামৌলী হইয়া বদরীকাশ্রম যাইব। তাহার পর বদরীকাশ্রম হইতে ফিরিয়া ত্রিযুগীনারায়ণ হইয়া কেদারনাথ যাইব এবং কেদারনাথ হইতে পুনরায় ত্রিযুগীনারায়ণে ফিরিয়া তথা হইতে ভিন্ন একটি দুর্গম পথে উত্তরকাশী যাইব। উত্তরকাশী গঙ্গোত্রীর পথে পড়ে। যাত্রীদের প্রথমে গঙ্গোত্রী যাইতে হইলে উত্তরকাশী হইতে ভাটমারীচটি হইয়া যাইতে হয়। রাস্তা অতীব দুর্গম ও জঙ্গলে সমাকীর্ণ। আমরা সেইমতো ত্রিযুগীনারায়ণ হইতে কয়েকদিন চলিয়া উত্তরকাশীতে উপনীত হইলাম। উত্তরকাশী বারাণসীর মতো হিমালয়ের বুকে পবিত্র তীর্থ, সেইখানে বহু সাধু-সন্ত বারোমাস থাকিয়া ধ্যান-ভজন ও তপস্যাদি করেন।

ভাটমারীচটি হইতে দুইটি পথ দুইদিকে গিয়াছে: একটি গঙ্গোত্রীর দিকে ও অপরটি যমুনোত্রীর দিকে। আমি ও তুলসী প্রথমে গঙ্গোত্রীর পথে চলিতে লাগিলাম। পথে মাঝে মাঝে চারিদিকে অসংখ্য সিদ্ধি-গাছ দেখিলাম। আমরা মুঠা মুঠা শুক্‌না সিদ্ধিগাছের পাতা লইয়া মাঝে মাঝে খাইতে লাগিলাম। দেখিলাম—একটু নেশার উদ্রেক হয়। গঙ্গোত্রীতে উপনীত হইয়া প্রকৃতির অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইলাম। সেখানে অত্যন্ত শীত। চারিদিকে বরফের পাহাড়। সেইখানে একজন নানকপন্থী উদাসী সাধুর সহিত আমাদিগের পরিচয় হইল। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আমরা গোমুখী দর্শন করিবার জন্য গমন করিলাম। গঙ্গানদীর উৎপত্তি গোমুখী হইতে। বরফের নদী হইতে সাতটি ধারা যেইস্থানে মিলিত হইয়াছে সেইস্থান হইতে গঙ্গার উৎপত্তি। সেইস্থান বারমাসই বরফে আবৃত থাকে। আমরা গঙ্গোত্রীতে ফিরিয়া একদিন রাত্রিবাস করিলাম; রাত্রে লতাপাতা ও কিছু কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া সেইগুলি জ্বালাইয়া শীত নিবারণ করিলাম। উদাসী সাধুটি আমাদের বিশেষ যত্ন করিলেন।

॥ যমুনোত্রীর পথে ॥

পরদিন প্রাতে গঙ্গোত্রী ত্যাগ করিয়া আমরা পুনরায় ভাটমারীচটির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কয়েকদিন পথ চলিয়া অবশেষে ভাটমারীচটিতে উপস্থিত হইলাম। সেইখানে গিয়া দেখি যে, কয়েক-জন সাধু-মহাত্মা যমুনোত্রী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। আরও কয়েকজন গৃহস্থ যাত্রীদেরও দেখিলাম। আমরা সেইখানে যাত্রীদিগের নিকট হইতে মাধুকরী করিয়া খাইয়া সামান্যক্ষণ বিশ্রাম করিলাম ও পুনরায় পূর্বোক্ত সাধু-মহাত্মাদের সহিত যমুনোত্রীর পথে যাত্রা আরম্ভ করিলাম। পথে চারিদিকে জঙ্গল। বেশ ঠাণ্ডাও অনুভব করিতে লাগিলাম। কয়েকদিন দুইবেলা পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে যমুনোত্রীতে উপস্থিত হইলাম। যমুনোত্রীতে একটি তপ্তকুণ্ড দেখিলাম।

আমরা চারিদিক দর্শন করিয়া পরে যাত্রীদের নিকট কিছু আটা ও চাল ভিক্ষা করিলাম। সাধু-মহাত্মাদের দেখাদেখি একটি কাপড়ের মধ্যে আটা ও চাল বাঁধিয়া তপ্তকুণ্ডের মধ্যে কিছুক্ষণ রাখিতেই দেখি সিদ্ধ হইয়া ভাত হইয়া গিয়াছে। আমরা দুইজনে সেই অন্ন খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। তবে খাইবার সময় আমরা কিছুটা গন্ধকের গন্ধ পাইলাম। যমুনোত্রীতে দুঃসহ শীত। আমরা দুইজনে নিকটস্থ একটি পর্বতগুহায় আশ্রয় লইলাম এবং রাত্রে গাছপালা জ্বালিয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া সমস্ত রাত্রিই ধ্যান-জপ করিয়া কাটাইলাম। সেইজন্য শীতের হাত হইতে কিছুটা নিষ্কৃতি পাইয়াছিলাম। নিকটে কোন গ্রাম বা লোকালয় ছিল না। যাহা হউক, আমরা তৎপরদিন প্রাতেই যমুনোত্রী ত্যাগ করিয়া আবার ভাটমারীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথের চতুর্দিকে পাহাড় ও জঙ্গলের অপরূপ শোভা দেখিতে দেখিতে পরিশেষে দুই তিনদিন পরে ভাটমারীচটিতে উপস্থিত হইলাম। ভাটমারীতে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী গমনেচ্ছু অনেক যাত্রী ও কয়েকজন সাধুকে সমবেত দেখিলাম। আমি ও তুলসী দুইজনে যাত্রীদের নিকট হইতে মাধুকরী করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম।

॥ প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ॥

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াই আবার উত্তরকাশীর দিকে চলিতে লাগিলাম। শুনিলাম যে, ভাটমারী হইতে উত্তরকাশী ৮০।৮৫ মাইল দূরে। উত্তরকাশী পেঁছাইতে আমাদের প্রায় তিনদিন লাগিল। উত্তরকশীতে কয়েকটি দোকান, ডাকঘর ও পার্বত্যবাসীদের একটি ছোটখাট পল্লী দেখিলাম। উত্তরকাশীর গঙ্গায় অবগাহন স্নান করিয়া গ্রামের মধ্যে যাইয়া মাধুকরী করিলাম। উত্তরকাশীতে এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া হৃষিকেশের দিকে আবার চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে যখনই পরিশ্রান্ত হইতাম তখনই বৃক্ষতলায় বিশ্রাম করিতাম। পাহাড়ী পল্লীতে গিয়া মাধুকরী করিতাম এবং আবার চলিতে আরম্ভ করিতাম।

এইভাবে কয়েকদিনের মধ্যে দেরাদুন হইয়া হৃষিকেশে উপনীত হইলাম।

॥ হৃষিকেশে অবস্থান ॥

হৃষিকেশে ফিরিয়া পূর্বের কয়েকজন সন্ন্যাসী-বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। কেদার-বদরীতে যাত্রা করিবার পূর্বে হৃষিকেশে গঙ্গার ধারে ফুসঘাস ও গাছের ডাল নিয়া একটি ঝুপড়ী তৈয়ারী করিয়া তাহাতে থাকিতাম ও তপস্যা করিতাম। আমরা নিরাপদে ফিরিয়া আসাতে মহাত্মাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। বিশেষ করিয়া সেই নানকপন্থী পাঞ্জাবী সাধুটির আতিথেয়তার কথা আজও ভুলিতে পারি নাই। পূর্বেকার মতো ঘাসের একটি ঝুপড়ী তৈয়ারী করিয়া আমি ও তুলসী কিছুদিন হৃষিকেশে ছিলাম। সমগ্র উত্তরাঞ্চলে তখন কৈলাসমঠের মোহান্ত ধনরাজগিরির নাম প্রসিদ্ধ। তিনি শুধুই অদ্বিতীয় ষড়্দর্শনবিৎ পণ্ডিত ছিলেন না, একজন যথার্থ বৈরাগ্যবান জ্ঞানী সন্ন্যাসী-মহাত্মা ছিলেন। আমি প্রতিদিন তাঁহার নিকট শাঙ্করভাষ্যসমেত বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। আমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অপূর্ব শাস্ত্রবিচারশৈলী লক্ষ্য করিয়া ধনরাজগিরি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মনে পড়ে, পরে স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) যখন তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে হৃষিকেশে আসিয়া ধনরাজগিরিকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তখন তিনি আমার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন: 'অভেদানন্দ? অলৌকিকী প্রজ্ঞা!' স্বামীজী শুনিয়া ভবিষ্যতে আমাকে ধনরাজ-গিরির ঐ কথা এমনই গর্বের সহিত বলিয়াছিলেন—যাহা হইতে বুঝিয়াছিলাম তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতার প্রশংসায় কতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন।

॥ শরীরে রোগ প্রার্থনা ॥

ঐ সময়ে বহু পণ্ডিত সাধু-মহাত্মার সহিত আমার পরিচয় হয়। আমি বিশেষ কঠোরতার সহিত ঐ সময়ে হৃষিকেশে থাকিয়া তপস্যা ও শাস্ত্রবিচারাদি করিতাম। একদিন মনে হইল যে, অভেদজ্ঞানই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মানুভূতির নিদর্শন এবং বিষ্ঠা ও চন্দনে সমজ্ঞান হইলে তবেই ঐ অভেদজ্ঞান সিদ্ধ হয়। আমি কিছুদিন বিষ্ঠা ও চন্দনকে সমজ্ঞান করিয়া সাধন করিলাম এবং সত্যই আমার মনে সম্পূর্ণ নির্বিকার ভাবের উদয় হইয়া আমাকে আনন্দসাগরে আপ্লুত করিল। শুধু তাহাই নয়, ভাবিলাম, অভেদজ্ঞান সিদ্ধ হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিবার একমাত্র কষ্টিপাথরই হইল শরীরের অসুস্থ অবস্থা। রোগ-যন্ত্রণায় কাতর না হইয়া যদি ব্রহ্মাবগাহী হইয়া আমার মন স্থির ও নির্বিকার থাকে তবেই বুঝিব ব্রহ্মনিষ্ঠা আমার দৃঢ় হইয়াছে। সেই-জন্য সত্যই আমি একদিন শরীরে রোগ প্রার্থনা করিলাম। আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনদিনের মধ্যেই আমি জ্বর, ব্রঙ্কাইটিস ও রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইলাম। যুগপৎ হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া ও রক্তামাশয়ে আমি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলাম। তুলসী ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িল। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের কী অপার করুণা যে, ঠিক সেই সময়ে হরিভাই (স্বামী তুরীয়ানন্দ), শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) ও সান্ন্যালমহাশয় (তখন স্বামী কৃপানন্দ) তীর্থ-পরিভ্রমণ করিতে করিতে হৃষিকেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। হৃষিকেশে তখন বহু সাধু-মহাত্মাই আমাদের চিনিতেন ও যথেষ্ট ভালবাসিতেন। তাঁহাদিগের মুখে হরিভাই ও শরৎ আমাদের হৃষিকেশে অবস্থানের কথা ও সঙ্গে সঙ্গে আমার অকস্মাৎ অসুস্থতার কথা শুনিতে পাইয়া অনুসন্ধান করিয়া আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বহুদিন পরে তাহাদিগকে দেখিয়া আমি ও তুলসী আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু তখন আমি উত্থান-শক্তিরহিত, তথাপি নির্বিকার চিত্ত এবং শরীরের অসুস্থতা

ও যন্ত্রণায় মোটেই অভিভূত নই। কিন্তু মাঝে মাঝে প্রবল জ্বরের জন্য জ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেছি। তুলসী, হরিভাই, শরৎ ও সান্ন্যাল-মহাশয় দিবারাত্র আমার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল। তিন চার-দিন পরে কিছুটা সুস্থ হইলাম। হরিভাই, শরৎ, তুলসী সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, কাশীতে অন্নপূর্ণা-মার নিকট গিয়া কিছুদিন আমার বিশ্রাম লওয়া উচিত, কারণ তাহারা সকলে উত্তরাঞ্চল পরিভ্রমণ করিবার জন্য চলিয়া যাইবে। তুলসীর বড় ইচ্ছা ছিল আরও কিছুদিন হৃষিকেশে থাকিয়া ধ্যান-ভজন করে। সুতরাং শরৎ (সারদানন্দ) প্রভৃতি পরামর্শমতো তুলসী (নির্মলানন্দ) একটি গরুর গাড়ীতে আমাকে হরিদ্বারে লইয়া আসিল এবং আমার হাতে একটি কাশীর (বারাণসী) তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া ও আমাকে গাড়ীতে বসাইয়া দিয়া নিজে হৃষিকেশে পুনরায় ফিরিয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ কাশীতে উপনীত ॥

দুর্বল ও রোগজীর্ণ শরীর লইয়া আমি একাই কাশীর দিকে রওয়না হইলাম। সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইলাম ও ক্রমাগত করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করিয়া মনে সান্ত্বনা লাভ করিলাম। স্বীয় ইচ্ছায় শরীর অসুখ প্রার্থনা করিয়া অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি বলিয়া মনে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। পথে আর কোন কিছু খাইলাম না। পরদিন পূর্বাহ্নে কাশী-ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। অন্নপূর্ণা-মার ঠিকানা আমার জানা ছিল। সুতরাং একটি টাঙ্গা ভাড়া করিয়া অন্নপূর্ণা-মার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার জীর্ণ ও দুর্বল শরীর দেখিয়া দুঃখিত হইলেন এবং আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও উপযুক্ত পথ্যাদির ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার সযত্ন সেবা-শুশ্রূষায় আমি শরীরে সামান্য শক্তি পাইলাম। কিন্তু তখনও বেশ দুর্বল। অন্নপূর্ণা-মার সেই সস্নেহ ব্যবহার ও সেবা-যত্নের কথা আমি কোনদিনই ভুলিতে পারিব না।

॥ ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত ॥

তাহার পর (কাশীতে) বংশী দত্তের বাড়ীতে যাইয়া অবস্থান করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলাম। অন্নপূর্ণা-মার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া একটি টাঙ্গা করিয়া বংশী দত্তের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম তাঁহার বাড়ীর লোকেরা আমায় বেশ আদর-যত্ন করিয়া রাখিলেন অবশ্য দুইদিন পূর্বে অন্নপূর্ণা-মার বাড়ীতে আমি অন্নপথ্য করিয়াছি প্রমদাচরণ মিত্র তখন কাশীতেই থাকিতেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। কাশীতে আমার আগমনের সংবাদ পাইয়া তিনি একদিন দেখিতে আসিলেন এবং বলিলেন, নরেন্দ্রনাথ (স্বামী

বিবেকানন্দ) গাজীপুর হইতে কাশী আসিয়া তাঁহারই বাড়ীতে ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাগত আছেন। প্রমদাবাবুর বাড়ীতে লোকের বেশ অভাব ছিল, এইজন্য স্বামীজীর উপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষা হইতেছিল না —এই কথাও বলিলেন। আমি সম্পূর্ণ নিরাময় না হইলেও স্বামিজীর সেবা-শুশ্রূষা করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলাম। প্রমদাবাবু বলিলেন: 'আপনি নিজেই রোগী। এই সবেমাত্র দু'দিন হল অন্নপথ্য করেছেন, সুতরাং আপনার পক্ষে সেবা করা যুক্তিসঙ্গত হবে না।'

তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমি বিছানা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং প্রমদাববুকে তাঁহার বাড়ীতে স্বামীজীর নিকট আমাকে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। প্রমদাবাবু অগত্যা সম্মত হইলেন। একটি টাঙ্গায় আরোহণ করিয়া আমরা প্রমদাবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। স্বামীজী বহুদিন পরে আমায় দেখিয়া যেমন আনন্দিত হইলেন, তেমনি আমার রুগ্ন ও দুর্বল শরীর দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। কিন্তু তিনি শয্যাগত; দেখিলাম—ইনফ্লুয়েঞ্জায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। আমি তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় লাগিয়া গেলাম। স্বামীজী ও প্রমদামাবু উভয়ে আমায় পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কথা না শুনিয়া দিবারাত্র দুইদিন সেবা করিবার পর স্বামীজীর জ্বর ছাড়িয়া গেল এবং তাহার দুইদিন পরে তিনি অন্নপথ্য করিলেন।

এইদিকে আবার এক নূতন বিপদ আসিয়া দেখা দিল। দুই-তিনদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া দিবারাত্র স্বামীজীর সেবা করার জন্য আমি ইফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাগ্রহণ করিলাম। স্বামীজী ও প্রমদাবাবু অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। স্বামীজী তখন অন্নপথ্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার শরীরের দুর্বলতা পুরোপুরি রহিয়াছে। তথাপি স্বামীজী সমস্ত নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া আমার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ইনফ্লুয়েঞ্জা এমন ভীষণভাব ধারণ করিল যে, আমার প্রাণের আশা রহিল না। শরীরও ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নেহময় স্মৃতি আমার

সকল কষ্ট ও বেদনাকে ভুলাইয়া দিত। তুঃসহ রোগযন্ত্রণা থাকা সত্ত্বেও আমি নির্বিকারচিত্তে আত্মজ্ঞানে মগ্ন থাকিতাম এবং সর্বদাই মনে মনে আচার্য শঙ্করের রচিত স্তোত্রাংশ পাঠ করিতাম: 'চিদানন্দরূপং শিবোঽহম্ শিবোঽহম্'। তখন মনে হইত শরীর শরীরী বা আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং গীতার সেই বাণী 'আত্মা বিজ্বরো বিমৃত্যু বিশোক' আমি স্মরণ করিতাম। স্বামীজী কঠিন রোগাবস্থায় আমার মনের সেই নির্বিকার ভাব লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, স্বামীজী ও প্রমদাবাবুর সেবায় আমি কিছুটা সুস্থ হইলাম। কিন্তু শরীর অত্যন্ত তুর্বল ছিল। ইতিমধ্যে বাগবাজারে বলরামবাবুর দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া স্বামীজী কলিকাতা অভিমুখে রওয়না হইতে বাধ্য হইলেন। তিনি প্রমদাবাবুকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন যাহাতে তিনি আমার দেখাশুনা করেন। স্বামীজী সজল নয়নে আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমি শয্যাগত থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিবারাত্র স্মরণ করিতে লাগিলাম। তিন চারদিন একইভাবে গত হইলে দেখিলাম কলিকাতা হইতে শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) ও গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) আসিয়া উপস্থিত। স্বামীজী কলিকাতা পৌঁছিয়াই শরৎ ও গুপ্ত মহারাজকে আমার সেবার জন্য কাশীতে বংশী দত্তের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। শরৎ ও গুপ্তকে দেখিয়া আমার চোখে জল আসিল এবং স্বামীজীর গভীর ভালবাসার কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে লাগিলাম। শরৎ ও গুপ্ত মহারাজের যত্নে ও সেবা-শুশ্রূষায় আমি ধীরে ধীরে রোগমুক্ত হইলাম। অবশ্য সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে প্রায় চারি মাস লাগিয়াছিল।

॥ এলাহাবাদে ও পরে ঝুসিতে ॥

আমি সুস্থ হইয়া উঠিলে কাশীধাম ত্যাগ করিয়া পুনরায় পরিভ্রমণে বাহির হইতে কৃতসংকল্প হইলাম। শরৎ ও গুপ্ত মহারাজ আমাকে

তাঁহাদিগের সহিত কাশীতে বংশী দত্তের বাড়ীতেই থাকিবার জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু আমি মাধুকরী করিয়া ভারতবর্ষের সকল তীর্থ পরিভ্রমণ করিব স্থির করিলাম। সুতরাং শরৎ ও গুপ্ত মহারাজের নিকট বিদায় লইয়া আমি একাকী এলাহাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। শরৎ ও গুপ্ত মহারাজ কিছুদিন কাশীতে থাকিয়া তপস্যা করিবে বলিল।

আমি এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়া তপস্যার অনুকূল একটি স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। এলাহাবাদের নিকট যমুনার পরপারে ঝুসি। ঝুসিতে বহু সাধু-সন্ন্যাসী ঝুপড়ী বা গুফায় বাস করিয়া তপস্যা করেন শুনিলাম। এলাহাবাদের তখন মাধুকরী করার কোন অসুবিধা ছিল না। আমি যমুনার ধারে ঝুসিতে একটি গুফা (ঝুপড়ীতে) থাকিয়া তপস্যা করাই স্থির করিলাম। ঝুসিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বহু সাধু-মহাত্মা যমুনার ধারে স্থানে স্থানে গুফাতে থাকিয়া তপস্যা করিতেছেন। আমিও একটি গুফার সন্ধান করিয়া তাহাতে আশ্রয় লইলাম ও ঝুসির আশেপাশের গ্রামে গিয়া পূর্বাহ্নে মাধুকরী করিতাম। প্রায় সমস্ত দিনই আমি ধ্যান-ধারণাদিতে এবং শাস্ত্রপাঠে অতিবাহিত করিতাম। ক্রমে অন্যান্য সাধু-মহাত্মাদিগের সহিত আলাপ হইল। তাঁহাদিগের সহিত বৈকালে মাঝে মাঝে শাস্ত্রবিচারাদি করিতাম।

কিছুদিন পরে দেখি, কাশী হইতে গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) অনুসন্ধান করিতে করিতে ঝুসিতে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বহুদিন পরে তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। গুপ্ত মহারাজেরও ইচ্ছা হইল ঝুসিতে থাকিয়া কিছুদিন তপস্যা করিবে আমার নিকট শাস্ত্রাদি পড়িবে। আমার গুফাটি সামান্য বড় ছিল, সুতরাং দুইজনেই এক গুফাতে থাকিলাম। দুইজনে মধ্যাহ্নে মাধুকরীতে যাইতাম। তবে কোন কোনদিন আমি আবার মাধুকরীতে যাইতাম না, গুপ্ত মহারাজ একাই যাইত এবং যাহা পাইত

তাহাই দুইজনে ভাগ করিয়া খাইতাম। প্রতিদিন বৈকালে গুপ্ত আমার নিকট 'বিচারসাগর' (হিন্দী বেদান্তগ্রন্থ) ও সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িত। প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে মাঝে মাঝে দুইজনে বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতাম। ঝুসিতে সাধন-ভজনে ও শাস্ত্রপাঠে দিন বেশ আনন্দের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইতে লাগিল।

ঝুসিতে থাকাকালে একদিনের এক ঘটনার কথা এইখানে বলি। তখন বর্ষাকাল। প্রতিদিন প্রায়ই ঝড়-বৃষ্টি হইতেছে। একদিন প্রাতঃকাল হইতে মুহুর্মুহু বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। আমার গুহার নিকটে নানকপন্থী এক হিন্দুস্থানী সাধু থাকিতেন। আমি ও গুপ্ত মহারাজ যখন মাধুকরীতে বাহির হইতাম তিনিও মাঝে মাঝে আমাদের সহিত যাইতেন। সেইদিন ভোর হইতেই বৃষ্টির সূত্রপাত দেখিয়া নামকপন্থী সাধু আমাদের সকাল সকাল ভিক্ষায় যাইবার জন্য উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন—অন্যথা উপবাস থাকিতে হইবে। আমি সাধুজীর কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলাম: 'আজ আর ভিক্ষায় যাব না, অজগর বৃত্তি[১] অবলম্বন করিব। ভগবানের কৃপা ও ইচ্ছা হলে আমার ভিক্ষা এখানে এসেই হাজির হবে।' গুপ্ত মহারাজ ঠিক আমার কথা বুঝিতে না পারিয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। উদাসী সাধুও আমার ভাবগতিক দেখিয়া নিজের গুফার দিকে চলিয়া গেলেন।

সত্যই সেইদিন আমি আর মাধুকরী করিতে বাহির হইলাম না। গুপ্ত মহারাজও আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আর ভিক্ষায় বাহির হইল না। আমরা দুইজনে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া শাস্ত্রাদি বিচার ও ধ্যান-জপে ডুবিয়া গেলাম। এইদিকে ঘটনা ঘটিল এক অপূর্ব রকমের। বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে। আমি তখন সদানন্দকে 'বিচারসাগর' ব্যাখ্যা করিতেছি। এমন সময়ে দেখি, জনৈক ভদ্রলোক

১। 'অজগর-বৃত্তি-'র অর্থ—অত্যন্ত বর্ষা হইলে প্রায় সমস্ত সর্পই আহার ধরিবার জন্য আর বাহির হইতে চায় না, বহুদিন বা কয়েকদিনের জন্য গর্তেই অতিবাহিত করে।

একটি ঝুড়িতে প্রচুর খাবার-দ্রব্য লইয়া আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। নিকটে আসিতে আমি দেখিলাম আমাদের চিরপরিচিত বরাহনগরনিবাসী মৈত্রমহাশয়। আমরা তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইলাম এবং কীভাবে তিনি আমাদের সন্ধান পাইলেন জিজ্ঞাসা করিলাম। মৈত্রমহাশয় বলিলেন: "আমি এলাহাবাদে উপস্থিত হয়ে শুনলাম যে, কালী-তপস্বী নামে একজন তিতিক্ষাবান সাধু ঝুসিতে গঙ্গার ধারে বাস ক'রে তপস্যা করছেন। কালী-তপস্বী নাম শুনে বেশ আগ্রহান্বিত হলাম এবং কালী-তপস্বী অবশ্য আপনিই হবেন এটা মনে মনে সিদ্ধান্ত করলাম। গুপ্ত মহারাজ যে এখানে আছেন তা জানতাম না। যাই হোক, আপনাকে দেখার জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং রিক্ত হস্তে সাধুদর্শন নিষিদ্ধ বলে এই সামান্য কিছু মিষ্টান্নদ্রব্য সঙ্গে এনেছি। অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে অকস্মাৎ আপনাদের এখানে পেয়ে।"

আমি ও গুপ্ত মৈত্রমহাশয়কে সঙ্গে লইয়া আমাদের গুফায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, মৈত্রমহাশয় পর্যাপ্ত পরিমাণে মিষ্টান্নাদি খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে আনিয়াছেন। আমরা মিষ্টান্নাদির কিছু অংশ সেই নানকপন্থী সাধুকে ডাকিয়া তাঁহার হস্তে দিলাম এবং বলিলাম: 'সাধুজী, গীতার যোগক্ষেমং বহাম্যহং বাণী আজ সার্থক হয়েছে।' নানকপন্থী সাধুটি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিত হইয়া তাহা স্বীকার করিয়া স্বীয় গুফা অভিমুখে চলিয়া গেলেন। মৈত্রমহাশয়ও আমাদের প্রণাম করিয়া সহর অভিমুখে রওয়না হইলেন। আমি ও গুপ্ত মহারাজ অবশিষ্ট মিষ্টান্নাদি খাদ্যদ্রব্য সানন্দে গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার করুণার কথা স্মরণ করিতে লাগিলাম এবং গুপ্ত মহারাজকে বলিলাম: 'দেখলে তো, করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কল্যাণহস্ত প্রসারিত ক'রে আমাদের পিছনে সদা-সর্বদাই রয়েছেন ও আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন।' গুপ্ত মহারাজ পরম শ্রদ্ধাসহকারে দুই হস্ত মস্তকে রাখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

॥ পুনরায় কাশী যাত্রা ॥

ঝুসিতে আরও কিছুদিন তপস্যা করিয়া পুনরায় কাশী যাওয়া স্থির করিলাম। গুপ্ত আমার সংকল্প জানিয়া আরও দিনকতক নিজে ঝুসিতে তপস্যা করিয়া অন্যান্য তীর্থস্থান ভ্রমণ করিবে মনস্থ করিল। আমি আমার সংকল্প অনুযায়ী গুপ্ত মহারাজের নিকট বিদায় লইয়া এলাহাবাদ হইতে পদব্রজে কাশী যাত্রা করিলাম। পথে যেইখানে গ্রাম পড়িত সেইখানে যাইয়া মধ্যাহ্নে মাধুকরী করিতাম এবং রাত্রে গাছতলায় কাটাইয়া কাশী অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিতাম। এলাহাবাদ হইতে কাশী পৌঁছাইতে ঠিক কয়দিন লাগিয়াছিল এখন মনে নাই। তবে কাশীতে বংশী দত্তের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) ও মতিকে (সচ্চিদানন্দ)[১] দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। শরৎ মহারাজ অন্যান্য তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া তখন কাশীতে থাকিয়া তপস্যা করিতেছিল। তখন সম্ভবত আষাঢ় মাসের গোড়ার দিক। আমি, শরৎ ও মতি সোনারপুরায় বংশী দত্তের বাগানবাড়ীতে থাকিয়াই ধ্যান ভজনাদিতে সমস্ত দিন ও রাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। একদিন শরৎ ও মতিকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা করিলাম। এই সময় মনে আছে যে, একদিন প্রমদাদাসবাবুর সহিত আমার বেশ তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। প্রমদাদাসবাবু তখন কাশীতেই থাকিতেন। যতদূর মনে আছে, আমাদের সন্ন্যাস-জীবনে ব্রত ও আদর্শ লইয়া তাঁহার সহিত একটু মতান্তর হইয়াছিল।

১। মতি (সন্ন্যাস নাম স্বামী সচ্চিদানন্দ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমণ্ডলীতে 'দীনু মহারাজ' নামে পরিচিত ছিল।

॥ বরাহনগর-মঠ অভিমুখে ॥

কাশীতে আমাদের বেশ আনন্দেই ধ্যান-জপের মধ্য দিয়া দিন কাটিতেছিল। আমার তখন কিছুদিন বিশ্রাম লইবার জন্য বরাহনগর-মঠে (কলিকাতা) ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। শরতের সহিত পরামর্শ করিলাম এবং শরৎ আমার সংকল্প শুনিয়া আনন্দিত হইল। স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) তখন ভারতের নানান স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছে। আমরা কেহই তাহার সঠিক সংবাদ জানিতাম না। শরতের নিকট শুনিলাম যে, তখন বরাহনগর-মঠে নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ), শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), তারকদাদা (স্বামী শিবানন্দ) প্রভৃতি থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যপূজাদি ও তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদির তত্ত্বাবধান করিতেছে। শশী প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের নিকট হইতে বহুদিন বিচ্ছিন্ন রহিয়াছি বলিয়া তাহাদের দেখিবারও বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল। সুতরাং শরতের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমি কাশী হইতে পদব্রজে কলিকাতা অভিমুখে রওয়না হইলাম। পূর্বেই বলিয়াছি যে, টাকা-পয়সা আমার ছিল না বা স্পর্শ করিতাম না। পথ চলিতে চলিতে মধ্যাহ্ন হইলে কোন গ্রামে যাইয়া দুই তিন বাড়ী মাধুকরী করিতাম এবং রাত্রি হইলে বৃক্ষতলে বা কোন কোন স্থানে রাত্রি যাপন করিতাম। এইভাবে চলিতে চলিতে একদিন বালী হইতে গঙ্গা পার হইয়া বরাহনগর-মঠে উপস্থিত হইলাম। একজন মাঝিকে অনুরোধ করায় সে বিনা পয়সাতেই আমাকে গঙ্গা পার করিয়া দিয়াছিল।

বরাহনগর-মঠে উপস্থিত হইতেই শশীর (রামকৃষ্ণানন্দ) সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইল। শশী অকস্মাৎ দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। উভয়ের চক্ষে তখন জল! কিছুক্ষণ উভয়েই কোন কথা কহিতে পারিলাম না। অল্পক্ষণ পরে শশী জিজ্ঞাসা করিল: 'এতদিন ছিলে কোথায়?' আমি বলিলাম: 'তীর্থভ্রমণে।'

শশী বলিল : 'আমি কিন্তু ভাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা, আরাত্রিক প্রভৃতি সেবা) লইয়াই দিবারাত্রি কাটাইতেছি।' আমি বলিলাম : 'শশী, আমাদের মধ্যে তুমিই যথার্থ ভাগ্যবান। তোমার ওপর শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ করুণা।'

ইতিমধ্যে নিরঞ্জন ও তারকদাদা আমার গলার শব্দ শুনিয়া আসিয়া আমাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইল। বহুদিন পরে গুরুভ্রাতাদের এই মিলন আমার স্মৃতিপথে শ্রীশ্রীঠাকুরের সংস্পর্শে আমাদের সেই অতীতের সকল কথাই একে একে স্মরণ করাইয়া দিল। আমার চক্ষে জল আসিল। অতি কষ্টে সামলাইয়া লইয়া নিরঞ্জন ও তারকদাদাকে আলিঙ্গন করিলাম।

॥ বরাহনগর-মঠ ॥

বরাহনগর-মঠের অবস্থা তখন মোটেই ভাল ছিল না। কোন রকমে কোন ভক্ত কোনদিন যাহা কিছু দিতেন তাহাতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও ভোগ এবং লাটু, শশী, শরৎ, নিরঞ্জন, তারকদাদা এবং আরও দুই-একজনের একবেলা চলিয়া যাইত। শশী দিবারাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় আত্মভোলা হইয়া থাকিত। ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন ছিল তাহার শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যসেবা। নিরঞ্জন ও তারকদাদা মাঝে মাঝে কলিকাতা ও কাছাকাছি ভক্তদের বাড়ীতে যাইত। আমি বহুদিন পরে ফিরিয়া আসাতে শশী ও নিরঞ্জন যেন মনে নূতন শক্তি পাইল। আমি তাহাদিগের সহিত একসঙ্গে বরাহনগর-মঠে বাস করিতে লাগিলাম। ভক্তগণ কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে বৈকাল ও সন্ধ্যার দিকে আসিলে তাঁহাদিগের সহিত আমি আলাপ-আলোচনা করিতাম। কোনদিন শাস্ত্রপাঠ এবং শাস্ত্রালোচনাও হইত। মোটকথা, সাধন-ভজন ও শাস্ত্রালোচনায় বরাহনগর-মঠে আমাদের দিনগুলি বেশ কাটিতেছিল।

কিন্তু নানা কারণে বরাহনগর-মঠে আর অধিক দিন থাকা আমার

পক্ষে সম্ভব হইল না। একদিন শশী গোপনে আমায় জানাইল যে, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও সমাগত লোকের সহিত শাস্ত্রালোচনা করার জন্য জনৈক গুরুভ্রাতা আমার উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছে এবং অনতিবিলম্বে মঠ হইতে আমাকে বিতাড়িত করার জন্য চক্রান্ত চলিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শশী বলিল, ঐ গুরুভ্রাতার মতে শাস্ত্রাধ্যয়ন করা নাকি অন্যায়, কেননা শ্রীশ্রীগুরুদেব পরমহংসদেব সেইজন্য লেখাপড়া করেন নাই। নিরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিলে সেও দুঃখিত অন্তরে আমাকে সেই গুরুভ্রাতার বিরূপ মনোভাবের কথা জানাইল। আমি নিরুপায় হইয়া এক উপায় নির্ধারণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে অহঃরহ স্মরণ করিতে লাগিলাম। পরিশেষে স্থির করিলাম, অযথা মঠে অশান্তি সৃষ্টি করা অপেক্ষা মঠ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। আমি আমার সংকল্প শশী ও নিরঞ্জনকে গোপনে জানাইলাম। তাহারা আমাকে মঠ ছাড়িয়া যাইতে নিষেধ করিল ও বলিল, শ্রীশ্রীঠাকুরকে আশ্রয় করিয়া তাহাদিগের সহিত মঠে থাকাই ভাল। কিন্তু দুরভিসন্ধির কথা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল এবং আমার জন্য কেহ অসচ্ছন্দতা অনুভব করে তাহা আমি চাহি না। বরাহনগর-মঠ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াই আমি শ্রেয়ঃ মনে করিলাম। লাটু আমার মঠত্যাগের কথা জানিতে পারিয়া আমাকে বার বার মঠে থাকিবার জন্য একান্তভাবে অনুরোধ করিতে লাগিল। আমি লাটুকে বুঝাইলাম—ভাই, আমার জন্য কেহ অসুবিধা অনুভব করিবে তাহা আমি চাহি না। নরেন্দ্রনাথও মঠে নাই, সুতরাং আমার এই অবস্থায় মঠে না থাকাই ভাল। লাটুর চক্ষে জল দেখিতে পাইয়া মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইলাম। সংকল্প করিলাম, আর কোনদিন বরাহনগর-মঠে ফিরিব না।

॥ আমার বরাহনগর-মঠ ত্যাগ ॥

তাহার পরদিন গোপনে বরাহনগর-মঠ ত্যাগ করিয়া যাইব স্থির

করিলাম। কিন্তু ভোর হইতে না হইতে দেখিলাম, সমস্ত আকাশ জুড়িয়া কৃষ্ণ মেঘ। মাঝে মাঝে বজ্রপাতের শব্দ হইতেছিল। ক্রমে বৃষ্টি আসিল। আমি কিন্তু কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ঠাকুরঘরে উপস্থিত হইলাম এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া গঙ্গার দিকে চলিতে লাগিলাম। অত্যন্ত দুর্যোগের জন্য গঙ্গায় বিশেষ নৌকা ছিল না। কোন রকমে এক মাঝিকে অনুরোধ করিয়া তাহার নৌকায় চড়িয়া বসিলাম এবং গঙ্গা পার হইয়া বালী ষ্টেশনের দিকে চলিতে লাগিলাম। হাতে পয়সা ছিল না, সুতরাং বালী-ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া খালি পায়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। পথে দুই তিন বাড়ী মাধুকরী করিয়া একবেলা কোনরকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতাম ও আবার পথ চলিতে থাকিতাম। এইভাবে গয়ায় উপস্থিত হইলাম। গয়ায় ফল্গুনদীতে স্নান করিয়া বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করিলাম এবং যাত্রীদিগের নিকট মাধুকরী করিয়া খাইয়া আবার কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

॥ আমার পরিব্রাজকজীবন ॥

প্রতিদিন অবিরাম নিঃসঙ্গ অবস্থায় আমি পথ চলিতেছি। মধ্যাহ্নে ভিক্ষা করিয়া যাহা জুটিত তাহা খাইতাম এবং সন্ধ্যা হইলে পুর্ব পুর্ব-বারের ন্যায় বেশীর ভাগ সময় গাছতলায় রাত্রি অতিবাহিত করিতাম। ক্রমে কাশীতে উপনীত হইলাম। কাশীতে গঙ্গায় স্নান করিয়া একটি সত্রে ভিক্ষা করিলাম। কাশীতে পুর্বে বহুদিন কাটাইয়াছি। সুতরাং কাশী পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াগ ও এলাহাবাদের দিকে রওয়না হইলাম। একাকী হইলেও শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মরণ-মননই আমার সহায় সম্বল ছিল। ক্রমে প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া গঙ্গায় স্নান করিয়া নিকটস্থ গ্রামে গিয়া মাধুকরী করিলাম। প্রয়াগে বা এলাহাবাদে আর থাকিবার ইচ্ছা হইল না। পথচলার ইতিহাসও আমার এক ধরণেরই ছিল। আমি এলাহাবাদ অতিক্রম করিয়া প্রথমে আগ্রায় ও পরে

দিল্লীতে উপস্থিত হইলাম। দিল্লীতে দুই-একদিন অতিবাহিত করিয়া জয়পুর, উদয়পুর, খেতড়ি, আবু, গিরণার প্রভৃতি দর্শন করিলাম। ঐ সকল দেশে ভ্রমণকালে নরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রবল বাসনা মনে উদিত হইল। আমি নর্মদা-নদী পার হইয়া জুনাগড় অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে পোরবন্দরে শঙ্কর পাণ্ডুরাঙের বাড়ীতে অতিথি হইলাম। শঙ্কর পাণ্ডুরাঙ্ মহাশয়ের নিকট শুনিলাম যে, সচ্চিদানন্দ নামে ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ একজন বাঙালী সন্ন্যাসী কিছুকাল পূর্বে পোরবন্দরে আসিয়াছিলেন। 'সচ্চিদানন্দ' নামী সন্ন্যাসীকে আমি চিনিতে পারিলাম না। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, নরেন্দ্রনাথই 'সচ্চিদানন্দ' এই ছদ্ম নাম লইয়া গুজরাট ও কচ্ছদেশ ভ্রমণ করিতেছিল।

॥ শঙ্কর পাণ্ডুরাঙের বাড়ীতে ॥

পণ্ডিত পাণ্ডুরাঙের মুখে ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ বাঙালী সন্ন্যাসীর সংবাদ পাইয়া মন অত্যন্ত উতলা হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসীর হাবভাব, চেহারা ও গায়ের রঙ কিরূপ ছিল জিজ্ঞাসা করিয়া নরেন্দ্রনাথের কথাই স্মরণ হইতে লাগিল।

শঙ্কর পাণ্ডুরাঙ্ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি সেই সময় অথর্ববেদ সংকলন করিয়া মুদ্রিত করিতেছিলেন। তিনি আমার সহিত শাস্ত্রালাপে সন্তুষ্ট হইয়া কিছুদিন তাঁহার বাড়ীতে থাকিতে আমায় অনুরোধ জানাইলেন। আমি দুই-একদিন সেইখানে থাকিতে সম্মত হইলাম, কেননা ভাবিলাম, যদি কোনরকমে সেইখানে নরেন্দ্রনাথের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। প্রতিদিন পণ্ডিত পাণ্ডুরাঙের সহিত নানা শাস্ত্র লইয়া আলাপ-আলোচনা হইত। তিনি আমার প্রখর বুদ্ধি ও বিচারপদ্ধতিতে বিশেষ সন্তুষ্ট হন। আমি দুইদিন সেইখানে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তৃতীয় দিনে পণ্ডিতজীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলাম। তিনি আরও দুই-চারিদিন তাঁহার বাড়ীতে

থাকিবার জন্য আমায় অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সেইখানে নরেন্দ্রনাথের দেখা পাইলাম না বলিয়া মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি অগত্যা তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া জুনাগড়ের দিকে রওয়না হইলাম।

॥ নরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎলাভ ॥

জুনাগড়ে উপস্থিত হইয়া লোকপরম্পরা শুনিলাম যে, সেইখানকার নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারী গুজরাটী ব্রাহ্মণ মনসুখরাম সূর্যরাম ত্রিপাঠীর বাড়ীতে একজন উচ্চ ইংরাজীশিক্ষিত বাঙালী সন্ন্যাসী কয়েক-দিন যাবৎ বাস করিতেছেন। অনুসন্ধানে জানিলাম, সন্ন্যাসীর নাম সচ্চিদানন্দ। শুনিয়া ভাবিলাম, এই ছদ্মবেশী সচ্চিদানন্দ নরেন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য আর কেহ নহে। আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে মনসুখরাম সূর্যরাম ত্রিপাঠীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়াই দেখি—আমার অনুমান সত্য। অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বহুদিন পরে সাক্ষাৎলাভ করিয়া আমিও চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারিলাম না। সৌভাগ্যের বিষয়, আমি যখন সেইখানে উপস্থিত হইলাম, তখন নরেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী মহাশয়ের সহিত অদ্বৈত-বেদান্তের কোন বিষয় লইয়া বিচার করিতেছিল। ত্রিপাঠী মহাশয় একজন বিচক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিল। ত্রিপাঠী মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়া আমায় নমস্কার করিয়া সাদরে বসিতে অনুরোধ করিলেন। আমি উপবেশন করিলে নরেন্দ্রনাথ আমার দিকে চাহিয়া ত্রিপাঠী মহাশয়কে বলিল: 'ইনি অদ্বৈতবেদান্তী, আমার গুরুভ্রাতা। এবার ইনিই আপনার সঙ্গে শাস্ত্রবিচার করবেন।' আমি তো অবাক্। পরিশ্রান্ত শরীর। তাহার পর বহুদিন পরে নরেন্দ্রনাথের সন্ধান পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছি। কোথায় দুই দণ্ড নরেন্দ্রনাথের সহিত

আলাপ করিব, না নরেন্দ্রনাথই আহ্বান করিয়া বসিল ত্রিপাঠী মহাশয়ের সহিত শাস্ত্রবিচার করিবার জন্য। যাহা হউক, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা শিরোধার্য করিয়া আমি পণ্ডিতজীর সহিত সংস্কৃত ভাষায় অদ্বৈতবেদান্তের কয়েকটি তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলাম। ত্রিপাঠী মহাশয় পূর্বপক্ষ অবলম্বন করিয়া আমায় প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং আমি একে একে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলাম। নরেন্দ্রনাথ প্রসন্নমুখে আমার সকল উত্তর শুনিতেছিল। পরিশেষে পণ্ডিতজী আমার উত্তরে অত্যন্ত খুসী হইয়া করযোড়ে আমায় নমস্কার করিলেন। দেখিলাম, নরেন্দ্রনাথের অন্তরে আনন্দ আর ধরে না। গুরুভাইয়ের কৃতকার্যতায় তাহার মুখ তখন গরিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে!

ত্রিপাঠী মহাশয় সাদরে আমায় বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিয়া নরেন্দ্রনাথের সহিত আমার আহারের বন্দোবস্ত করিবার জন্য বাড়ীতে আদেশ করিলেন। আমাদের আহার সমাপ্ত হইলে আমি নরেন্দ্রনাথকে একান্তে পাইয়া বরাহনগর-মঠের যাবতীয় ঘটনার কথা জানাইলাম এবং বলিলাম—কোনদিনই আর বরাহনগর-মঠে আমি ফিরিয়া যাইব না। নরেন্দ্রনাথ বরাহনগর-মঠের আদ্যোপান্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল এবং আমার দিকে চাহিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিল: 'ভাই, তুমি শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান। তোমাদের লইয়াই মঠ। তোমরা মঠে না গেলে মঠ আর কাহার জন্য?' আমার চক্ষে জল আসিল। নরেন্দ্রনাথ সস্নেহে কাছে টানিয়া লইয়া আমায় সান্ত্বনা দিতে লাগিল। সেইদিন তাঁহার স্নেহের আশ্বাসের কথা আমি কোনদিনই ভুলিতে পারিব না। আমি অগত্যা মত পরিবর্তন করিয়া পুনরায় মঠে যাইব বলিয়া আমার অভিমত জানাইলাম। নরেন্দ্রনাথ যেন আশ্বস্ত হইল দেখিলাম।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমি বরাবরই নগ্নপদে সমস্ত দেশভ্রমণ করিতেছিলাম। নরেন্দ্রনাথ আমার নগ্নপদ দেখিয়া বলিল: 'এভাবে

এদেশে খালি পায়ে ভ্রমণ করা তোমার উচিত নয়। কথা না শোন, ভুগতে হবে শেষে।' বলা বাহুল্য যে, মহাপুরুষের বাক্য প্রায় দেড় বৎসর পরে সফল হইয়াছিল। আমি যখন (কলিকাতা) আলমবাজার-মঠে ফিরিয়া গিয়াছিলাম, তখন সত্যই পায়ে গিনি-ওয়ার্ম (নাহারু) দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলাম।

॥ দ্বারকার পথে ॥

পণ্ডিত মনসুখরাম স্থর্যরাম ত্রিপাঠীর অনুরোধে আমি তিন চারিদিন নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে আনন্দের সহিত থাকিয়া দ্বারকাভিমুখে রওয়না হইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। পরিশেষে নরেন্দ্রনাথের নিকট বিদায় লইলাম। দেখিলাম, নরেন্দ্রনাথের দুই চক্ষে জল। কাশীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত সেই আনন্দময় দিনগুলির কথা তখন মনে পড়িল। আমিও চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারিলাম না। অভিন্নহৃদয় নরেন্দ্রনাথের নিকট বিদায় লইবার সময় নরেন্দ্রনাথও দুই-একদিনের ভিতর বোম্বাই যাত্রা করিবে জানাইল। পণ্ডিতজীও সাশ্রুনয়নে আমায় বিদায় দিলেন। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করিয়া দ্বারকা-অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া দ্বারকাজীর মন্দির দর্শন করিলাম এবং সেইখানে এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রভাসতীর্থ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্রভাসতীর্থেও একদিন কাটাইলাম। সেইখান হইতে বোম্বাই যাইব স্থির করিলাম। কিন্তু কিভাবে সমুদ্র পার হইব এই কথা চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ দেখি, একজন গুজরাটী শেঠ আসিয়া আমায় অভিবাদন করিয়া হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'মহাত্মাজী, আপনি কোথায় যাবেন?' আমি বলিলাম: 'বাবা, বোম্বাইয়ে।' তিনি আমায় জাহাজের টিকিটের জন্য কিছু টাকা দিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম: 'বাবা, আমি টাকা-পয়সা স্পর্শ করি না। আপনি যদি বোম্বাইয়ের একটি ডেকের টিকিট কিনে দেন

তো ভাল হয়।' শেঠজী সানন্দে সম্মত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর একটি টিকিট কিনিয়া দিলেন এবং প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। ভাবিলাম—সমস্তই পরমহংসদেবের অশেষ করুণা।

॥ পুনরায় নরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎলাভ ॥

আমি জাহাজে বোম্বাইয়ে পৌঁছিলাম। বোম্বাই সহর পরিভ্রমণ করিয়া সেইখান হইতে মহাবালেশ্বরে উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম, মহাবালেশ্বরে নরোত্তম মুরারজী গোকুলদাস মহাশয় অতিথি-সৎকার-পরায়ণ ভদ্রলোক। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া গোকুলদাসজীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখি, নরেন্দ্রনাথ একদিন পূর্বেই সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় নরেন্দ্রনাথের সহিত সেই-খানেও দেখা হইল। গোকুলদাসজী আমাকে নরেন্দ্রনাথ তথা স্বামী সচ্চিদানন্দজীর গুরুভ্রাতা জানিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্র-নাথ আমাকে হাস্য করিয়া বলিল: 'ভাই, তুমি অযথা আমার পিছু নিয়েছ কেন? আমরা দু'জনেই শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নিয়ে বার হয়েছি, স্বাধীনভাবে দু'জনেরই পরিভ্রমণ করা ভাল।' আমি শুনিয়া বলিলাম: 'আমি তোমার পিছু নেব কেন? আমি ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পৌঁছেচি। তুমিও তাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় দু'জনের মধ্যে আবার মিলন হ'ল। আমি ভাই ইচ্ছা ক'রে তোমার পিছু নেই না জানবে।' নরেন্দ্রনাথ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। আমি বলিলাম: 'এবার আমি পুণা, বরোদা, দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি হয়ে দক্ষিণ ভারতের দিকে রওয়না হব। তুমি ভাই যাও উত্তরদিকে, তাহলে আমাদের মধ্যে মিলন হওয়ার কোন সুযোগ থাকবে না।' নরেন্দ্রনাথ পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। গোকুলদাসজী আমাদের কথোপকথন শ্রবণ করিলেও তাহার মর্ম কিছু অনুধাবন করিতে পারিলেন না, কেবল বলিলেন: 'আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনাদের ন্যায় দু'জন মহাপুরুষকে আজ একসঙ্গে লাভ করেছি।'

যাহা হউক, গোকুলদাসজীর একান্ত অনুরোধে আমি মাত্র তিনদিন তাঁহার বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথের সহিত অতিবাহিত করিয়া চতুর্থ দিনে পুণা অভিমুখে রওয়না হইব স্থির করিলাম এবং নরেন্দ্রনাথকে সেই সংকল্প জানাইলাম। নরেন্দ্রনাথ বলিল : 'শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নিয়ে যখন বার হয়েছি তখন তিনি আমাদের দু'জনেরই মঙ্গল-বিধান করবেন।' আমি নরেন্দ্রনাথ ও গৃহস্বামী নরোত্তম মুরারজী গোকুল-দাসের নিকট বিদায় লইয়া পুণা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

॥ পুণার পথে ॥

পুণার কতকগুলি দর্শনীয় স্থান দেখিয়া আমি ক্রমশঃ বরোদা, নাসিক প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইলাম। অরণ্য-সমাকুল দণ্ডকারণ্য দর্শন করিয়া ত্রেতাবতার শ্রীরামচন্দ্রের অপূর্ব লীলার কথা মনে হইতে লাগিল, আর মনে হইতে লাগিল, সেই এক অতীত দিনের কথা—যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া নরেন্দ্রনাথকে নিকটে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন : 'যেই রাম যেই কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ। কিন্তু তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।' ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ একাধারে যে ত্রেতায় রামচন্দ্র ও দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সেই কথাই তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় আমাদিগের নিকট ও সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বসমক্ষে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। অপূর্ব শ্রীভগবানের লীলা! এই লীলা একমাত্র ভাগ্যবানেরাই প্রত্যক্ষ করেন। আমাদের জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব মানবলীলা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

॥ দক্ষিণ-ভারত পরিভ্রমণ ॥

আমি ক্রমে দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান ও সেইখানকার অপূর্ব মন্দিরভাস্কর্য দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলাম। দক্ষিণ-ভারতে মুসলমান অভিযান বিশেষভাবে হয় নাই বলিয়া মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তিগুলি

ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। মন্দিরের বিস্তৃত চত্বর ও গোপুরমগুলি দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরগুলিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। আমি তাপ্তী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি পুণ্যতোয়া নদীতে স্নান করিয়া ভিক্ষা করিতে করিতে কখনও পদব্রজে এবং কখনওবা রেল-গাড়ীতে করিয়া ধীরে ধীরে সেতুবন্ধ-রামেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে রামেশ্বরে উপস্থিত হইলাম। সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে তিনটি সমুদ্র একসঙ্গে মিলিত হইয়া অপূর্ব এক শোভা ধারণ করিয়াছে। আমি সমুদ্রত্রয়ের সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়া রামেশ্বর-শিব দর্শন করিলাম। রামেশ্বর-মন্দিরের নাটমন্দিরটি সহস্র কারুকার্যময় স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের মধ্যে প্রদীপের আলোকে স্বর্ণালঙ্কার সজ্জিত শিবমূর্তির শোভা অপূর্ব দেখাইতেছিল। আমি রামেশ্বরে তিনদিন যাপন করিয়া চতুর্থ দিনে ফিরিবার পথে মাদুরায় মীনাক্ষী দেবীর মন্দির দর্শন করিলাম। দক্ষিণ-ভারতে এত বড় মন্দির ও মন্দিরের কারুকার্য প্রায় দেখা যায় না। মাদুরা হইতে পদব্রজে ত্রিচিনাপল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে মাধুকরী করিতাম। এই দেশে সাধু-সন্ন্যাসীদিগের উপর লোকের অসাধারণ শ্রদ্ধা দেখিলাম। ত্রিচিনাপল্লী পৌঁছিয়া আমি শ্রীরঙ্গমের দিকে যাত্রা করিলাম এবং শ্রীরঙ্গনাথকে দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থতা লাভ করিলাম।

ত্রিচিনাপল্লীতে একদিন রাত্রিবাস করিয়া তাঞ্জোর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। তাঞ্জোরে বিভিন্ন মন্দির দর্শন করিয়া কুম্ভকোণম্, কাঞ্চী, পক্ষীতীর্থ প্রভৃতি দর্শন করিলাম। কুম্ভকোণমে ত্রিশ বৎসর যাবত মৌনী এক দক্ষিণী সাধুকে দর্শন করিলাম। তিনি মহাত্যাগী ও বিচারী। তাঁহাকে দেখিয়া মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। কাঞ্চীর বিরাট মন্দিরও দেখিবার মত সামগ্রী। মন্দিরের স্বর্ণচূড়া রৌদ্রে যেন সর্বদা ঝলমল করিতেছিল। অসংখ্য কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত স্তম্ভবিশিষ্ট সুপ্রশস্ত নাটমন্দিরের দৃশ্য বিস্ময়কর। কাঞ্চীমন্দিরের পার্শ্বে দ্রাবিড়ী পণ্ডিতগণ সুমধুর স্বরে সামগান করিতেছেন দেখিলাম। নটরাজের মূর্তি

দর্শন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম। মন্দির ও নাটমন্দিরের চতুর্দিকে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত। দেখিলে মনে হয়, এককালে কাঞ্চীর সৌন্দর্য ও গৌরব ভারতের চতুর্দিকে বিঘোষিত ছিল। কাঞ্চী দক্ষিণ-ভারতের কাশী বারাণসী। অসংখ্য যাত্রীর সমাগমে কাঞ্চীর মন্দির সর্বদা মুখরিত। দক্ষিণ-ভারতের বৈশিষ্ট্য হইল, খালি গায়ে মন্দিরে দেবতাদের দর্শন করিতে হয়। অতি পবিত্র পরিবেশ! সত্যই বিশুদ্ধ আনন্দের সঞ্চার করে।

॥ মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন ॥

আমি কাঞ্চী ও অন্যান্য পার্শ্ববর্তী মন্দির দর্শন করিয়া মান্দ্রাজ সহরে উপস্থিত হইলাম। সুদীর্ঘ দিন পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়াছি বলিয়া বেশ পরিশ্রান্ত অনুভব করিতে লাগিলাম। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলাম। তাহা ছাড়া নরেন্দ্রনাথের সেই কথা ক্রমাগত কর্ণপথে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল: 'তুমি শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান। তোমাদের নিয়েই মঠ। তোমরা মঠে না গেলে মঠ কাহার জন্য।' সত্যই, মান অভিমান প্রভৃতি বিসর্জন দিয়া পরিব্রাজক জীবন গ্রহণ করিয়াছি। ভাবিলাম, রাগ আর কাহার উপর করিব! গুরুভাইদের উপর? গুরুভাইয়েরাই তো শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ! তাহাদের লইয়াই তো শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা! তাহা হইলে রাগ ও অভিমান আর কাহার উপর করিব। সুতরাং কলিকাতায় ফিরিয়া পুনরায় মঠে গিয়া গুরুভাইদের সহিত একসঙ্গে বাস করাই কর্তব্য।

আমি তখন কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিব স্থির করিয়া একটি বৃক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে একজন দক্ষিণী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক আমায় ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি যাইব কোথায়। আমি ইংরাজীতে তাঁহাকে জানাইলাম যে, আমার গন্তব্য-স্থল বর্তমানে কলিকাতা, কিন্তু পথশ্রান্ত ও বহুদিন তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া

বেড়াইবার জন্য ক্লান্ত ও দুর্বল, সেইজন্য কি করিব ঠিক করিতে পারিতেছি না। ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: 'আপনি কি জাহাজে কলকাতায় যেতে চান? একটি জাহাজ মাদ্রাজ-বন্দর থেকে এখুনি কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করবে। আপনি কি এই জাহাজেই কলিকাতা যেতে চান?' আমি বলিলাম: 'তাতে আমার আপত্তি কি।' তিনি তখন মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় যাইবার টিকিটের টাকা তাঁহার পকেট হইতে বাহির করিয়া আমার হস্তে দিতে উদ্যত হইলেন। আমি ভদ্রলোককে জানাইলাম যে, আমি অর্থ স্পর্শ করি না। সুতরাং তিনি যদি নিজে কলিকাতার একটি চতুর্থ শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া দেন তবে আনন্দিত হইব। ভদ্রলোক সানন্দে সম্মত হইয়া আমায় তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং জাহাজের টিকিট-ঘর হইতে একটি চতুর্থ শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া আমার হস্তে দিয়া প্রণাম করিলেন। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপার কথা স্মরণ করিয়া অভিভূত হইলাম এবং মাদ্রাজ হইতে চতুর্থ শ্রেণীর ডেক-প্যাসেঞ্জার হইয়া কলিকাতা অভিমুখে রওয়না হইলাম। জাহাজে উঠিবার পূর্বে কিছু চিড়া মাধুকরী করিয়াছিলাম, সুতরাং তিনদিন যাবৎ ঐ চিড়া লবণাক্ত সমুদ্রজলসিক্ত করিয়া ভক্ষণ করিতাম। ক্রমে কলিকাতার বন্দরে জাহাজ নঙ্গর করিল। তিনদিন বিশাল সমুদ্রবক্ষে প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য উপভোগ করিয়া কাটাইয়াছি এবং সঙ্গে একমাত্র সম্বল ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর স্মৃতি ও আশীর্বাদ।

॥ আলমবাজার-মঠে ॥

কলিকাতা-বন্দরে অবতরণ করিয়া বরাহনগরের দিকে পদব্রজে রওয়না হইলাম। পথে একজন পরিচিত ভক্তের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, মঠ তো এখন আর বরাহনগরে নাই, আলমবাজারে উঠিয়া গিয়াছে। শুনিয়া মনে আনন্দ হইল, কেননা আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া-

ছিলাম, বরাহনগর মঠে আর ফিরিব না। সুতরাং আমার বাক্যও রক্ষিত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র ইচ্ছাই এই বিষয়ে বলবৎ বুঝিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ক্রমে আলমবাজার-মঠে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, আমার পূর্বপরিচিত আলমবাজার হইতে লোচন ঘোষের ঘাটে যাইবার রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে ঐ মঠবাড়ী অবস্থিত। আমি গলির ভিতর দিয়া সদর-দরজা দিয়া মঠবাড়ীতে প্রবেশ করিলে শরৎ ও শশীর সহিত প্রথমে সাক্ষাৎ হইল। শশী আনন্দে অধীর হইয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল এবং শরৎ আমার হাত ধরিয়া দোতলায় দক্ষিণদিকের বারাণ্ডায় লইয়া গেল। ক্রমে একে একে সকলে আসিয়া আমার কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। শশী আগ্রহান্বিত হইয়া নরেন্দ্রনাথের কোন সংবাদ জানি কিনা জিজ্ঞাসা করিল। আমি জুনাগড়ে ও মহাবালেশ্বরে নরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি এবং নরেন্দ্রনাথ 'সচ্চিদানন্দ' ছদ্মনাম লইয়া সমগ্র দেশ ভ্রমণ করিতেছে জানাইলাম। আমার মুখে নরেন্দ্রনাথের সংবাদ পাইয়া সকলেই আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইল।

শুনিলাম, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর কিংবা নভেম্বর মাসে বরাহনগর হইতে আলমবাজারে নূতন মঠ স্থানান্তরিত হইয়াছে। শশী ও শরৎ (রামকৃষ্ণানন্দ ও সারদানন্দ) আমায় সমস্ত নূতন আলম-বাজার-মঠটি ঘুরাইয়া দেখাইল। দেখিলাম, সম্মুখে উঠান। তাহার পশ্চিমমুখী তিন ফোকরওয়ালা ঠাকুরদালান। উত্তরদিকে একটি ঘোরানো সিঁড়ি দোতলায় উঠিয়াছে। দোতলার দক্ষিণ ও পূর্বদিকে দুইটি বারাণ্ডা। বারাণ্ডা দুইটি লাল, নীল ও রঙ্গীন টালি দিয়া মোড়া। পূর্বদিকের বারাণ্ডার উত্তরদিকে একটি লম্বা বড় ঘর, আর তিনটি দরজা এবং সড়কের দিকে একটি গবাক্ষওয়ালা বারাণ্ডা। বড় ঘরের পূর্বদিকে একটি দরজা ও তাহার পর একটি ছোট ঘর। দক্ষিণ দিকে গবাক্ষওয়ালা বারাণ্ডা দিয়া যাইলে একটি কাঠের ঝিলিমিলি দেওয়া স্নানের ঘর। দক্ষিণ ও পূর্বদিকের বারাণ্ডায় গোল থাম ও কাঠের

বারাণ্ডা। স্নানের ঘরের পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণদিকে একটি দরজা সেইদিকে যাইবার জন্য। দক্ষিণদিকের দরজা হইতে আরম্ভ করিয়া একটি প্রশস্ত পথ। পথটির বামদিকে একটি এবং ডানদিকে সারি সারি তিনটি ঘর। উভয় পার্শ্বের দুইটি ঘরের জানালা ঐ গলির ভিতরের দিকে। বাম-দিকের ঘরটি ঠাকুর-ঘর। তাহার দরজা ও দুইটি জানালা দক্ষিণমুখী। ভিতরের দিকে একটি বাড়ী এবং তাহার সম্মুখে একটি উঠান ছিল। তাহার উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে আবার একটি ছাদওয়ালা বারাণ্ডা। কেবল পূর্বদিকে বড় একটি ছাদ এবং তাহার উপর কোন আবরণ বা ঢাকা ছিল না। ঠাকুর-ঘরের পার্শ্ব দিয়া নীচে নামিবার একটি সিঁড়ি। ঠাকুর-ঘরের সম্মুখে একটি দালান এবং তাহার পূর্বকোণে একটি ছোট ঘর—ঠাকুরের ভাঁড়ার ঘররূপে ব্যবহার করা হয়। পূর্বদিকের খোলা ছাদের পূর্বদিকে প্রাচীরের কাছে ধোঁয়া বাহির হইবার জন্য অনেক-গুলি ঘুলঘুলি। ইহার অল্পদূরে দক্ষিণদিকে একটি পায়খানা।

পশ্চিমদিকের যে তিনটি ঘর ছিল তাহাদের পশ্চিমদিকের ঘরে শশী থাকে। ঐ ঘরের জানালা হইতে বাহিরের দিকে গলি অনেকটা দেখা যায়। শশীর ঘরের উত্তরদিকে মাঝের ঘরটি আমার জন্য নির্দিষ্ট হইল। আমি সানন্দে ঐ ঘরটি বাছিয়া লইলাম।

ঠাকুর-ঘরের পার্শ্ব দিয়া যে সিঁড়ি গিয়াছে তাহা দিয়া নামিয়া গেলে নীচের তলায় বামদিকে রান্নাঘর। রান্নাঘরের দক্ষিণদিকে আর একটি এঁদো পোড়ো ঘর। রান্নাঘরের সম্মুখে দক্ষিণদিকে গেলে পূর্বদিকে একটি গলি। এই গলি শানবাঁধানো ঘাটওয়ালা একটি পুকুরে শেষ হইয়াছে। পূর্বদিকের পুকুরটি মঠবাড়ীরই অন্তর্গত। তাছাড়া উঠানের উত্তর-পশ্চিমদিকে ও বাহির বাড়ীর উপরকার হলের নীচে একতলায় গোটাকয়েক এঁদো ঘর ছিল, সেইগুলি বিশেষ ব্যবহৃত হইত না।

নূতন আলমবাজার মঠবাড়ী দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদের একটি স্থায়ী মঠবাড়ী হওয়ায় আমরা ও

ভক্তগণ বিশেষ আশ্বস্ত হইলাম। দেখিলাম, এইবার মঠের দৈনন্দিন অবস্থাও পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল। আহারেরও অনেক সচ্ছল অবস্থা। ভক্তগণ যাঁহার যেমন ক্ষমতা তেমনি খাবার-দ্রব্য মঠে লইয়া আসিতেন। শতছিন্ন সতরঞ্চির অবসান ঘটিয়ে ভক্তগণ দুই-একটি নূতন সতরঞ্চি আনিয়া দিয়াছেন। একখানি ছোট চৌকি এবং পড়ার একটি আলোও পাওয়া গিয়াছিল। মোটামুটিভাবে সকল সন্ন্যাসীদের পরিধার এক একখানি কাপড় এবং চাদরের সংস্থান হইয়াছিল। মোটকথা আলমবাজার-মঠে মা লক্ষ্মী যেন ক্রমে ক্রমে ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তুলসী (নির্মলানন্দ) ইতিপূর্বেই মঠে আসিয়া যোগদান করিয়াছিল। সে শশীকে পূজা প্রভৃতি কার্যে সাহায্য করিতে লাগিল।

॥ আলমবাজার-মঠে জীবনযাপন ॥

শশী ও শরৎ আমার থাকিবার জন্য যে ঘরখানির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল, আমি তাহাতে থাকিয়াই সমস্তদিন ধ্যান-জপ ও পড়াশোনা করিতাম। ক্রমে সকলের নিকট ঐ ঘরটি 'কালী-বেদান্তী'-র ঘর নামে পরিচিত হইয়া পড়িল। অদ্বৈতবেদান্তের আলোচনা ও বিচার এবং তাহার আদর্শে জীবন গঠন করাই ছিল তখন আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। শাঙ্করভাষ্যসহ গীতা পাঠ করিতাম এবং গীতার প্রতিটি শ্লোকের যথার্থ অর্থ বা মর্ম যতক্ষণ না বুঝিতাম, ততক্ষণ ধ্যান করিতাম এবং অর্থ উপলব্ধি করিলে আবার পরবর্তী শ্লোক পাঠ ও ধ্যান করিতাম। একমাত্র আহারের সময়ই বাহিরে আসিতাম, নচেৎ দিবারাত্র হয় শাস্ত্রাদি পাঠ ও বিচার করিতাম, নয় ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতাম। কোথায় দিয়া সময় চলিয়া যাইত বুঝিতে পারিতাম না। মাঝে মাঝে গুরুভ্রাতৃগণের সহিত শাস্ত্রাদির বিচার হইত, কিন্তু সর্বদাই সকলের জীবনের লক্ষ্য থাকিত কিভাবে অলৌকিক আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ও নির্দেশমতো জীবন গঠন করিব।

শ্রীশ্রীঠাকুরই ছিলেন আমাদের সকলের ধ্যানও জ্ঞান। শশীর তো কথাই নাই, সে সর্বদাই শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল।

॥ গিনিওয়ারম রোগে আক্রান্ত ॥

কিছুদিন যাইতে না যাইতে আমার পায়ে গিনিওয়ারমের ক্ষত দেখা দিল। আমার সমস্ত শরীর ফুলিয়া গেল এবং একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলাম। ডাক্তারকে খবর দেওয়া হইল এবং পর পর তিনি সাতবার পায়ে অস্ত্রোপচার করিলেন। চার মাস একইভাবে শয্যাশায়ী ছিলাম। এই সময়ে শরতের (সারদানন্দ) অক্লান্ত পরিশ্রমে সেবার কথা ভুলিবার নয়। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সে আমার সেবা করিয়াছে। নিরঞ্জন কিছুদিনের জন্য বাহিরে গিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া আমার সেবা-শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করিল। গুরুভ্রাতাগণের একান্ত ভালবাসার কথা কোনদিনই ভুলিতে পারিব না। তিন মাস শয্যাশায়ী থাকিবার পর ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলাম। চলচ্ছক্তি একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। শরতের (সারদানন্দের) স্কন্ধে ভর দিয়া ছোট শিশুর মতো এক পা দুই পা করিয়া প্রত্যহ হাঁটিতাম। গর্ভধারিণী মায়ের মতো নির্বিকার চিত্তে শরৎ আমার সেবা করিয়াছিল। ক্রমে চলচ্ছক্তি ফিরিয়া পাইলাম।

॥ নরেন্দ্রনাথের সংবাদপ্রাপ্তি ॥

পূর্বেই বলিয়াছি যে, আলমবাজারে মঠ উঠিয়া আসার পর শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের দুঃখ-দারিদ্র্যের কিছুটা অবসান ঘটিয়াছিল। কলিকাতা ও কলিকাতার পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তেরা মঠে আসিতেন। শনিবার ও রবিবারের তো কথাই নাই। তবে নরেন্দ্র-নাথের সঠিক কোন সংবাদ না পাওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান ও ভক্তগণের অন্তরে বেশ একটু দুঃখ ও ব্যাকুলতা ছিল। এই সময়ে একদিনের এক ঘটনার কথা বলি। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস। ইংরাজী

একটি দৈনিক কাগজে (কাগজটির নাম এখন স্মরণ নাই) মারউইন মেরী স্নেল নামে জনৈক আমেরিকান 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে একটি প্রবন্ধ সংবাদপত্রে লেখেন। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নামও জড়িত ছিল। মিষ্টার মেরি স্নেল আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের কিছু কিছু কার্যাবলীর কথা লিখিয়াছিলেন। আমরা সকলেই কাগজে পড়িলাম বটে, কিন্তু 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামের সহিত মোটেই পরিচিত ছিলাম না। আমি যখন বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলাম তখন জানিয়াছিলাম যে, নরেন্দ্রনাথ 'স্বামী সচ্চিদানন্দ' নাম লইয়া ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিতেছে। কাজেই আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের কার্যাবলীর কথা পড়িয়া আমরা মোটামুটি নির্ধারণ করিতে পারিলাম যে, 'স্বামী বিবেকানন্দ' আমাদের 'নরেন্দ্রনাথ'। 'বিবেকানন্দ'-শব্দের পিছনে 'স্বামী' যুক্ত থাকায় আমরা প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, স্বামী বিবেকানন্দ কোন একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক হইবেন। কিন্তু দুই একদিন পরে জানিতে পারিলাম, স্বামী বিবেকানন্দ আর কেহ নহেন, আমাদের প্রিয় গুরুভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ। ভারতের দর্শন ও ধর্মপ্রচারের জন্য নরেন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই কাহারও সাহায্য পাইয়া আমেরিকায় গিয়াছে। তখন আমাদিগের আনন্দের আর সীমা রহিল না। গর্বে বুক ভরিয়া গেল। আমরা নরেন্দ্রনাথের মঙ্গল কামনা করিয়া তাহার সাফল্যের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম।

ইহার কিছুদিন পরে আমেরিকা হইতে নরেন্দ্রনাথের পত্র আসিল। ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগো-সহরে বিশ্ববিখ্যাত ধর্ম-মহাসভার অধিবেশন হয়। তাহাতে বিশ্বের বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন জাতির ধর্মপ্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। নরেন্দ্রনাথও তাহার অনুরাগী ভক্ত ও বন্ধুদের অর্থ সাহায্যে আমেরিকায় যায় এবং ঐ সভায় যোগদান করে। হিন্দুধর্মের উপর তাহার ওজস্বী বক্তৃতা সভায় সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে বিমুগ্ধ ও বিস্মিত করে। তাহার প্রশংসা শুধুই শিকাগো-

ধর্মমহাসভার বেষ্টনীর মধ্যেই নয়, সমগ্র আমেরিকায় ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়ে। আমেরিকার পথে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিয়া লোকে আনন্দে অধীর হইয়া যাইত। আমেরিকায় বিভিন্ন কাগজে তাহার বক্তৃতার সারাংশ ও বক্তৃতা সম্বন্ধে অজস্র প্রশংসাসূচক মন্তব্য ও আলোচনা প্রকাশিত হয়। ঐ সভায় অনাগরিক ধর্মপাল, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতিও যোগদান করেন। নরেন্দ্রনাথের অসাধারণ বাগ্মিতায়, ওজস্বিতায় ও উদার আদর্শে যে কোন কারণেই হউক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার খ্রীষ্টান মিশনারীরা ঈর্ষা-প্রণোদিত হইয়া তাঁহার (নরেন্দ্রনাথের) বিরুদ্ধে আমেরিকাবাসীর মনে বিভ্রান্তি ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা প্রকারান্তরে প্রচার করিতেছিলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি তো নহেনই, পরন্তু তাঁহার ব্যাখ্যাত ধর্মও হিন্দুধর্ম নহে।

॥ টাউনহলে সাধারণ-সভা ॥

ইহাতে আমেরিকার মতো সুদূর ও অপরিচিত দেশে নরেন্দ্রনাথ নিজেকে বেশ বিপন্ন মনে করিল। নরেন্দ্রনাথ আমাদের লিখিয়া পাঠাইল : 'তোমরা কলিকাতায় একটি সাধারণ সভার আয়োজন করিয়া আমেরিকায় আমার কার্যাবলী সমর্থন ও সঙ্গে সঙ্গে আমি যে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি এই কথার উল্লেখ করিয়া ডক্টর ব্যারোজ প্রভৃতিকে ধন্যবাদ দিয়া একটি পত্র প্রেরণ কর। সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও উহার একটি কপি বা নকল পাঠাইয়া দিবে।' নরেন্দ্রনাথের পত্র প্রাপ্তিমাত্র আমি, শরৎ ও শশী পরামর্শ করিয়া কলিকাতা টাউন হলে একটি মহতী সভার বন্দোবস্ত করা স্থির করিলাম এবং সমগ্র হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে ডক্টর ব্যারোজ প্রভৃতির সহিত নরেন্দ্র-নাথকেও একটি প্রস্তাব ও অভিনন্দন পাঠাইয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করিলাম। আমি বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ীতে থাকিয়া কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিক ও ভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া

সভার বন্দোবস্ত করিব মনস্থ করিলাম ও তদনুসারে বলরামবাবুর বাড়ীতে চলিয়া গেলাম। শরৎ ও শশী আলমবাজার হইতে আসিয়া আমার সহিত যোগদান করিতাম। কলিকাতার গৃহস্থভক্তগণকে নরেন্দ্রনাথের কথা জ্ঞাপন করাতে সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আমাদের সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। মনোমোহন মিত্র তাঁহার অফিস হইতে আসিয়া আমাদের কার্যে সাহায্য করিতেন। আমি তখন আহার নিদ্রা ভুলিয়া উন্মাদের মতো প্রতিটি বিশিষ্ট নাগরিকের বাড়ীতে গিয়া সভায় যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতে লাগিলাম। সভায় সকল সম্প্রদায়ের এক-একজন বিশিষ্ট লোকের সমাবেশ হওয়া উচিত। সেইজন্য মাড়োয়ারী-ধর্মসম্প্রদায়ে কোন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অনুরোধ করিবার জন্য আমি হরমোহন মিত্র ও মনোমোহন মিত্রকে সঙ্গে লইয়া গমন করিলাম। তিনি নরেন্দ্রনাথের আমেরিকায় যাওয়ার কথা শুনিয়া মন্তব্য করিলেন: 'বাবুজী, হিন্দু হইয়া যাহারা বিলাত গমন করে, তাহারা তো ভ্রষ্টাচারী। তাহাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ রাখা উচিত হইবে কি?' মনোমোহনবাবু মাড়োয়ারী-ব্যবসায়ীদের সহিত বিশেষভাবে মেলামেশা করিতেন, সুতরাং তাঁহাদিগের প্রকৃতি ভাল-ভাবেই জানিতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন: 'শেঠজী, আপ্‌কো নাম তো কমিটিমে চড় গিয়া।' এই কথা শুনিবামাত্র মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের মুখে আর কোন কথা নাই। তিনি হাসিমুখে সভায় যোগদান করিবেন বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করিলেন।

কোনদিন শরৎ ও কোনদিন বা শশী আমার সঙ্গে থাকিত। তাহা ছাড়া মনোমোহনবাবু প্রভৃতি ভক্তেরাও তাঁহাদিগের সময়মতো আমার সহিত থাকিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। কলিকাতায় প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের নিমন্ত্রণ জানানো শেষ হইল। বাকী রহিল সভাপতি নির্বাচন। আমি নগেন্দ্রনাথ বসু, ভুপেন্দ্র-কুমার বসু ও মনোমোহন মিত্রের সহিত শ্রদ্ধেয় গুরুদাস বন্দ্যো-

পাধ্যায়ের বাড়ীতে গমন করিয়া তাঁহাকে সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি আমাদের সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন: 'বিবেকানন্দ নাম গুরুপ্রদত্ত নয়। তাছাড়া শাস্ত্রানুসারে শূদ্রের সন্ন্যাস দীক্ষায় অধিকার নাই। সুতরাং এসব শাস্ত্রবহির্ভূত ব্যাপারে আমি সভাপতিত্ব করতে রাজী নই।' শ্রদ্ধেয় গুরুদাসবাবু কলিকাতা হাই-কোর্টের বিচারপতি হইলেও একজন নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিয়া পূজা-জপাদি করিতেন। তাহা ছাড়া শুনিয়াছি, প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ্যধর্মকে তিনি অত্যন্ত সম্মানের আসন দিতেন। সেইজন্য তাথাকথিত শূদ্রকুলোৎপন্ন দত্তবংশীয় নরেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করিতে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। অগত্যা আমরা উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য জমিদার রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অনুরোধ জানাইলাম। তাঁহাকে সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইবার পূর্বে আমেরিকায় হিন্দুধর্মের প্রচার-ব্যাপারে নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সকল কথা বলিলাম। আমেরিকা হইতে নরেন্দ্রনাথ-প্রেরিত কতকগুলি সংবাদ-পত্রের মন্তব্যাংশ আমাদের সঙ্গে ছিল। তাহাদের মধ্য হইতে একটি মন্তব্য তাঁহাকে পড়াইয়া শুনাইতে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন: 'অতি সত্যকথা। তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) আমেরিকায় গিয়ে সমগ্র হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্মের যে সম্মান রক্ষা করতে পেরেছেন তারজন্য India should remain eternally grateful to him।' আমেরিকা হইতে প্রেরিত কাগজের মন্তব্যটি হইল: 'After hearing him (Swami Vivekananda), we feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation।' মাননীয় রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় সানন্দে সভায় সভাপতিত্ব করিতে সম্মত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন: 'সত্যই, it is foolishness to send Christian missionaries to this learned Indian nation.'

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা টাউন-হলে সাধারণ-সভার অধিবেশন হয়। কলিকাতায় গণ্যমান্য লোক ও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ও দর্শক লইয়া প্রায় চারি সহস্রেরও অধিক লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। মাননীয় রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সি. এস. আই. মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিশিষ্ট নাগরিক, পণ্ডিত, সাংবাদিক ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, কামাক্ষানাথ তর্কবাগীশ, উমাচরণ তর্করত্ন, মহেশচন্দ্র শিরোমণি, তারাপদ বিদ্যাবাগীশ, অম্বিকাচরণ ন্যায়রত্ন, শিবনারায়ণ শিরোমণি, মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,[১] মাননীয় বিচারপতি গণেশচন্দ্র চন্দ্র, বিচারপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার দীনেন্দ্রনাথ রায়, কুমার রাধাপ্রসাদ রায়, টাবার জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম. এ., বি. এল., বরিশালের জমিদার রাখালচন্দ্র চৌধুরী, ব্যারিষ্টার মন্মথ মল্লিক, ব্যারিষ্টার জে. এন. ব্যানার্জি, এ্যাটর্নী-এ্যাট-ল, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন ('ইণ্ডিয়ান মিরার'-পত্রিকার সম্পাদক), এটর্নী ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি। গাজীপুর ও অন্যান্য স্থানের ও কলিকাতার কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত থাকিতে না পারায় সভাকে সমর্থন করিয়া পত্র পাঠান। মাননীয় বিচারপতি গণেশচন্দ্র চন্দ্র সভাপতির নাম প্রস্তাব ও বাবু গুরুপ্রসন্ন ঘোষ তাহা সমর্থন করিলে রাজা পিয়ারীমোহন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলেন :

"Hon'ble Justice Gurudas Banerjee and gentlemen, I thank you heartily for having asked me to take the chair of this meeting. We are assembled here this evening to express our thankfulness not to one who has distinguished himself by his meri-

১। মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরে তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়া সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

torious services to the state or to one who has won the reputation of a triumph of statsmanship, but we assemble in this grand meeting to express our high sense of appreciation and deep gratitude to a simple Sannyasin, only thirty (?) years old, who has been expounding the truths of our religion to the great American People with an ability, tact and judgement (cheers), which have elicited the highest admiration. Brother Vivekananda has opened the eyes of an important section of the civilized world by explaining the great truths of the Hindu religion, and convinced them that the most valuable products of human thought in the regions of philosophy and religion, are to be found not in Western science and literature, but in our ancient Sastras (cheers) * * * With these words, I request my friend, Babu Narendra Nath Sen, to move the first Resolution। माननीয় নরেন্দ্রনাথ সেন সেই মন্তব্য সভা-সমক্ষে উপস্থাপন করেন ও সকলের সমর্থন লাভ করেন।

দুইটি মন্তব্য উপস্থাপন ও সমর্থন লাভ করার পর বাবু শালিগ্রাম সিংহ মহাশয় তৃতীয় মন্তব্য সভা-সমক্ষে উপস্থাপন করিয়া বলেন :

That this meeting requests the Chairman to forward to Sreemat Vivekananda Swami, Dr. Barrows and Mr. Snell, copies of the foregoing Resolutions, together with the following letter, addressed to Swami Vivekananda :

To

SREEMAT VIVEKANANDA SWAMI

Dear Sir,

As Chairman of a large representative and influential meeting of the Hindu inhabitants of Calcutta and the Suburbs, held in the Town Hall of Calcutta, on the 5th of September, 1894, I have the pleasure to convey to you the thanks of the local Hindu Community for your able representation of their religion at the Parliament of Religions that met at Chicago in September 1893.

The trouble and sacrifice you have incurred by your visit to America as a representative of Hindu Religion are profoundly appreciated by all whom you have done the honour to represent. But their special acknowledgements are due to you for services you have renderded to the cause they hold so dear, their sacred Arya Dharma, by your speeches and your ready responses to the questions of inquirers. No exposition of the general principles of the Hindu Religion could, within the limits of a lecture, be more accurate and lucid than what you gave in your address to the Parliament of Religions on Tuesday, the 19th September, 1893. And your subsequent utterances on the same subject on other occasions have been equally clear and precise. It has been the misfortune of Hindu

to have their religion misunderstood and mis represented through ages, and, therefore, they cannot but feel specially grateful to one of them who has had the courage and the ability to speak the truth about it and dispel illusions, among the strange people, in a strange land, professing a different religion. Their thanks are due no less to the audiences and the organisers of meetings, who have received you so kindly, given you opportunities for speaking, encouraged you in your work, and heard you in a patient and charitable spirit. Hinduism has, for the first time in its history, found a missionary, and by a rare good fortune it has found one so able and accomplished as yourself. Your fellow countrymen, fellow citizens and fellow Hindus feel that they would be wanting in an obvious duty if they did not convey to you their hearty sympathy and earnest gratitude for all your labours in spreading a true knowledge of their ancient faith May God grant you strength and energy to carry on the good work you have began!

Yours faithfully
(Sd) Peary Mohan Mookerjee,
Chairman.

সভার অধিবেশন ও কার্য সফল করিয়া তুলিতে যে অর্থব্যয় হইয়াছিল তাহা আমি, শরৎ, শশী, হরিমোহনবাবু ও অন্যান্য সকলে সকলের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলাম। সভার রিজলিউশন-গুলি, সভার কার্যাবলী ও স্বামীজীর উদ্দেশ্যে লিখিত সমর্থন-পত্রটি প্রেসে ছাপাইয়া সভায় বিতরণ করা হইয়াছিল এবং তিনটি পৃথক ভাল কপি ছাপাইয়া যথাক্রমে ডক্টর ব্যারোজ, মেরী স্নেল ও স্বামীজীকে হিন্দুজাতির পক্ষ হইতে যথারীতিভাবে আমেরিকায় পাঠানো হইয়াছিল। পাঠানোর পূর্বে কেবেল্ (Cable) করিয়া উহাদিগকে প্রথমে অভিনন্দনের বক্তব্য জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিছুদিন পরে স্বামিজীর নিকট হইতে আমরা মন্তব্য ও অভিনন্দন-গুলির প্রাপ্তিসংবাদ ও একটি পত্র পাইয়াছিলাম। পত্রটিতে স্বামীজী আমাদিগের কার্যের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া ভারতের ও বিশেষ করিয়া কলিকাতাবাসীকে ও আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

॥ পুনরায় তীর্থভ্রমণে ॥

ঐ সভার ব্যবস্থাদি করিতে দিবারাত্র যে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহাতে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং কিছুদিন বিশ্রাম লইবার জন্য গুরুভ্রাতাগণ আমাকে অনুরোধ করে। আলমবাজার-মঠে তিন চারিদিন বিশ্রাম লইয়া পুনরায় কিছুদিন তীর্থপর্যটনে যাইবার ইচ্ছা বলবতী হইল এবং তদনুসারে শরৎ, শশী, রাখাল মহারাজ প্রভৃতির অনুমতি লইয়া ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নৈনিতাল অভিমুখে যাত্রা করিলাম। নৈনিতালের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে আলমোড়ায় কয়েক মাস থাকিয়া তপস্যা করিবার ইচ্ছা হইল। আলমোড়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতীব মনোরম। পাহাড়গুলি জঙ্গলসমাকীর্ণ হইলেও দূরে গগনচুম্বী তুষারাবৃত পর্বতমালার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য অন্তরে সংসার-বৈরাগ্যের সৃষ্টি করিত। কয়েকখানি ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ আমার সঙ্গে ছিল এবং সময় পাইলেই সেইগুলি পড়িতাম ও ধ্যান-

বিচার করিতাম। ঐ সময় 'হিন্দু-প্রিচার' নামে একটি ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিয়া মান্দ্রাজে 'ব্রহ্মবাদীন্'-পত্রিকায় পাঠাইয়া দিই। এম. সি. আলাসিঙ্গাপেরুমল ঐ পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। তিনি আমার ঐ প্রবন্ধটি 'ব্রহ্মবাদীন্'-পত্রিকায় ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশ করেন। ঐ প্রবন্ধ লিখিবার সময় বা পূর্বে আমি কোনদিনও ভাবি নাই যে, স্বামীজীর আহবানে আমাকে একদিন ধর্মপ্রচারের জন্য পাশ্চাত্যে যাইতে হইবে। যাহা হউক, আলমোড়ায় কয়েক মাস অতিবাহিত করিয়া পুনরায় পদব্রজে আমি আলমবাজার-মঠে উপস্থিত হইলাম। আসিয়া আমেরিকার সর্বত্র স্বামীজীর সাফল্যের কথা শুনিয়া আনন্দ ও গর্ব অনুভব করিতে লাগিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের আদরের নরেন্দ্রনাথ অলৌকিক আচার্যের শক্তি ও আশীর্বাদ বরণ করিয়াই যে বিশ্ববরেণ্য হইবে এতে আর আশ্চর্য কি !

।। পরিশিষ্ট ।।

THE HINDU PREACHER

Many are of opinion that the Hindu religion neither was nor can ever be a propagandistic religion and that every attempt to spread it is antagonistic to its fundamental principles. To these men of such peculiar views we say that religion without preaching is like life without animation. Without the institution of preaching no religion can withstand the immoral influences of degeneration or retard the progress of corruption. From immemorial antiquity down to this nineteenth century of the Christian era the vital powers of the Hindu faith have been preserved by the *Avataras* or Incarnations of God and by holy sages, whose mission of life was to promulgate from time to time the highest doctrines of purity, spiritual development and the attainment of divine prefection and also to popularise the solutions of intricate religions and philosophical problems found in our sacred Scriptures. Strictly speaking, these inspired sages and their chosen disciples were the real preachers of *Sanatana Dharma*, the Eternal Faith. To this kind of

* এই প্রবন্ধ নভেম্বর ২৩, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে *The Brahmavādin*- পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল (পৃঃ ৬৯-৭১) এবং ইহা স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য বিজয়কে লক্ষ্য করিয়াই লিখিত হইয়াছিল।

propagation and popularisation of its immortal doctrines, the Hindu religion owes its existence; and it will live through eternity if only its true spirit gets widely diffused. In short, it will, as the best embodiment of truth, become the predominent religion of the world, if Hindu preachers offer the light of their religion to the seeker after Truth among the nations of the world.

The method of preaching, adopted by the Hindus of olden days, was altogether different from what is now adopted by the followers of other faiths. The ancient Hindu preachers always tried to satisfy the religious cravings of the people by teaching them such truths, as could be comprehended by them in those times. As time rolled on, the capacity of man for religious and moral culture became improved, and new changes and reformations were introduced into the method of preaching religion so as to supply the new requirements of the people at large.

In very ancient times, religion was preached and propagated in India by *Rishis* and holy sages, who, by the example of their pure and highly moral lives, taught the people how to make spiritual progress and attain divine perfection. After the days of the *Rishis* the caste of the Brahmins became as a whole responsible for the preservation and propagation of the organised *Aryan* faith. The advent of the

Jnana-marga or the path of knowledge—as an improvement upon the old *Karma Yoga*—the path of rituals—brought the ascetic *Sannyasins* forward as an order devoted entirely to the work of propagation of the divine Truth of religion. The ancient *Sannyasins* of India are the oldest preachers of religion known to human history, and even today we have their successors in our midst. When all other religions in the world were narrow and exclusive, India had more than one body of ascetic preachers of the sublime Truth and universal religion of Vedanta. Both Buddhist and Jain literatures of pre-Christian origin bear witness to fact.

During the Buddhistic period, Buddhist monks preached charity, morality, purity and peace throughout the length and breadth of India and Central and Western Asia ; and the result was that thousands upon thousands accepted the teaching of Buddha and became converts to this new branch of the old Hindu faith. But after something like a thousand years' way in India Buddhism was driven out of the land of its birth by mainly the work of the Hindu savants like Kumarila Bhatta and his followers.

Kumarila proclaimed the Truth of the sublime doctrines of the Vedas from the Himalayas to Cape

Comorin and after fighting hard with the Buddhists he at last succeeded in reviving the authority of *Brahminism* and in reconverting the Buddhists into the old Hindu faith. Then after Buddhism was driven out of India by the efforts of Kumārila Bhatta and others there arose in the south the mighty genius Sankara, who gave a new stimulus to the spiritual revival of the Hindus. He explained the spirit of the Vedas in the new light of the Vedanta, gave a firm foundation of the Hindu Faith and propounded the doctrine of *Advaītism* as that which is taught by the *Upanishads*. The fallacies of the Buddhistic Philosophy were clearly exposed by Sankara in his Vedantic commentaries and other works. Sankara preached the Vedanta and conquered the then leaders of the various sects that had arisen with the downfall of Buddhism, by means of powerful polemical weapons and extraordinary spiritual powers.

Sankara seems naturally to have thought that it was necessary to have preachers of Hinduism and that these preachers should be monks or *Sannyasins* who by leading pure, moral and spiritual lives, would be in a position to teach the masses the true spirit of Vedanta, themselves consantly moving from place to place for the purpose. The disciples of Sankara followed their Master, preached the

Vedanta and established *Maths* or monasteries in different parts of the land. These monasteries became in time the headquarters of the *Sannyasin* preachers. Even from before the time of Sankara the *Sannyasins* have been the real pillars of the Hindu faith in all its sectarian aspects.

After Sankaracharya, Ramanuja, Madhva, Chaitanya and Nanaka (all inspired preachers and founders of different religious sects in India) arose in various parts of the land, and preached the different aspects of the all-sided Hindu religion. They propagated the *Bhakti Marga* or the path of love and devotion, and profoundly impressed upon the minds of men the higher doctrine of Divine love, faith and devotion. All of them sympathising even with the lowest classes of the Hindu commuuity roused their religious feelings which lay dorment for centuries and converted them to become *Bhaktas* of the one Supreme God of the Vedānta in one way or other. Chaitanya and Nānaka went a little further than others. They allowed even *Yavanas* and Mohammedans to enter into their religious community and become their disciples.

Thus we see that before the birth of Buddhism, Christianity and Mohammedanism, Hinduism was a propagandist religion, the diffussive influence of its universal principles working amongst the Hindus of

the different parts of India. After Buddhism arose, Hinduism stretched forth its mighty arms among the Buddhists and collected them once again into the Hindu fold. When Mohammedanism came to India, no doubt some of the Hindus embraced the faith of Islam. And when time came, the Hindu Vedanta influenced even Mohammedanism and its old converts accepted again the teachings of Hindu preachers. Islam softened and beautified by the Vedānta is the religion of the *Sufis.*

After such conversions and reconversions Hinduism has been silently working among its followers and gathering for them strength and light. A new religious wave has now come from foreign lands, which is, in all probability, simply a reflected wave recoiling upon the original shore whose "prophet winds" gave rise to it at the first instance. This new wave is called Christianity and its historic relation to the Vedantism of India is sure to be made out sooner or later. Faint voices are already heard pointing to the Indian origin of Christianity and the true Hindu can have nothing but sympathy for all sorts and conditions of the converts. All religion is in the conversion of the obdurate heart of man and in inclining him to virtue and to devotion to God. But do all converters know this ?

Mercenary preachers of any religion can nowhere do any real good. For their mission in life is anyhow to increase the number of converts ; with such preachers the religion becomes a commercial article. They are ever in search of new markets for its sale and often much of what is not good for home consumption is sold abroad and very naturally the figures in the account books swell. Is this religious progress ? We are living in a curiously mercantile age which has, in a remarkably wonderful way, made not only religion and philosophy but also philanthropy itself a paying profession. Indulging in habits of luxury and endeavouring to satisfy their worldly desires for pleasure and for fame these mercenary diffusers of religion do not care so much for the spiritual development of man as for making numerous converts from other religions. They will not allow religions and religious men to live at peace with one another. If they did so their own occupation would be gone.

Hinduism has in recent years suffered much owing to the want of proper preachers. Though the *Sannyasins* were formerly the real perachers of religion in India, most of them now have become illiterate and luxury-loving in their habits, and do not feel the practice of renunciation and the teaching and preaching of religion to be their daily duty.

Hence it is now necessary that well-educated *Sannyasins*, animated by the sincerest piety and the most austere spirit of humility and self-denial, should rise from the Hindu community to make themselves all in all to the people to set before them examples of perfect righteousness and to devote their lives with zeal to popular instruction and the office of preaching religion. Men of real sanctity and high-minded freedom and gifted with high intellectual powers should now enter upon this path of religious zeal and remove the abuses and the moral corruption that are daily working mischief in our society and in our homes. Spiritual strength comes to all as usual by the door of renunciation, and resignation can alone be the undisturbed home of the serene life of religious bliss. Heroic Hindus! take up the begging bowl and go from door to door spreading the love of righteousness and peace among mankind.

Moreover, it is now high time for us to send Hindu missionaries like Swami Vivekananda to distant lands for diffusing widely the highest doctrines of the Hindu religion and for bringing men of all creeds under its benign influence.

In Europe and America, there must be earnest and sincere souls waiting to hear the sublime teachings of the Vedanta and accept the doctrines of

Karma, to reincaration and of immortality of the soul.

A great want of this age is a religious order of the Hindus, which well-equipped with modern learning in science and in philosophy, possessing a knowledge of the world and acquianted with the spirit of the times will undertake the propagation of the Hindu religion in all countries, and bring into existence the reign of peace and harmony in the midst of warring sects and religions. The fatherhood of God and the brotherhood of men are both surely independent of the religious garb we men wear from time to time.*

A. Swami
(*Swami Abhedananda*)

* এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ লিখিয়াছেন: My first article I ever wrote long before I had any idea of coming to the West.— *Swami A.*

।। হিন্দু-প্রচারক ।।

অনেকের ধারণা, হিন্দুধর্ম প্রচারমূলক ধর্ম ছিল না, কখনও তাহা হইতে পারে না এবং ধর্ম-বিস্তারের প্রতিটি প্রচেষ্টাই ইহার মূলনীতির বিরোধী। এই অদ্ভুত ধারণাযুক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি বক্তব্য এই যে, প্রাণশক্তিবিহীন জীবন যেমন মূল্যহীন, প্রচারবিহীন ধর্মও সেইরূপ অর্থহীন। প্রচার-প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ধর্ম কখনও অধঃপতন ও দুর্নীতি-মুক্ত হইতে পারে না কিংবা নৈতিক অবনতির অগ্রগতি হইতে বাধা প্রাপ্ত হইতে পারে না। স্মরণাতীত কাল হইতে খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দুধর্মের প্রাণশক্তি অবতারকল্প ঋষিগণের দ্বারাই সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে, কেননা তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল সাময়িকভাবে পবিত্রতা, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ভগবৎ-সান্নিধ্যলাভের উচ্চতম শিক্ষাগুলি প্রবর্তন করা এবং আমাদের পবিত্র শাস্ত্রনিবদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের জটিল সমস্যাগুলি সাধারণের উপযোগী করিয়া সমাধান করা। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই সকল ঈশ্বরাদিষ্ট ঋষিগণ এবং তাঁহাদের মনোনীত শিষ্যগণই সনাতনধর্মের শাশ্বত সত্যের প্রকৃত প্রচারক ছিলেন। এই সমুদয় শাশ্বত উপদেশগুলির এ' জাতীয় প্রচার ও জনপ্রিয়তার জন্য হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব বজায় রহিয়াছে এবং ইহা অনন্তকালব্যাপী জীবিত থাকিবে—যদি ইহার সার সত্য বিস্তৃত-ভাবে প্রচার করা হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ইহা সত্যের মূর্ত প্রতীকরূপে জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে,—যদি হিন্দু-প্রচারকগণ জগতের বিভিন্ন জাতির সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের চিত্তে তাঁহাদের ধর্মের আলোকসম্পাত করিতে সক্ষম হন।

প্রাচীন হিন্দুগণের-দ্বারা গৃহীত প্রচারপদ্ধতি অধুনা অন্য ধর্মানু-বর্তীগণ-কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রাচীন হিন্দু-প্রচারকগণ মানবের ধর্মপিপাসা দূর করিবার জন্য সদা সচেষ্ট ছিলেন

এবং তাহাদিগকে এরূপ শিক্ষা দান করিতেন যাহা তাহারা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইত। সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানবের ধর্ম ও নৈতিক সাধনার শক্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং জনগণের আশু প্রয়োজনে পরিবর্তন ও সংস্কারসমূহ অবশেষে প্রচারপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল।

অতি প্রাচীনকালে ভারতের ঋষি ও সন্তগণ ধর্ম প্রচার করিতেন। তাঁহারা পবিত্র ও উচ্চনৈতিক জীবন যাপন দ্বারা কেমন করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব ও ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করা যায় তাহা শিক্ষা দিতেন। ঋষিদের পর ব্রাহ্মণগণ আর্যধর্মের সংস্কারক, সংগঠক ও প্রচারকের দায়িত্ব সর্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরাতন কর্মযোগের উন্নত সোপান জ্ঞানমার্গের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে তপস্যাপরায়ণ সন্ন্যাসীরা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ধর্মের অনুপম সত্যের প্রচারকল্পে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীন সন্ন্যাসীরা মানবজাতির ইতিহাসে অভিজ্ঞ ধর্মপ্রচারকরূপে পরিচিত; এমন কি আজিকার দিনেও আমাদের মধ্যে তাঁহাদের উত্তরাধিকারী বর্তমান। যখন বিশ্বের অন্যান্য ধর্মসমুদয় সংকীর্ণ ও সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তখনও ভারতের একাধিক প্রতিষ্ঠানের সন্ন্যাসীপ্রচারকগণ বেদান্তের সার্বভৌম ধর্ম ও উচ্চতর সত্যের প্রচারে ব্রতী ছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব যুগের বৌদ্ধ ও জৈন উভয় সাহিত্য এই ঘটনার সাক্ষ্যদান করে।

গৌতম বুদ্ধের সময়ে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এবং পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা পরহিতৈষিতা, নীতিপরায়ণতা, পবিত্রতা ও শান্তির বাণী প্রচার করিয়াছিলেন এবং ফলশ্রুতিস্বরূপ সহস্র সহস্র ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া প্রাচীন হিন্দু-ধর্মের এই নতুন শাখার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। তাহার পর প্রায় এক সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে হিন্দুধর্মের সাধক কুমারিল ভট্ট ও তাঁহার অনুচরবর্গের প্রচারের ফলে বৌদ্ধধর্ম তাহার জন্মভূমি ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল।

কুমারিল ভট্ট কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্যন্ত বেদের মহান্ সত্য প্রচার করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধদের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনর্জাগরণে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের ধর্মান্তরিত করিয়া পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। অতঃপর কুমারিল ও অন্যান্যদের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে বহিষ্কৃত হইল। দাক্ষিণাত্যে শঙ্করাচার্য নামে একজন প্রতিভাধরপুরুষের আবির্ভাব হয় এবং হিন্দুর আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে তিনি এক নূতন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন। বেদান্তের নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গীতে বেদের যথার্থ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি হিন্দুধর্মকে সুদৃঢ় করেন এবং উপনিষদ্‌সমূহের শিক্ষা অদ্বৈতবাদের তত্ত্বরূপে উপস্থাপিত করেন। আচার্য শঙ্কর তাঁহার বেদান্তভাষ্য ও অন্যান্য গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে বৌদ্ধ ধর্মের ভ্রমাত্মক যুক্তিগুলি উদ্‌ঘাটিত করেন। বৌদ্ধধর্মের পতনের পর যাঁহারা অসাধারণ অধ্যাত্মশক্তি ও বিতর্কমূলক আলোচনাবলে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য বেদান্তপ্রচারের মাধ্যমে সেই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রচারকদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য স্বভাবতই হিন্দুধর্মপ্রচারকের আবশ্যকতার বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন। তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন যে, এই সকল প্রচারকগণ মঠধারী অথবা সন্ন্যাসী হইবেন, তাঁহারা পবিত্র, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করিবেন এবং স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়া জনসাধারণের মধ্যে বেদান্তের সারতত্ত্ব প্রচার করিবেন। শঙ্করাচার্যের শিষ্যগণও বেদান্ত প্রচার করিয়া তাঁহাদের গুরুর এই কল্যাণময়নির্দেশ পালন করিয়াছিলেন এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে মঠ বা আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত আশ্রমগুলি এককালে সন্ন্যাসী-প্রচারকদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল। এমন কি প্রাক্‌শঙ্কর যুগের সন্ন্যাসীবৃন্দও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রকৃত স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে শঙ্করাচার্যের পর রামানুজ, মধ্ব, চৈতন্য এবং নানক (সকলেই প্রত্যাদিষ্ট প্রচারক ও বিশিষ্টধর্ম-সম্প্রদায়ের

প্রতিষ্ঠাতা) প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটে এবং তাঁহারা সার্বজনীন হিন্দু-ধর্মের বিভিন্ন দিক প্রচার করেন। তাঁহারা ভক্তিমার্গ বা প্রেম ও ভক্তির পথে ঈশ্বরের উপাসনার কথা প্রচার করেন। তাঁহাদের প্রচারের ফলে ভগবানের প্রতি প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাসের উচ্চতর তত্ত্ব মানব-মনে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তাঁহাদের প্রায় সকলেই হিন্দুসমাজের নিম্নশ্রেণীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন থাকায় তাহাদের মনে ধর্মভাব জাগরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—যাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সুপ্ত অবস্থায় থাকিয়া কোন-না-কোনভাবে তাহাদিগকে বেদান্তের সগুণ ব্রহ্মের অনুগামীতে পরিণত করিয়াছিল।

চৈতন্য এবং নানক তাঁহাদের অপেক্ষা আরও অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারা এমন কি যবন ও ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বিগণকেও তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহারা তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

এইভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট, ইসলামধর্মের অভ্যুত্থানেরও পূর্বে হিন্দুধর্ম প্রচারমূলক ধর্ম ছিল, বরং এই সার্বজনীন নীতির সুদূরপ্রসারী প্রভাব হিন্দুধর্মের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন স্থানে কার্যকরী ছিল। বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থানের পর হিন্দুধর্ম ইহার উপর সুদৃঢ় বাহু বিস্তার করিয়া বৌদ্ধগণকে পুনরায় হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। ভারতে যখন ইসলামধর্ম প্রবেশ করিল তখন নিঃসন্দেহে কিছু সংখ্যক হিন্দু ইস্‌লামধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং সময় সমুপস্থিত হইলে হিন্দুর বেদান্ত ইস্‌লামধর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করিল এবং পুরাতন ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণ পুনরায় হিন্দুপ্রচারকগণের উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল। বেদান্তের প্রভাবে কোমলতা ও মাধুর্যমণ্ডিত যে ইসলামধর্ম তাহাই সুফীধর্ম নামে পরিচিত।

এইরূপে ধর্মান্তরিতকরণ ও পুনর্ধর্মান্তরিতকরণের মাধ্যমে হিন্দুধর্ম ইহার অনুসরণকারিগণের মধ্যে নীরবে কাজ করিয়া আসিতেছে এবং তাহাদের জন্য শক্তি ও আলোক বিকীরণ করিতেছে। অধুনা পাশ্চাত্য

হইতে একটি নব অধ্যাত্ম-তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে,—বস্তুতঃ একটি প্রতিবিম্বিত তরঙ্গ যেন তাহার তীরে আসিয়া পুনরাবর্তিত হইতেছে। যাহা প্রকৃত ধর্মের তীর প্রত্যাহত প্রতিবিম্বিত তরঙ্গমাত্র তাহারই পূর্বাভাস আজ পরিলক্ষিত হইতেছে। এই নবতরঙ্গ 'খ্রীষ্টধর্ম' নামে পরিচিত এবং ইহার সহিত ভারতের বেদান্তধর্মের একটি ঐতিহাসিক সম্পর্ক কিছুকালের মধ্যে নিশ্চিতরূপে স্থাপিত হইবে। ভারত হইতেই উদ্ভূত খ্রীষ্টধর্মের মূল সূত্রটি যে—এ' বিষয়ে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শ্রুত হইতেছে, সুতরাং সকল প্রকার ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণের জন্য যথার্থ হিন্দুর সহানুভূতি ব্যতীত আর কিছু থাকিতে পারে না। পাষাণহৃদয় মানবের পরিবর্তন, ধর্মানুরাগ ও ভগবন্নিষ্ঠাই সকল ধর্মের উদ্দেশ্য। কিন্তু সকল ধর্মান্তরকারিগণ কি তাহা জ্ঞাত আছেন?

কোন ধর্মের বেতনভোগী প্রচারকগণ-কর্তৃক কখনও কোন মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্যই হইল ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। এই সকল প্রচারকগণের জন্যই ধর্ম পণ্যবস্তুতে পরিণত হয়। তাঁহারা সর্বদাই ইহা বিক্রয়ের জন্য নূতন বিপণি অনুসন্ধান করিতেছেন এবং ইহার অধিংকাশই যাহা গৃহকর্মেরও অযোগ্য তাহাই তাঁহারা বাহিরে বিক্রয় করিয়া থাকেন। এবং ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, ইহাতে হিসাবের অঙ্কই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহাই কি ধর্মের অগ্রগতি? আমরা একটি অদ্ভুত বাণিজ্যিক যুগে বাস করিতেছি যাহা বিশেষ বিস্ময়জনকভাবে কেবলমাত্র ধর্ম ও দর্শন নহে, পরন্তু সেবাব্রতকেও ব্যবসায়বৃত্তিতে পরিণত করিতেছে। পার্থিব ভোগ-বিলাস ও নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য সকল বেতনভোগী ধর্মপ্রচারকগণ অন্য ধর্মাবলম্বিগণকে ধর্মান্তরকরণের জন্য যতখানি আগ্রহী, তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তদ্রূপ নহে। তাঁহারা ধর্ম এবং ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণকে পরস্পর শান্তিতে বাস করিতে দিবেন না। যদি তাঁহারা এরূপ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের বৃত্তি অবশ্যই লোপ পাইবে।

বর্তমান কালে উপযুক্ত প্রচারকের অভাবে হিন্দুধর্ম বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। যদিও পূর্বে সন্ন্যাসীরাই ভারতে প্রকৃত ধর্ম-প্রচারক ছিলেন, কিন্তু অধুনা তাঁহারা নিরক্ষর ও বিলাসী হইয়া উঠিয়াছেন।[১] ধর্মশিক্ষা, প্রচার ও ত্যাগব্রতের অভ্যাসই যে তাঁহাদের দৈনন্দিন কর্তব্য এ কথা তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন। এক্ষণে সুশিক্ষিত, যথার্থ ঈশ্বরপরায়ণ, কঠোর সংযমী এবং পরহিতব্রতী সন্ন্যাসিগণের আবির্ভাব হিন্দুসমাজে একান্ত প্রয়োজন, যাঁহারা ধর্মজীবন যাপন করিয়া জনসাধারণের ধর্মপথনির্দেশকরূপে তাহাদের উপযোগী শিক্ষা ও ধর্মপ্রচারকার্য নির্বাহ করিবেন। যথার্থ পবিত্র স্বভাব, উদারহৃদয় ও মনস্বী-ব্যক্তিগণ অধ্যাত্ম-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে সকল কুপ্রথা ও নৈতিক-দুর্নীতি প্রত্যহ আমাদের সমাজে ও গার্হস্থ্যআশ্রমে ক্ষতিসাধন করিতেছে সেইগুলি দূর করিবেন। ত্যাগাদর্শের মাধ্যমেই চিরাচরিত প্রথায় আমরা অধ্যাত্মশক্তি লাভ করিতে পারি এবং আত্মসমর্পণই একমাত্র নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও অধ্যাত্ম-সুখের আধার। হিন্দুধর্মের প্রচারকগণ! আপনারা ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া দ্বারে দ্বারে প্রেম ও শান্তি বিতরণের জন্য যাত্রা করুন।

অধিকন্তু হিন্দুধর্মের উচ্চতত্ত্বসমূহ বিস্তৃতভাবে প্রচারের জন্য এবং সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণকে ইহার অনুকূলে আনিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় ধর্মপ্রচারক দূরদেশে প্রেরণের ইহাই উপযুক্ত সময়।

য়ুরোপ ও আমেরিকার অকপটহৃদয় ব্যক্তিগণ বেদান্তের উচ্চ তত্ত্বসমূহ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত এবং কর্মরহস্য, পুনর্জন্মবাদ ও আত্মার অমরত্ব প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ লাভের জন্য উৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করিতেছে।

এই' যুগে হিন্দুদের একটি প্রধান অভাব হইল সন্ন্যাসীসংঘের—যাহা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জ্ঞানে ভূষিত হইয়া জাগতিক অভিজ্ঞতা

১। ইহা ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ সন্ন্যাসীসমাজের কথা।

লাভ করিয়া ও সময়োচিত অবস্থার সহিত পরিচিত হইয়া সকল দেশে হিন্দুধর্মপ্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে এবং বিবদমান ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে শান্তি ও মৈত্রী আনয়ন করিবে। ঈশ্বরের পিতৃভাব ও মানবের সৌভ্রাত্রবোধ উভয়ই আচরণসাপেক্ষ।